এই
শীলা ধর
ভারত

এই
ভারত

প্রধান মন্ত্রীর বাসভবন
নূতন দিল্লী

স্নেহের ছেলেমেয়েরা,

ভারত বলতে কি বুঝব আমরা? ভারত তো কেবল নদী ও পাহাড়ের সমষ্টি একখানা ভূখণ্ড মাত্র নয়। ভারত বলতে বুঝি তুমি ও আমি, এবং আমাদের কোটি কোটি ছোট বড় সব ভাইবোনেরা—যারা তোমার-আমার স্বদেশবাসী। কেবল তারা কেন, হাজার হাজার বছর আগে এ দেশে যারা বসবাস করেছে, তারাও এই ভারতের সমাজকে গড়েছে তাদের চিন্তাভাবনা ও কর্ম দিয়ে। অতীতে আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল, আজ আমরা পেঁাছেছি বর্তমানে। আজকের দিনে আমাদের কাজকর্ম, চিন্তাভাবনা আবার গড়ে তুলবে আগামী কালের ভারতকে।

আজ যদি আমরা পথঘাট তৈরি করি, বৃক্ষ রোপণ করি, ভালো ভালো আদর্শ নিজেদের জীবনে ফুটিয়ে তুলি—তাতে কি কেবল আমাদেরই লাভ? আমাদের সমস্ত ভালো কাজ ও ভালো চিন্তার প্রভাব পড়বে গিয়ে সেই তাদের উপর, যারা তোমার আমার পরে এদেশে জন্ম নেবে। দেশ গঠন করা সহজ ব্যাপার নয়—একাজে দেহমনের সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হয়, অনেক স্বেদ ও রক্ত ক্ষরণ করতে হয়। অনেক আছাড় খেয়ে তবে আমরা চলতে শিখি, তেমনি কাজে না নামলে আমরা কাজ করতে শিখিনা, আমাদের কর্মশক্তিও বৃদ্ধি পায়না। পৃথিবীর ইতিহাস পড়লে দেখা যায় যে অগ্রগামীরা ত্যাগ স্বীকার করেছেন, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মেহনৎ করেছেন তবেই দেশ এগিয়ে গেছে।

গত পঁচিশ বছরের মেহনতের ফলে ভারতের নয়া জমানার বুনিয়াদ পত্তন করা হয়েছে। আজকের দিনের ছেলেমেয়েরা সেই ভিত্তির উপর গড়ে তুলছে একতাবদ্ধ সমাজের এক বিরাট ও মজবুত ইমারত। সে কাজটা যদি সহজসাধ্য হত, তবে কি কাজে তেমন উৎসাহ হত? কিন্তু গহন পথে চলতে গিয়ে পায়ে যদি কাঁটাও বিঁধে, বীরেরা তা হতে ভয় পায়না। পথের কাঁটা রক্ত-মাখা পায়ে দলিত করে তারা সমানে এগিয়ে যায়।

ভবিষ্যৎ তো তোমাদের হাতে। বাধাবিপদ তুচ্ছ করে যদি এগিয়ে যেতে পারো, অনেক কিছু করতে পারবে তোমরা। সকল রকম দোষত্রুটি শোধরাবে তো তোমরাই। কেবল বড় বড় কাজ করলেই সব কাজ করা হয়না। ছোটখাটো খুঁটিনাটি প্রতিদিনের সাধারণ কাজও তোমরা যদি অসাধারণ ভালো করে করতে পারো, তবে তার চেয়ে বড় কাজ কিছুই আর হতে পারেনা।

১৬ জানুয়ারী, ১৯৭৩

(স্বাঃ) ইন্দিরা গান্ধী

प्रधान मंत्री भवन
PRIME MINISTER'S HOUSE
NEW DELHI

Dear children,

India is not just the land, mountains and rivers. India is you and me, all the millions of young and old who are her citizens. The thoughts and actions of the people who have inhabited India for thousands of years have moulded our society. Out of the past grows the present, and what we do today will shape our future.

When we build a road or plant a tree or inculcate good habits, it is not for ourselves alone but also for those who will be born in the years to come. The work of building is not easy. We must give it all we have and strain every nerve and muscle. It is only by trying that we learn and by doing that we gather strength. All the world over, progress has been possible because of the hard work and sacrifice of pioneers.

These 25 years have laid the foundation of the new modern India. The children of today must continue this work and make our country united and strong. Anything which is easy soon becomes dull. The very hardships we face provide challenge and excitement.

The future is calling you. Don't be disheartened by difficulties. You can change the bad, not only by doing big things but by trying your best to do even ordinary things extraordinarily well.

Indira Gandhi

January 16, 1973. (Indira Gandhi)

এই ভারত

শীলা ধর

মূল্য: দশ টাকা

THIS INDIA (Bengali)

বাংলা অনুবাদ: ক্ষিতীশ রায়

ডিরেক্টর প্রকাশন বিভাগ, তথ্য ও বেতার মন্ত্রক, ভারত সরকার, পাতিয়ালা হাউস, নূতন দিল্লী-১ কর্তৃক প্রকাশিত এবং এন. কে. গসেন দ্বারা এন. কে. গসেন অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩/৭ আরিফ রোড, কলিকাতা-৭০০০৬৭ এ মুদ্রিত। কলিকাতায় প্রাপ্তিস্থান: ৮ এসপ্ল্যানেড ইস্ট (একতলা)কলিকাতা-১

আলোকচিত্রাবলী : টি. এস নাগরাজন

ডিজাইন ও চিত্রাঙ্কণ : এ. রামচন্দ্রন

বিষয় সূচী

১

তুমি কার? কোথায় তুমি থাকো?

তোমার তো কত কি আছে — সব তোমার। তোমার বই, তোমার জামাকাপড়, তোমার পড়ার জায়গা, তোমার কাজের জিনিস, খেলাধূলার জিনিস। আর আছে তোমার বাড়ি — যেখানে তুমি থাকো ও তোমার সব জিনিস থাকে। এ সবই তো তোমার, কিন্তু তুমি কার এবং কোথায় তুমি থাকো বলো তো? তুমি হয়তো বলবে চট করে তুমি তোমার মা বাবার, কিংবা বলবে তুমি অমুক বাড়ির ছেলে, অমুক গ্রামে বা অমুক সহরে তোমার বাড়ি। আর তোমার স্বদেশ বলতে যে ভারত — সে কথা কে না জানে? সবার মুখে শুনে শুনে এসব কথা তুমি শিখেছো, এসব প্রশ্নের জবাব দিতে তাই তোমায় আর ভাবতে হয়না।

পৃথিবীটা তো বিশাল, এই বিরাট পৃথিবীর কোনো একটা জায়গায় তোমার নিজের থাকবার ঠাঁই আছে — এমন একটা আপনার দেশ আছে যে দেশের তুমি আপনজন — সে কথা ভাবতেও ভালো লাগে। আমরা ভারতীয় — ভারত আমাদের আপনার দেশ — এ কথাটা আমাদের কাছে এমন সহজ সত্য যে এ নিয়ে আমরা বিশেষ কোনো চিন্তাভাবনা করিনা। কিন্তু পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ ঘরছাড়া লোক আছে যাদের স্বদেশ বলতে কিছু নেই — এমন জায়গা নেই যেখানে তারা মাতৃভাষায় মনের কথা বলতে পারে অথবা স্বাধীনভাবে আপন খেয়ালখুশি মতো কাজকর্ম করতে পারে। এইসব ঘরছাড়াদের কেউ কেউ তাদের ঘর ফিরে পেয়েছে, কেউ কেউ এখনো সংগ্রাম করে চলেছে স্বদেশকে ফিরে পাবার জন্য। এদেশ আমার, আমি এই দেশের — এই কথাটুকু প্রাণ খুলে বলবার জন্য মানুষ প্রাণও দিতে পারে।

তুমি কি বলো? তুমি তো দিব্যি বাড়ির ছেলে হয়ে অতি সহজেই ভাবতে পারছো যে সারা দেশটাই তোমার ঘরবাড়ি। স্বদেশ নিয়ে তোমার সাধ্য সাধনা করতে হয়নি, তুমি জন্ম নেবার অনেক আগের থেকে দেশ তোমার অপেক্ষায় কোল পেতে বসে ছিল। কিন্তু দেশকে আপন করে পেতে হলে তাকে আপন বলে চিনতে হয়। দেশকে বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করার জন্য যত্ন নিতে হয়।

যদি বলো তুমি অমুক বাড়ির ছেলে, অমুক পরিবারের ছেলে – তার ঠিক অর্থটা কি বুঝে দেখেছো ? একই গৃহপরিবারে জন্ম, মাবাবা তোমাদের এক – কেবল এই রক্তের সম্পর্কেই কি ভাইবোন তোমার নিতান্ত আপন জন? না, সেইটুকু সব হতে পারে না। তোমার ভাইবোন তোমার আপন কারণ অনেকগুলি একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে তোমাদের জীবনে, তোমরা একত্রে থেকেছো, পরস্পরের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছো অনেক জিনিস, মিলেমিশে যেমন থেকেছো তেমনি ঝগড়াঝাঁটিও যে করোনি এমন নয়, হাসিঠাট্টার বিষয় নিয়ে একসঙ্গে হেসেছো, আবার দিদিমা ঠাকুমার মুখ থেকে একই রকম ছড়া ও রূপকথা শুনেছো। বলা যায় জীবনের অভিজ্ঞতা তোমাদের একই ধরনের। বিশেষ একটা কথা নিয়ে তোমাদের পরিবারশুদ্ধ সকল লোক হেসে গড়িয়ে

পড়ো। কিন্তু তোমার পরিবারের কাছে যেটা হাসির কথা অন্য পরিবারের কাছে তা হাসির ব্যাপার নাও হতে পারে। তোমাদের হাসি শুনে পাশের বাড়ির লোক এসে হয়তো বুঝতেই পারেনা কেন তোমাদের এত হাসির ধুম — হাসির কারণটা বুঝিয়ে দিলেও তারা হয়তো বলবে এ নিয়ে এত হাসির কী আছে। কেবল হাসির ব্যাপার নয়, প্রত্যেক পরিবারের এমন কিছু কিছু ব্যাপারও থাকে যা নিয়ে সকলে দুর্ভাবনা দুশ্চিন্তা করে কিংবা দুঃখ পায়।

গৃহপরিবারের মধ্যে যখন তুমি থাকো, দেহে মনে তুমি আরামে থাকো। তাই বলে তুমি নিশ্চয় মনে করোনা যে তোমাদের পরিবারের মতো সুখী ও সুন্দর পরিবার পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় কোথাও নেই। অনেক ছোট খাটো খুঁত থাকতে পারে, নিজেদের মধ্যে মন কষাকষি কিংবা খুনসুঁটি কখনো হাতাহাতিতে পরিণত হতে পারে। একদিন তুমি ঘর ছেড়ে হয়তো চলেও যেতে পারো। সে যেমনই হোক না কেন, বাড়ির লোক তোমার কথার মানে ও ধরন যতটা সহজে বুঝতে পারে তেমনটা অপর কেউ বুঝতে পারবেনা। যেখানেই তুমি যাওনা কেন, যাই করোনা কেন, যে বাড়িতে তুমি জন্ম গ্রহণ করেছো, যেখানে বড়ো হয়েছো — সে চিরকাল তোমার কাছে নিজের বাড়ি হয়ে থাকবে।

ভারতের সাতান্ন কোটি দেশবাসীর পক্ষে ভারতও তেমনি এক গৃহ পরিবার। আমরা কেবল যে এদেশে জন্মেছি এমন নয়, হাজার হাজার বছর ধরে এদেশে যেসব ঘটনা ঘটে গেছে, আমরা সেইসব ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে আছি। আমাদের এই ভারতীয় পরিচয় আমাদের অনেকের কাছে অনেক সময় হয়তো স্পষ্ট হয়ে ওঠেনা। তুমি যে তুমি, তুমিও

হয়তো জানোনা কি অর্থে এবং কতটা ভারতীয় তুমি নিজেই। তোমার পরনের জামাকাপড় হয়তো ভারতীয় না হতে পারে, যে ভাষায় তুমি কথা বলো কিংবা বই পড়ো — তাও হয়তো ভারতীয় নয়।

কিন্তু ভাষা কিংবা কাপড়চোপড় ভারতীয় হলেই যে-কেউ ভারতীয় হতে নাও পারে। এমন কি ভারতে বসবাস করে এমন অনেকে থাকতে পারে, যারা সত্য সত্য ভারতীয় নয়। তোমার ভারতীয় পরিচয় তো বাইরের জিনিস নয় যে তুমি যেমন খুশি পরতে পারো অথবা খুলে রাখতেও পারো।

অস্থি মজ্জায়, দেহে মনে, চিন্তনে স্মরণে — তুমি ভারতীয় বলেই তোমার ভারতীয় পরিচয় কিছুতেই পরিহার্য নয়।
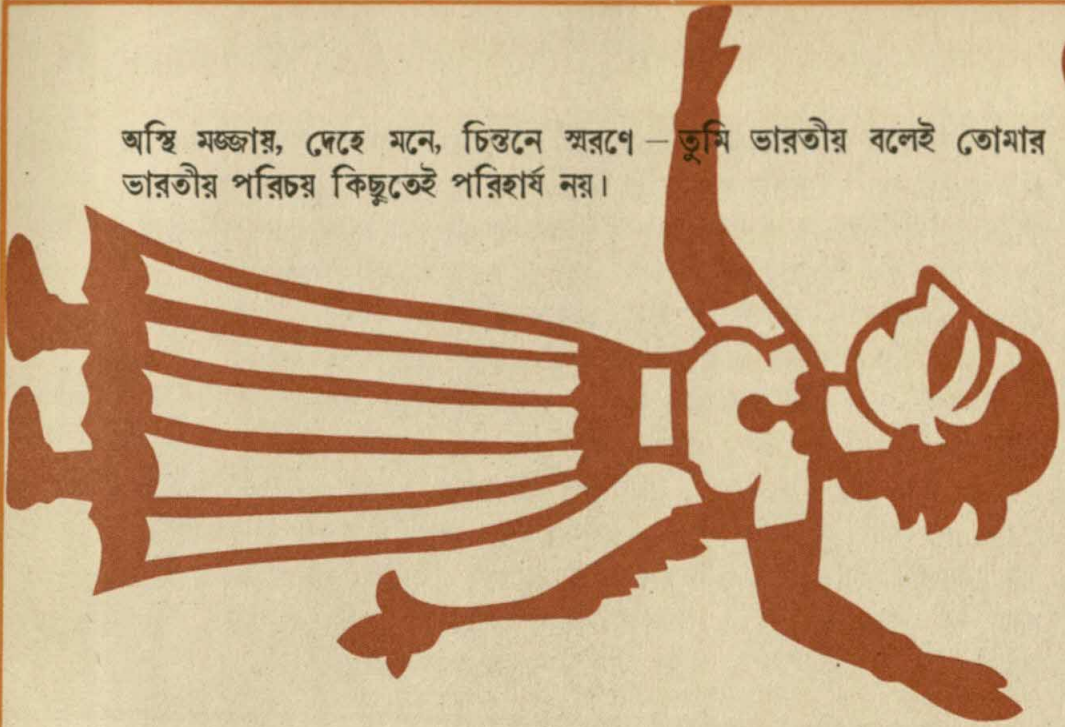
ভারত তো একটা ভূখণ্ড মাত্র নয় — হাজার হাজার বছরের স্মৃতিবাহী নদী হল আমাদের এই দেশ। আমরা সেই জীবন প্রবাহের অংশ বিশেষ। অতীতের বহু লক্ষ ভারতবাসী তাঁদের মনন, বচন ও সাধনের দ্বারা তিলে তিলে যে ঐতিহ্য গঠন করে গেছেন, আমরা প্রত্যেকে তার অংশীদার। একেই আমরা বলি ভারতের সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি যে কি জিনিস কথা দিয়ে তা ঠিক ব্যাখ্যা করা যায় না, কারণ তা অনুভবের জিনিস। আমরা তাকে চিনি যেমনভাবে বাছুর তার মাকে চিনে নেয় অনেক গোরুর পাল থেকে। ফুলের গন্ধ যেমন চিনে নিতে কষ্ট হয়না, কিন্তু কথায় বর্ণনা করা মুশকিল — সংস্কৃতি হল সেরকম। ভারতের লোক যে যেখানে থাকুক না কেন — সহরে কিংবা দূর দূরান্তর গ্রামদেশে — প্রত্যেকে তোমার আমার মতো এই ভারত সংস্কৃতির শরিক। যেসব ভারতীয় হাজার হাজার বছর আগে গত হয়েছেন কিংবা হাজার হাজার বছর পরেও যাঁরা এই দেশে জন্মগ্রহণ করবেন, সেইসব আগত অনাগত সকল লোকই এই সম্পদের অধিকারী — এঁরা সবাই তোমার আমার অংশীদার। আগেই তো বলেছি এ যেন এক মহানদীর মতো — সামনে পিছনে যেন তার অন্তহীন বিস্তার।

ভারতে ভারতীয় হয়ে জন্মেছ বলে তুমি বিশ্ব থেকে বহির্ভূত—এমন তো হতে পারে না। ভারতীয় মাত্রই বিশ্বনাগরিক হতে পারে। তুমি যেমন ঘরের ছেলে তেমনি আবার গাঁয়ের কিংবা শহরেরও ছেলে তো বটে। পরিবারের ছেলে বলে কি স্কুলের ছেলে হতে নেই? তা ছাড়া তুমি পাড়ার ছেলে, তোমাদের ফুটবল টীমের ছেলেদের মধ্যে তুমিও তো একজন। বিশ্বনাগরিক হতে তোমার কোন বাধা নেই, তবে ভালো বিশ্বনাগরিক যদি হতে চাও তবে সূচনায় তোমার উৎকৃষ্ট ভারতবাসী হতে হবে। ভারতীয়ত্ব হল তোমার ভিত্তিভূমি আর ভারতীয় কোনো একটি ভাষা তোমার ভাষা। এই দুটি উপাদান আছে তোমার হাতে, এর সাহায্যে তুমি নিজেকে যেমন ইচ্ছা গড়ে নিতে পারো। এই ভারতীয়ত্ব যদি তুমি বিসর্জন দাও তাহলে তোমার দশা হবে মস্তকবিহীন কবন্ধের মতো, দেহহীন সত্তার মতো। পায়ের তলার মাটিই যদি সরিয়ে দাও — তবে তুমি দাঁড়াবে কোথায়?
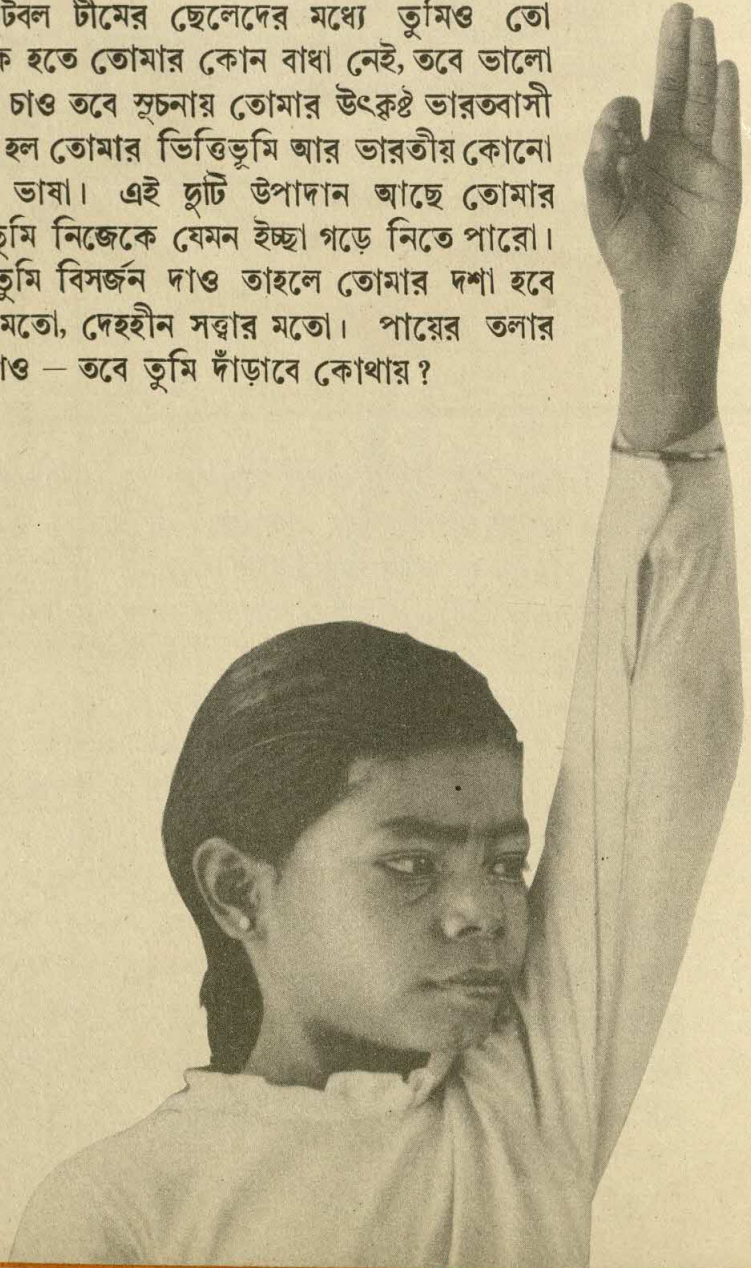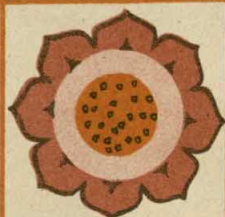
একই দেশের সহবাসী

ইতিপূর্বে শুনেছো একটানা বহু সহস্র বছর ধরে ভারতের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। পৃথিবীর খুব কম দেশই এমন প্রাচীন সভ্যতার বড়াই করতে পারে। ঈজিপ্ট, গ্রীস, মেসোপোটেমিয়া, রোম প্রভৃতি অনেক দেশেরই সভ্যতা প্রাচীন—সন্দেহ নেই। কিন্তু এসব দেশে কয়েক শো বছর অন্তর অন্তর সভ্যতার ধারা বদলে গেছে—নিরন্তর প্রবাহিত হয়নি। আজকের দিনে এসব দেশে যারা বসবাস করে তাদের সঙ্গে হাজার বছর আগেকার বাসিন্দাদের কোনো মিল নেই। আজকের লোকেরা যেন সম্পূর্ণ অন্যজাতির মানুষ। আমাদের দেশে কিন্তু সেরকম আমূল পরিবর্তন ঘটেনি। হাজার বছর আগে যারা এদেশে ছিল তারা আমাদেরই পূর্বপুরুষ বলে জাতিগতভাবে দেখতে

গেলে আমরা অতীতে যেমন ভারতবাসী ছিলাম, আজও তেমনি আছি। অবশ্য ইতিমধ্যে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে, অনেক অদল বদল হয়েছে। কিন্তু তলিয়ে দেখলে বুঝতে পারি হৃদয়ের অনুভবে, মনের চিন্তায় এবং কাজ করার ধরনে পদ্ধতিতে, আমরা অনেকটা যেন আমাদের পূর্বজনের মতোই রয়ে গেছি।

ভারত সভ্যতার ধারা অব্যাহত থাকার অন্যতম কারণ হয়তো এই যে বহু সহস্র বছর ধরে ভারতের চেহারার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। অতি দূর কালে যারা এদেশে ছিল তারা যে আকাশ, নদী ও পাহাড় পর্বত দেখেছে – আজো আমরা তাই দেখছি, আজো যেমন ঋতুচক্রের আবর্তন ঘটছে সেকালেও ঠিক তেমনি শরতের পর হেমন্ত, শীতের পর বসন্ত ও গ্রীষ্মের পর বর্ষা এসেছে, আজো যেমন তৃষার্ত মেদিনী কালো মেঘের পথ চেয়ে থাকে তেমনি থাকত হাজার হাজার বছর আগে। বনে উপবনে তখন যে পাখিরা ডাকত আজো তারা ডাকে, ভারতের ফলের স্বাদে, ফুলের বর্ণ ও গন্ধে কোনো তারতম্য ঘটেনি। আজকের ছেলে যে বট, অশ্বত্থ, নিম, তাল কিংবা খেজুর গাছ দেখছে, অতীতে তার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ সেই একইরকম গাছ দেখে গেছেন। তারাও জানত ভারতকে স্বদেশ বলে; পুণ্য সঞ্চয় করার উদ্দেশ্যে তারাও গেছে নদী যেখানে নদীর সঙ্গে কিংবা সাগরের সঙ্গে মেশে; অথবা যেখানে সাধুসন্ত গুরু বা পীর জন্মেছেন কিংবা সাধনা করেছেন কিংবা দেহরক্ষা করেছেন; অথবা যেসব জায়গায় বহুকাল থেকে মেলা কিংবা উৎসব বসে। একই গৃহপরিবারের আশ্রয়ে আমরা যখন একত্রে বড় হয়ে উঠি তখন যেমন পরস্পরের মধ্যে একটা সহজ সৌহার্দ্য গড়ে ওঠে – তেমনি একই দেশে আমরা মানুষ হয়ে

উঠেছি বলে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সান্নিধ্য আমরা এত গভীর ভাবে অনুভব করি।

তিন হাজার বছর আগে এ দেশের ধুলোমাটি অঙ্গে মেখে যেসব ছেলেমেয়ে হা-ডু-ডু খেলেছে, এক সাজে পোশাকে ছাড়া তাদের সঙ্গে তোমাদের তফাৎ খুবই অল্প। ছেলেবেলায় তোমাদের মতো তারাও ছবি এঁকেছে — হাতি, ময়ূর ও বাঘের। আম, জাম, কলা, কাঁটাল, তেঁতুল, নারকেল খেয়ে তোমরা যেমন খুশী হও তারাও তেমনি খুশী হত। যে ভারতীয়তা এদেশের আকাশে বাতাসে সমীরিত, যার নাম আমরা জানিনা কিন্তু গন্ধ চিনি — অতীতে যেমন বর্তমানেও তেমনি সেই নাম-না-জানা গন্ধ আমরা প্রতি নিশ্বাসে টেনে নিয়ে আমাদের বুক ভরেছি। এসব থেকে বুঝতে পারি একটা বৃহৎ কিছু বা মহৎ কিছু অব্যাহত ভাবে এই দেশে ঘটে গেছে। সেটা যে কী সেকথা আমাদের বুঝে নেওয়া দরকার।

তার আগে অপর একটি প্রশ্নের জবাব পেতে হয় — এই দ্বিতীয় প্রশ্নের মধ্যে প্রথম প্রশ্নের জবাবটা প্রচ্ছন্ন রয়েছে। প্রশ্নটা এই — ভারতীয় কাকে আমরা বলব? একটিবার চোখ বুঝে ভাবতে চেষ্টা করলে দেখবে হাজারো ছবি ভেসে উঠবে তোমার মনের পর্দায়। ভারতীয় বলতে দেখতে পাবে মেষপালক কাশ্মীরের বরফ ঢাকা পাহাড়ের উপত্যকায় ভেড়া চরাচ্ছে; কেরলের জেলে জাল ফেলে মাছ ধরছে সমুদ্রতীরে: রাজস্থানের মরু-ভূমিতে সার বেঁধে চলেছে উটের পিঠে হেলতে

দুলতে উষ্ট্রচালক: জলকাদায় হাঁটু অবধি পা ডুবিয়ে বাঙলার চাষী হাল লাঙ্গলে চাষ দিচ্ছে ধানখেতে: রাউরকেলার ইস্পাত গলানো চুল্লীর সামনে রাক্ষুসে সাঁড়াশি হাতে দাঁড়িয়ে আছে ধুলি-পরা মজদুর; কোথাও বা পাহাড় কেটে রাস্তা তৈরী হচ্ছে, নদীর এপারের সঙ্গে ওপার যুক্ত করার জন্য সেতু নির্মাণ চলেছে অথবা উঠছে কোঠাবাড়ি বা দালান এবং সবকিছু তদারকি করছেন ইঞ্জিনীয়র; স্কুলে পড়াচ্ছেন শিক্ষক; কেরাণী কলম পিষছে দফতরে; দোকানী সাইকেল চেপে চলেছে তার দোকানের ঝাঁপ খুলতে; শোভাযাত্রার নেতা তার-স্বরে জিগির দিতে দিতে চলেছে দলের আগেভাগে; বিজ্ঞানী গভীর অভিনিবেশে দেখছেন তাঁর অনুবীক্ষণ যন্ত্রের ভিতর দিয়ে; খালি পা, কিন্তু জমকালো পোশাক পরনে আদিবাসী ছেলে তীর ধনুক হাতে বেরিয়েছে শিকারে—সে না দেখেছে রেলগাড়ি না বিজলী বাতি; আর দেখতে চেষ্টা করো নিজেকে—সামনের দিকে একটু ঝুঁকে এই বই পড়ছো যে তুমি।

তুমিও তো এই ভারতীয়দেরই একজন। এইভাবে ভারতীয় ভাইদের ছবি যদি তুমি পর পর সাজিয়ে যাও—এমন আরো অনেক ছবি তুমি হয়তো যোগ করতে পারো, কিন্তু সকল ছবির প্রথম নাম বলতে হয় 'ভারতীয়'।

এবার আর একটি প্রশ্নের জবাব দাও দেখি—ভারত দেশটা কেমন, আকৃতি কেমন, প্রকৃতিই বা কেমন? এ প্রশ্নের জবাবেও তোমায় লম্বা ফিরিস্তি দিতে হয় কারণ ভারত বড় বিচিত্র দেশ। এদেশে যেমন পৃথিবীর

সবচেয়ে উঁচু পাহাড় আছে উত্তরে সার বেঁধে, তেমনি আছে বহু বিস্তীর্ণ সমতলভূমি; ঝাঁ ঝাঁ গরম শুকনো মরুভূমি যেমন আছে তেমনি আছে বর্ষায় দু'কূল ভাঙ্গা খরধার নদী; ঘন সবুজ অরণ্য আছে একদিকে, অপরদিকে আছে বিস্তীর্ণ অনাবাদী জমি যেখানে কোনো দিন হয়তো লাঙলের আঁচড় পড়েনি। এইসব ভূখণ্ডের যে কোনোটিকেই ভারত বলা যায়। ভারতকে দেখি যেখানে হালবলদ নিয়ে একক চাষী চাষ দিচ্ছে—পিছনে তার মাটির কুঁড়েঘরের সারি। আবার সেই ভারতকেই দেখি জনবহুল বিরাট শহরের কোনো বড় রাস্তায়—বাস, ট্রাম, মোটর গাড়ির ভিড়ে, হট্টগোলে, ধোঁয়ায়; সার বাঁধা মিনার প্রমাণ উঁচু বাড়ি যার দুধারে দাঁড়িয়ে আকাশ ঢেকে রাখে। আবার দেখি ভারতকে কোনো নিভৃত অরণ্যের গভীরে উপজাতি-বস্তিতে, যেখানে ভারতীয় নিষাদ তার তীরধনুকে শিকার করা পশু বা পাখির মাংস এনে বাড়ির লোকের ক্ষুধা মেটায়। বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী যেখানে পৃথিবীর নবতম গবেষণার মধ্যে নিমগ্ন—সেই আধুনিক গবেষণাগারেও তুমি ভারতকে দেখতে পাবে। উপজাতি-বস্তি একদিকে আর অপর দিকে বিজ্ঞানাগার—এই দুয়ের মাঝখানে আরো অনেক দৃশ্য তো তুমি নিয়তই দেখতে পাও। সে সবই তোমার ভারতের দৃশ্য। এই জন্যই তো বলা হয় ভারত হল বহুবৈচিত্র্যের দেশ। এখানে বহু জাতের লোক আছে, তাদের নানা পেশা, নানা ভাষা, নানা বেশ। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন ভূখণ্ডে তারা থাকে—সেসব জায়গায় প্রাকৃতিক দৃশ্য যেমন আলাদা তেমনি আলাদা জল হাওয়া।

গোড়ায় আমরা যে প্রশ্ন তুলেছিলাম—ভারতীয় কাকে বলা যায়, ভারত কেমন দেশ—কই, তার তো ঠিকঠাক জবাব এখনো মিললনা। কিন্তু জবাবটা পাবার জন্য যেসব কথা বলা হল তা থেকে এদেশ সম্বন্ধে একটি সত্য স্পষ্ট হয়ে উঠল—তা হল এই যে নানা জাতির লোকেরা সবাই যদি ভারতীয় বলে নিজেদের পরিচয় দিয়ে থাকে হাজার হাজার বছর ধরে, তাহলে তাদের ভারতীয়ত্ব এমন একটা ব্যাপার যা জীর্ণ পুরাতন হবার নয়, কালক্রমে যা পরিবর্তন হতে পারে না, নিশ্চিহ্ন হতেও পারে না।

৩
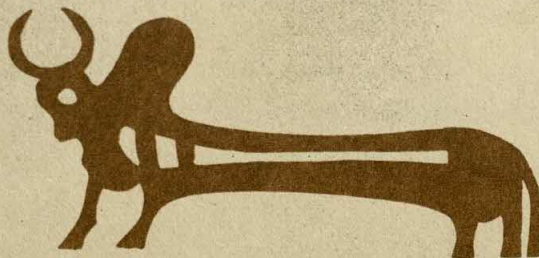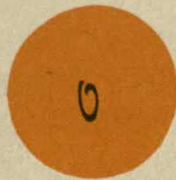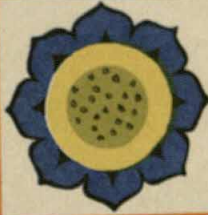
কী এই ভারতীয়ত্ব?

ভারতীয়ত্ব বলতে কী বুঝব— এবার সেটুকু বুঝতে চেষ্টা করা যাক। কীভাবে জীবন ধারণ করা উচিত সে বিষয়ে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে একটা বিশেষত্ব আছে, তেমনি আমাদের চিন্তাভাবনাও অনেকটা আমাদের নিজস্ব অন্য পাঁচজনের মতো নয়। নতুন বৌ যখন

বিয়ের পর বাপের বাড়ি ছেড়ে শ্বশুরবাড়ি যায়, মেয়ে পরের ঘরে চলে যাচ্ছে বলে এ দেশের মা বাপের মন যেমন কাঁদে তেমনটা অন্য কোথাও দেখা যায়না। উত্তর কিংবা দক্ষিণ, পূর্ব কিংবা পশ্চিম—ভারতের সর্বত্র নববিবাহিত কন্যার পতিগৃহযাত্রা নিয়ে কন্যাপক্ষের অনুভব ও তার প্রকাশ একই ধরনের। কোন পরিবার কী ভাষায় কথা বলে, কার কী জাত বা ধর্ম তা নিয়ে কিছু আসে যায়না—আজ যেমন ঘটছে, আজ থেকে দুশো বছর আগেও তেমনি ঘটেছে। প্রত্যেক ভারতীয় বাড়িতে জামাইয়ের বিশেষ সমাদর। জাতিবর্ণধর্ম-নির্বিশেষে ভারতের যাঁরা বয়োজ্যেষ্ঠ তাঁরা কনিষ্ঠ স্নেহ-ভাজনদের একইভাবে আশীর্বাদ করেন ও তাদের মঙ্গল কামনা করেন।

উদাহরণ হিসাবে এগুলিই যে প্রধান কিংবা প্রামাণ্য—এমন আমি বলতে চাইনা, কিন্তু ভারতীয়ত্ব যে কি জিনিস তা যদি চট্ করে বুঝতে হয় তা হলে এসব দৃষ্টান্ত কাজে লাগে।

কথায় বলে কুকুর ভারি প্রভুভক্ত, শেয়াল বেজায় ধূর্ত, সিংহ হল পশুর রাজা আর কোকিলের মতো সুকণ্ঠ কোনো পাখি নয়। তেমনি আমরাও সচরাচর বলে থাকি রাজ-পুতেরা বীরের জাত, পাঞ্জাবীরা খুব খাটতে পারে, দক্ষিণীরা বুদ্ধিমান আর পূর্ব দেশের লোক শিল্পরুচিতে সবার সেরা। এইরকম ঢালাও ভাবে বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের লোককে বিশেষভাবে চিহ্নিত করাটা কোনো কাজের কথা নয়। তার ফলে মানুষ অনেক সময় মানুষকে ভুল বুঝতে পারে, মানুষের সত্য পরিচয় নাও পেতে পারে। ওইভাবে লেবেল দেবার চেষ্টা না করে বরঞ্চ প্রশ্ন করা যায় কোন কোন গুণ থাকলে ভারতীয়কে অন্যদের চেয়ে পৃথক করে ভারতীয় বলা যায়?

এ প্রশ্নের সরাসরি জবাব দেওয়া খুব শক্ত। গণিতের প্রশ্ন যেমন যোগ বিয়োগ কিম্বা গুণ ভাগ করে ঝটপট একটা উত্তর বসানো যায়—এ প্রশ্ন তো তেমন নয় যে আঙ্গুলের পর্বে এক দুই তিন গুণে বলে দেওয়া যাবে। অন্যদের তুলনায় ভারতীয় কেন বিশেষ একথা বলতে পারা সহজ নয়। আকাশ যে নীল

তার কারণ যদি তোমায় তালিকাভুক্ত করতে বলা হয়, তুমি দেখবে ফর্দ ক্রমেই লম্বা হচ্ছে। ভারতীয়ের ভারতীয়ত্ব বর্ণনা করতে যাওয়াটাও তেমনি শক্ত। তবু একবার দেখাই যাক না চেষ্টা করে।

ভারতীয় সভ্যতার একটি প্রধান গুণ এই যে ভারত প্রথম থেকেই অন্য দেশ বা জাতির কাছ থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করে নিজের করে নিতে পেরেছে। ইতিহাসের সূচনা থেকে বহিরাগত বহু বিদেশী নানা উদ্দেশ্য নিয়ে এই দেশে প্রবেশ করেছে। কেউ এসেছে বসতি স্থাপন করতে, কেউ বা ভ্রমণ করতে, কেউ শিক্ষা করতে এসেছে ছাত্ররূপে, কেউ ধন দৌলত লুটপাট করে চলে গেছে কেউবা এসেছে এদেশ জয় করে নিতে। অনেকে তাদের মধ্যে জীবন ধারণের নতুন ধরনধারন এনেছিল, নতুন চিন্তা ভাবনা। বিদেশ থেকে এসেছে বলে ভারতের তখনকার অধিবাসীরা এসব নতুন জিনিস নির্বিচারে বর্জন করেনি, অনেক কিছু স্বীকার করে আপন করে নিয়েছে। বহিরাগতকে আপন করে নেবার এই যে ক্ষমতা, দেওয়া নেওয়ার এই যে সহজ প্রবণতা—একেই বলে প্রাণের লক্ষণ। এরই ফলে আমাদের বহু হাজার বৎসরের প্রাচীন সভ্যতা
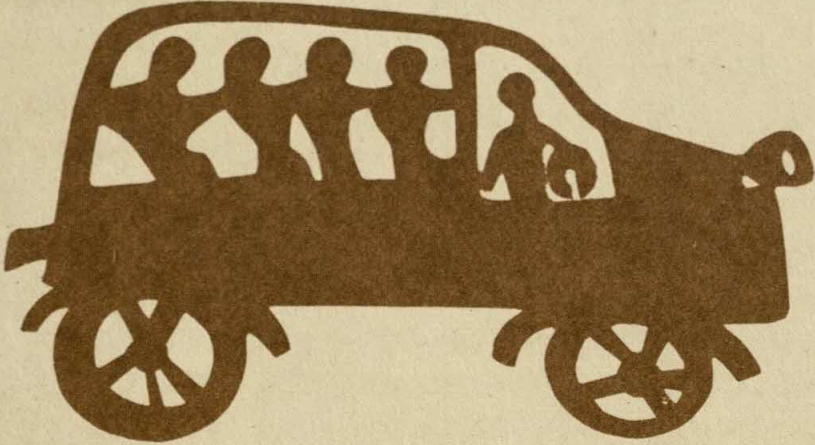
আজো টিকে আছে এবং কেবল যে বেঁচে আছে এমন নয়, আধুনিক কালের প্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলেছে কারণ আধুনিক ভাবধারাকে স্বীকার করে তাকে আত্মীভূত করার ক্ষমতা আজকের দিনেও আমাদের কিছুমাত্র হ্রাস পায়নি। আসলে আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি হল একটি সাইকেলের মত। সাইকেল চলে বলেই তা অটল থাকে।
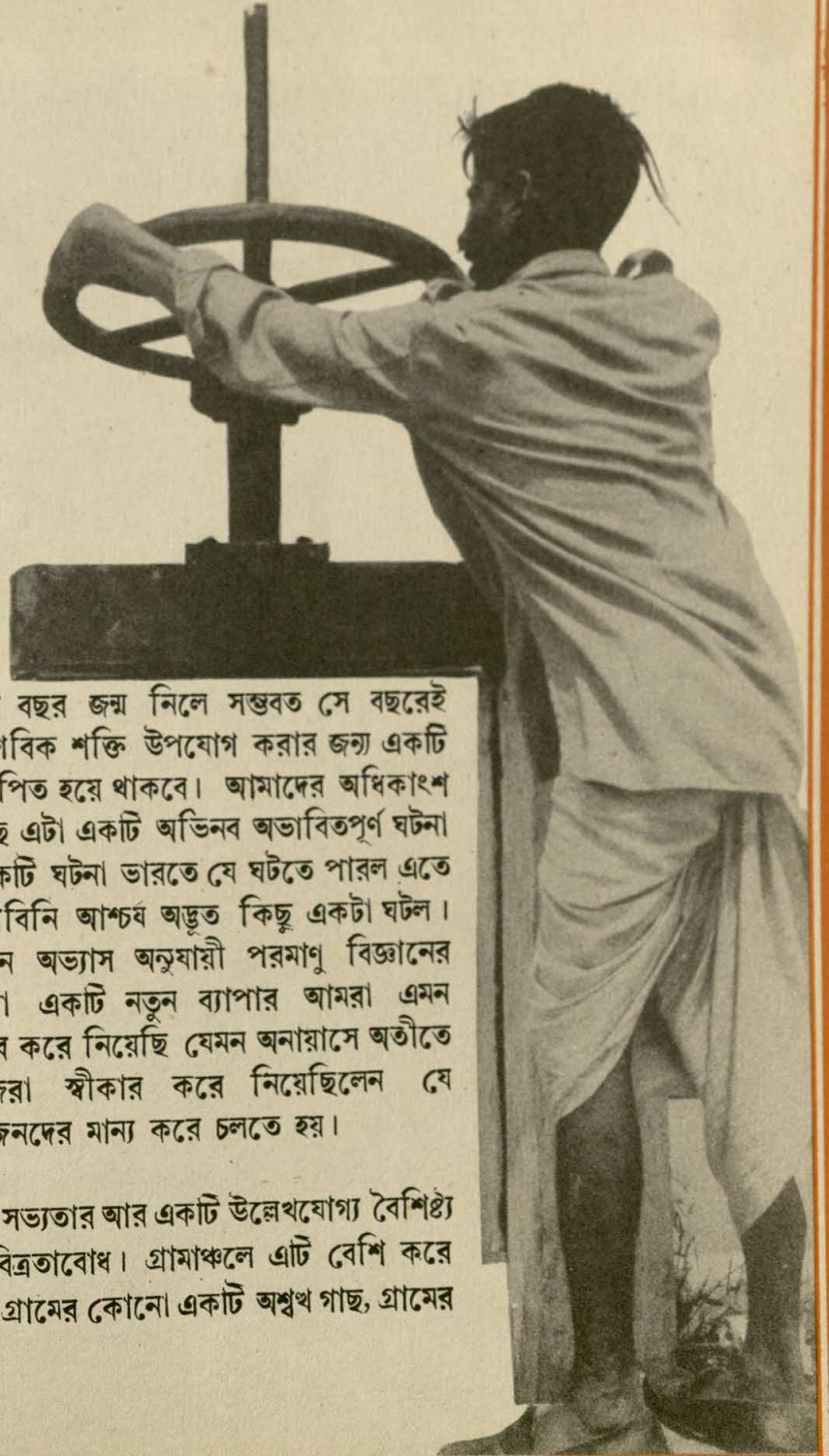
তুমি যে বছর জন্ম নিলে সম্ভবত সে বছরেই ট্রম্বেতে পারমাণবিক শক্তি উপযোগ করার জন্য একটি প্রযুক্তিকেন্দ্র স্থাপিত হয়ে থাকবে। আমাদের অধিকাংশ ভারতীয়ের কাছে এটা একটি অভিনব অভাবিতপূর্ণ ঘটনা —কিন্তু এমন একটি ঘটনা ভারতে যে ঘটতে পারল এতে আমরা কেউ ভাবিনি আশ্চর্য অদ্ভুত কিছু একটা ঘটল। আমাদের চিরন্তন অভ্যাস অনুযায়ী পরমাণু বিজ্ঞানের মতো আনকোরা একটি নতুন ব্যাপার আমরা এমন অনায়াসে স্বীকার করে নিয়েছি যেমন অনায়াসে অতীতে আমাদের পূর্বজেরা স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে বয়োজ্যেষ্ঠ গুরুজনদের মান্য করে চলতে হয়।

ভারতীয় সভ্যতার আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল আমাদের পবিত্রতাবোধ। গ্রামাঞ্চলে এটি বেশি করে লক্ষ্য করা যায়। গ্রামের কোনো একটি অশ্বত্থ গাছ, গ্রামের

নদী কিম্বা কুয়া, কারিগরের যন্ত্রপাতি, চাষের লাঙল, খাদ্যশস্য, তুলসীমঞ্চ, কোনো কোনো পাতা বা বীজ, বাদ্যযন্ত্র, কোনো এক খণ্ড কাপড়, বিশেষ কোনো ফল বা
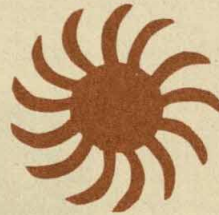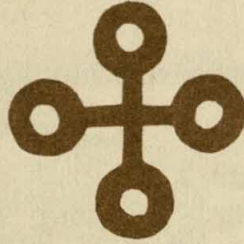
লেখবার কলম—এই দীর্ঘ তালিকাকে আরো দীর্ঘ না করেও স্বচ্ছন্দে বলা যায় যে এর যে কোনো নিত্য ব্যবহারের সামগ্রী—গ্রামের কোনো না কোনো লোকের কাছে পবিত্র। সমাজের সর্ব স্তরে এই পবিত্রতা বোধ দেখা যায়। গ্রামের ছেলের কথা দূরে থাক, শহরের ছেলেরাও হয়তো পা দিয়ে বই ছোঁবেনা, কোনো গাছের গায়ে পদাঘাত করবেনা। ভারতীয়েরা বয়সের সম্মান দিতে জানে কারণ তারা মনে করে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে প্রজ্ঞা বৃদ্ধি পায়, বিদ্যা বা জ্ঞানকে তারা শ্রদ্ধা করে, কারণ তা মনে শক্তি সঞ্চার করে, শরীর বা মনকে যাকিছু তেজোময় করে, যা ভালো কিংবা কল্যাণকর সেসব কিছুকে তারা পবিত্র জ্ঞান করে। আজ দেশে বিরাট বিরাট কলকারখানা গড়ে উঠেছে, বড় বড় বাঁধ দিয়ে নদীর জল বেঁধে সেচের জল ও প্রচুর বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করা হচ্ছে। এগুলি নিঃসন্দেহে আমাদের প্রগতির লক্ষণ, কিন্তু যন্ত্রশক্তির এইসব প্রতীককেও ভারতের অন্যতম জননেতা অভিহিত করেছেন 'নতুন যুগের মন্দির' বলে।

যেসব চিন্তা বা ভাবনা আবহমান কাল ধরে অপরিবর্তিতভাবে চলে আসছে—তাকেই বলা হয় দেশ বা জাতির ঐতিহ্য। শ্রেয়োবুদ্ধির কার্যকরতা বিষয়ে এখনো আমাদের অবিচল আস্থা। এর সঙ্গে কিন্তু ধর্মের কোনো

সম্পর্ক নেই। তোমরা নিশ্চয়ই মধ্য প্রদেশের দুর্ধর্ষ ডাকাতের দলের গল্প শুনে থাকবে। আমাদের দেশের একজন জননেতা এদের প্রতি সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে বলেন এরা যেমন ডাকাতীর জীবন ছেড়ে দিয়ে আবার নতুনভাবে জীবন যাপন শুরু করে। ডাকাতের দল একে একে এসে তাদের মারণাস্ত্র ফেলে দেয়। বিরুদ্ধ শক্তির কাছে তারা পরাভব স্বীকার করতে যায়নি, তারা আত্মসমর্পণ করেছে শুভবুদ্ধির কাছে। ব্যাপারটা ঘটেছিল ১৯৭২ সালে, কিন্তু অতীতের কাব্যে পুরাণেও এরকম ঘটনার নিদর্শন দেখা যায়। অনেকে বলেন এমনটা ভারত ছাড়া অন্য কোথাও ঘটতে পারতনা।

এইসব ঘটনা থেকে বুঝতে পারি আমাদের ঐতিহ্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি, আজো তা সজীব হয়ে রয়েছে। আজো নতুন নতুন প্রভাবের সঙ্গে পুরাতন মূল্যবোধ মিলেমিশে এক হয়ে যাচ্ছে। তা যদি না হত তাহলে ভারতীয় ঐতিহ্যও লুপ্ত হয়ে যেত। নূতনের সঙ্গে পুরাতন কী অদ্ভুতভাবে একাকার হয়ে যায় তার একটা চমৎকার নিদর্শন দেখা গিয়েছিল তারাপোরে। সেখানে পারমাণবিক শক্তির প্রযুক্তি কেন্দ্র যখন স্থাপিত হয়, দেখা গেল শ্রমিকরা হাত গুটিয়ে বসে আছে। যেসব অতি আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করার কথা, সেগুলির পূজো সারা না হওয়া পর্যন্ত তারা কাজে হাত দেয়নি। তাদের এই আচরণ যে অদ্ভুত কিংবা অস্বাভাবিক এমন কথা তখন কেউ বলেনি। দেশরক্ষা বিভাগ একবার

যুদ্ধের যন্ত্রপাতি দিয়ে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। আশপাশ থেকে অনেক গ্রামবাসী এসেছিল ভারতে প্রস্তুত 'ন্যাট্' নামক যুদ্ধবিমান দেখতে। দেশরক্ষার কাজে 'ন্যাট্' যে কত কৃতিত্ব দেখিয়েছে সে তারা নিশ্চয় শুনে থাকবে। দর্শকদের মধ্যে কেউ কেউ যদি 'ন্যাট্' দেবতাকে করজোড়ে প্রণাম করে থাকে—তাতে আর আশ্চর্য কি! একবার প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে একদল আদিবাসীকে জেট্ বিমানযোগে দিল্লী আনা হয়। তারা যেমন, দেশের লোকও তেমনি, এই ঘটনাটিকে স্বাভাবিক ঘটনা বলেই মেনে নিয়েছিল।

আজকের ভারতে আমরা কয়েক শতাব্দীর লোক যেন পাশাপাশি বসবাস করছি। পারমাণবিক শক্তির প্রযুক্তিকেন্দ্র, ন্যাট্ এবং জেট্ বিমান—এ সবই হল বিংশ শতাব্দীর। এগুলি আধুনিক সভ্যতার ক্ষেত্রে ভারতের পদক্ষেপের প্রতীক। কিন্তু আদিবাসীরা তিনশো বছর আগে যেমন ছিল, জীবনযাত্রার ধরনে আজো তেমনি রয়ে গেছে। আর 'ন্যাট্' বিমানের যান্ত্রিক কৌশল ও শক্তির কাছে সেই গ্রামের মানুষের মাথা নত করা—সে তো কাব্যপুরাণে বর্ণিত ঐতিহ্যের স্মৃতিবাহী।

কিছু ভারতীয় বিত্তশালী ব্যক্তির ভজনা করলেও, এদেশের অধিকাংশ লোকের শ্রদ্ধা ভক্তির পাত্র সেইসব মানুষ যাঁরা বিদ্বান, জ্ঞানবান অথবা পুণ্যবান।

হাজার বছর আগেও যেমনটা ছিল, আজো তেমনিই আছে। আজো গ্রামে গেলে দেখা যায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষককে মানুষ যতটা সম্মান করে ততটা গ্রামের সম্পন্ন জোতদারকেও করেনা।

জাতি হিসাবে ভারতবাসীরা ধৈর্যশীল। তড়িঘড়ি কাজ করা তাদের ধাতে নেই। অন্য লোকেদের তুলনায় তারা ঝটপট ফলের আশা করেনা, অপেক্ষা করতে জানে, কষ্ট স্বীকার করতে জানে, খাটতেও পারে খুব। তাদের মতো অতিথিপরায়ণ জাতি খুব কম দেখা যায়—অতিথিকে আরামে রাখবার জন্য তারা স্বেচ্ছায় দুঃখকষ্ট বরণ করতে রাজী। এ সমস্তই সদগুণ তাতে সন্দেহ নেই—কিন্তু ভালোমন্দ যাই ঘটুক তাকে বিনা ওজরে মেনে নেওয়ার স্বভাব অনেক সময় এ দেশের ক্ষতি সাধন করেছে।

সাধারণভাবে বলা যায় যে ভারতীয়দের ধারণা—যেসব সমস্যা আমরা

নিজেরাই সৃষ্টি করি অথবা যেসব সমস্যার মুখোমুখি আমাদের দাঁড়াতে হয়, সে সবের সমাধান থাকে আমাদের নিজেদের আয়ত্তের মধ্যে। সমাধান যদি বাইরে থেকে আসে তাহলে তা স্থায়ী হয় না অর্থাৎ সে সমাধান সত্যকার সমাধান নয়। বড় হয়ে তুমি বিচার করে দেখতে পারবে আমাদের এই ধারণা আজো বলবৎ আছে কিনা।

মনেও ভেবোনা উপরে যেসব গুণাগুণের কথা বললাম সেসব কেবল ভারতীয়দের একচেটিয়া। যদি কেউ বলে এক ভারতীয় ছাড়া আর কেউ শ্রেয়োবুদ্ধিতে বিশ্বাস করেনা, সে খুবই ভুল বলা হবে। ভারতীয়দের চারিত্র কেমন বোঝাতে গিয়ে কয়েকটি গুণাগুণের সমাবেশের কথা বললাম। এ থেকে ভারতীয়ত্ব যে কী—সে কথা মোটামুটি অস্পষ্টভাবেও যদি বুঝতে পেরে থাকো, তাহলে নিজেকে ও নিজের দেশকে আরেকটু ভালো করে হয়তো চিনতে জানতে বুঝতে পারবে।
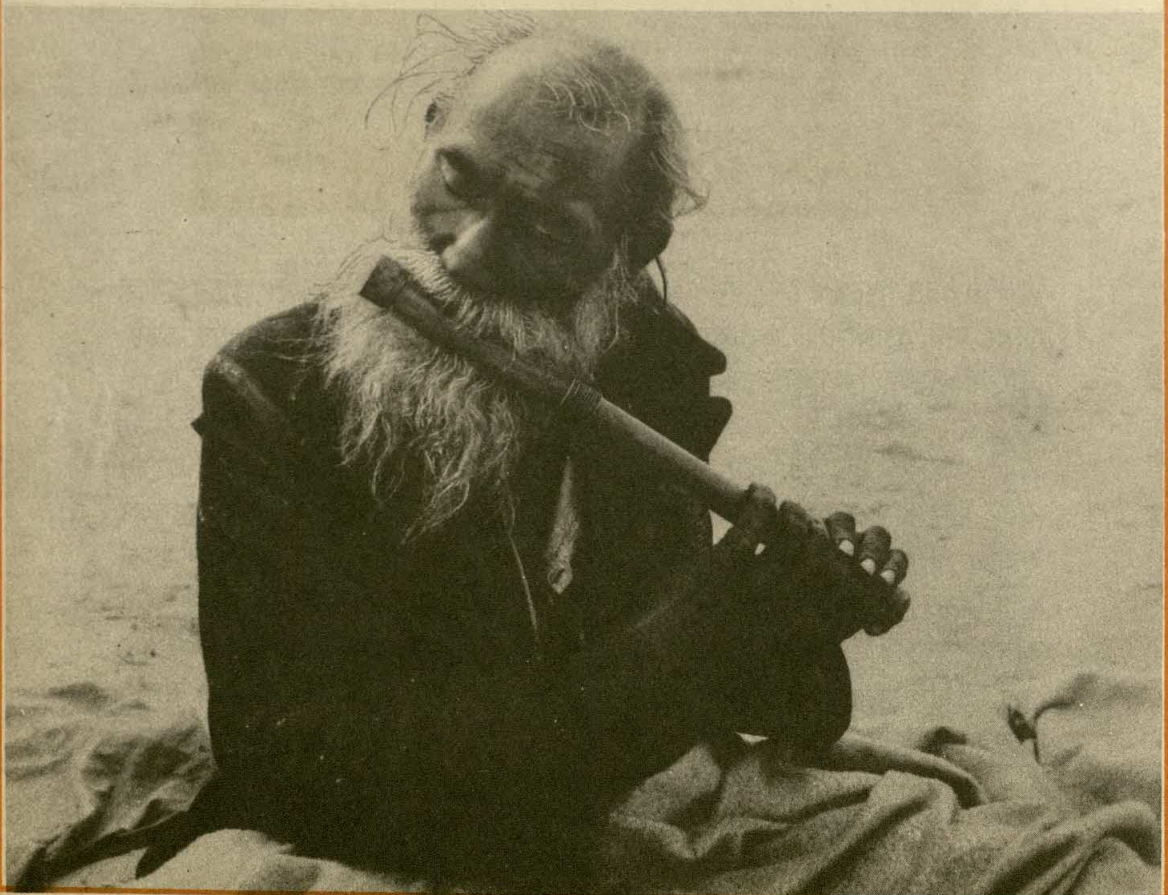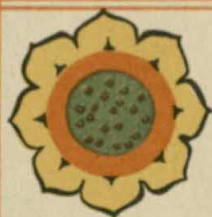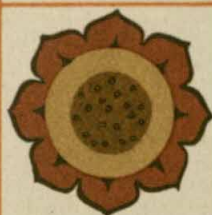
৪

এ যুগে জন্মানোর মজা
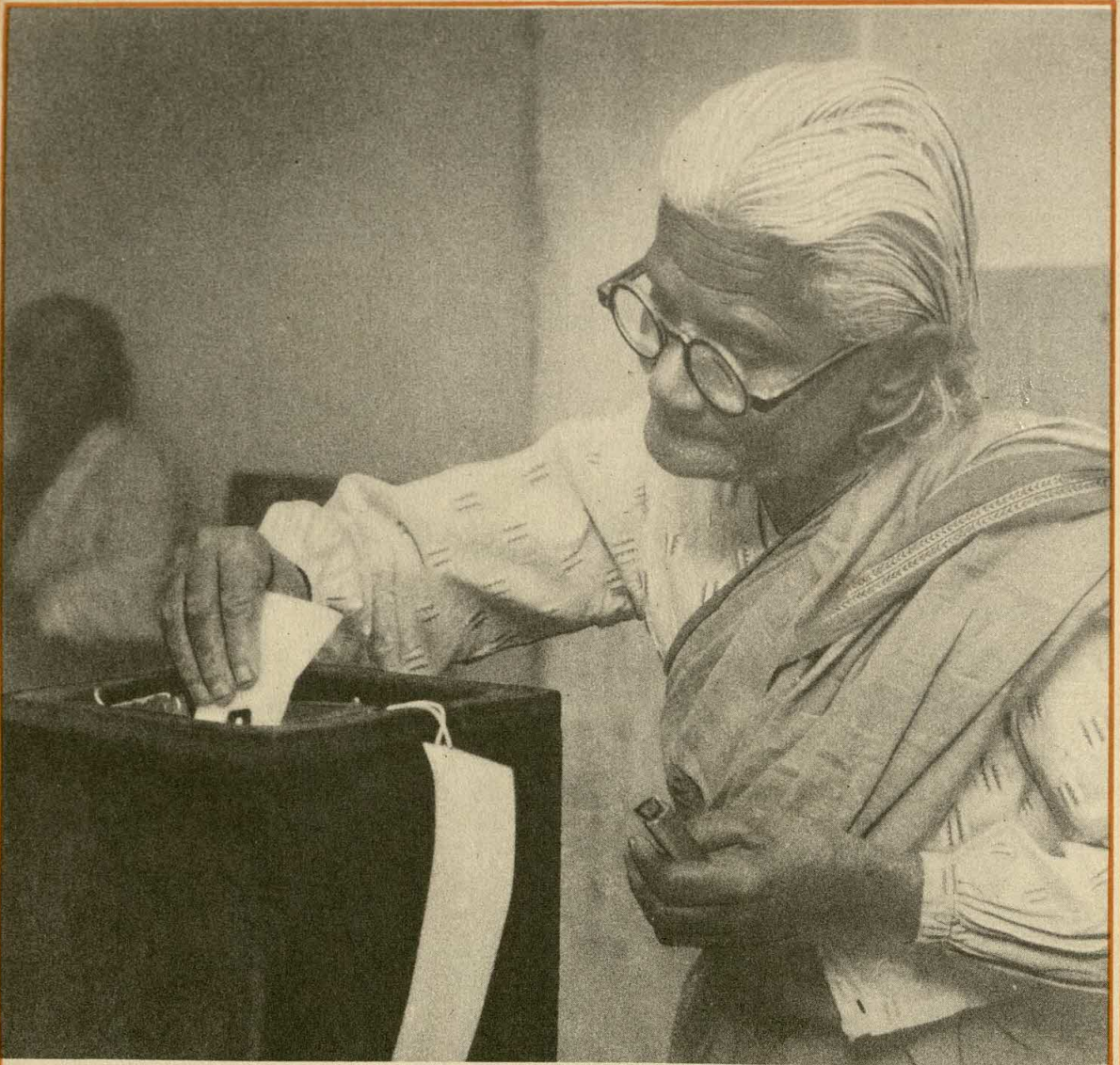
জীবনের প্রতিটি দিন, প্রতি মাস, প্রত্যেক বছর কারো কি কখনো সমান যায়? না, সমান যায়না। জীবনে এক একটা আনন্দ-উজ্জ্বল সময় আসে উৎসাহ উদ্দীপনায় ভরা—সেইসব সময়ের কথা ঘুরে ফিরেই মনে আসে। হয়তো একা একা কিংবা বন্ধুদের সঙ্গে কোথাও ঘুরতে গিয়ে নতুন কিছু দেখে এসেছো, মনে রাখবার মতো কোনো একজন লোকের সঙ্গে হয়তো তোমার আলাপ হয়েছে, হয়তো তুমি একটা খেলার এরোপ্লেন বানিয়ে উড়িয়েছো, নিজের হাতে হয়তো পুতুলের

কাপড় সেলাই করেছো, হয়তো জীবনের প্রথম কবিতা লিখেছো, কিংবা কোনো বিশেষ কারণে সারাটা দিন ধরে প্রচুর মজা করছো হয়তো—তোমার জীবনের দেয়ালপঞ্জীতে এইসব লাল টুকটুকে দিনগুলোর কথা তুমি ভুলতে পারোনা।

দেশ বা জাতির জীবনেও কখনো কখনো এরকম সুসময় আসে। দেশের লোক তখন সৃষ্টির আনন্দে এমন একটা কিছু গড়ে তোলে যা দেশের কাজে লাগে, দেশকে শক্তি দেয় অথবা নিছক আনন্দ দেয়। তোমার জীবনে সুদিন হয়তো একটি দিনের কথা, দেশ বা জাতির জীবনে তা হয় স্বর্ণযুগ।

আজকের ভারতে সেইরকম একটি সুসময়ের সূত্রপাত হয়েছে। গত পঁচিশ বছরের মধ্যে ভারত যে কত নতুন কাজে হাত লাগিয়েছে ভাবতেও অবাক লাগে। এমনটা ভারতের ইতিহাসে আগে কখনো ঘটেনি।

বিশ্বের ইতিহাসেও বর্তমান কাল নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। তোমার মা বাবা যখন তোমার বয়সী ছিলেন কখনো কি ভাবতে পারতেন যে মানুষ একদিন চাঁদে পা দিয়ে হেঁটেচলে বেড়াবে অথবা মঙ্গল গ্রহে অভিযান করার জন্য তোড়জোড় করবে? এইসব অতি আশ্চর্য ব্যাপারগুলি আজ আমাদের চোখের সামনেই ঘটতে লেগেছে।

কেবল ঘটেছে বললে যথেষ্ট বলা হয়না, তোমার আমার কাছে এসব ঘটনা এক প্রকার গা-সহা হয়ে গেছে। এতে আমরা তেমন অবাক হইনা আর। এটা সম্ভব হল কী করে? এমন হওয়ার অন্যতম কারণ এই যে আজ রেডিয়ো ও খবরকাগজ মারফত পৃথিবীর দূরতম প্রান্তে কখন কী ঘটছে না ঘটছে, তার তাজা খবর তোমার কাছে এসে পৌঁছুচ্ছে। তোমার যিনি প্রপিতামহ তার কাছে এসব খবর এসে পৌছুঁত না। তোমার আগেকার যুগের ছেলেমেয়েরাও এত শত খবর পেত না, আজ পৃথিবী যেন তোমার পাশের ঘরের প্রতিবেশী।

আজ ভারত জুড়েও প্রবল উত্তেজনা—এ দেশেও অনেক ঘটনা ঘটতে লেগেছে। তুমি হয়তো বলবে, 'সারা পৃথিবী জুড়েই তো সারাক্ষণই কিছু না কিছু ঘটছে। আজকের দিনে ভারতে যা ঘটছে তা নিয়ে মাতামাতি করার মতো এমন কী আছে?' জবাবে বলতে হয় ভারতে আজ এমন সব জিনিস

ঘটছে যার বেশির ভাগ অনেক আগেই ঘটা উচিত ছিল। যথাসময়ে এসব জিনিস আমরা করে উঠতে পারিনি বলে অন্য পাঁচটা কাজের সঙ্গে সঙ্গে এসব কাজও আমাদের করতে হচ্ছে। সেই সঙ্গে ভবিষ্যতের জন্যও আমাদের প্রস্তুতি পর্ব চলেছে। এ যেন আসচে হপ্তার বাড়ির কাজ আজকেই শেষ করে রাখা, যাতে ডাক এলেই নতুন কোনো কাজে হাত লাগাতে দেরি না হয়। তা হলেই বুঝতে পারো একই সময়ে এক সঙ্গে কত কাজ আমাদের সামাল দিতে হচ্ছে—এযেন গত কালের কাজ, আজকের কাজ এবং আসচে কালের কাজ—একই সঙ্গে করবার চেষ্টা। কেন আমরা এমন করছি? তার কারণ আর কিছু নয়—অনেক সময় আমাদের বৃথা নষ্ট হয়ে গেছে, তার জের আমাদের টানতে হচ্ছে এবং সেই সঙ্গে আমাদের এগিয়ে যাবার পথ করে নিতে হচ্ছে। এ যদি আমরা না করি তাহলে পৃথিবীর প্রগতিশীল দেশগুলি ক্রমাগত এগিয়ে চলবে, আর আমরা সব সময় পিছিয়ে পড়ে থাকব। বহু শতাব্দী ধরে আমরা একই বিন্দুতে স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। অন্যান্য দেশ আমাদের পাশ দিয়ে সদর্পে সামনে পা ফেলে চলে গেছে—আজো তাদের সেই চলার বিরাম নেই। আজ তাই হাঁটি হাঁটি পা পা করে চলার আর উপায় নেই—আজ আমাদের সর্বশক্তি সংহত করে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যেতে হবে এগিয়ে-চলা দল ধরে ফেলতে।

আজ যে শিশুর পাঁচ বছর বয়স, সে যদি বিশ বছর ধরে কুম্ভকর্ণের মতো নিদ্রা দিয়ে পঁচিশ বছর বয়সে জেগে ওঠে—তার কী দশা হয় তাহলে, একবার ভেবে দেখো। বিশ বছর ধরে বেচারা স্কুল কলেজে পড়লনা, খেলাধুলো করলনা, একটা কোনো কাজের জন্য নিজেকে তৈরি করে নিতে পারলনা, জীবিকা অর্জন করার কোনো সুযোগ সুবিধা পেলনা, কোনো লোকজনের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হলনা, নিজের শক্তি পরখ করে দেখার কোনো উপায় পেলনা সে। বিশ বছরের ঘুমঘোর কেটে গেলে সে ছেলে কী করবে একবার আন্দাজ করো তো! বিশ বছর ধরে যাকিছু সে করতে পারেনি, সেই সমস্ত রকম কাজ সে চাইবে করতে একই সঙ্গে। দশ বিশটা কাজ এক সঙ্গে করাটা তো সহজ ব্যাপার নয়। তাকে পরিশ্রম করতে হবে প্রচুর এবং বিশ বছর ধরে যে সব কাজ করা যায়নি সেগুলি যথাসম্ভব তড়িঘড়ি সম্পন্ন করার মতো এমন কায়দা কৌশল বের করতে হবে যাতে পাঁচ থেকে পঁচিশ বছর বয়সে পড়তে তার খুব বেশি সময় না লাগে। ভারত আজ যা করতে চাইছে তা অনেকটা এই রকম।

মানুষের বেলা যেমন দেশের বেলাও তেমনি, বয়োবৃদ্ধির একটা নিজস্ব ধরন আছে। কখনো কখনো এমন দেশ দেখা যায় যার বয়স হয়েছে, কিন্তু বয়সের অনুপাতে বাড় বাড়েনি। সে যাই হোক, দেখা যায় প্রত্যেক দেশই অবস্থা থেকে অবস্থান্তরে যায় এবং প্রত্যেকেই চেষ্টা করে নিজ নিজ অবস্থার উন্নতি সাধন করতে। তোমরা অনেকেই নিশ্চয়ই জানো আমাদের দেশে আমরা গণতন্ত্র প্রবর্তন করেছি—তার অর্থ এই যে জনগণই এদেশের রাজা—তারা নিজেরাই নিজেদের দেশ শাসন করে। লেখাপড়া জানুক বা না জানুক প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের অধিকার আছে বলবার যে কোন পথে দেশ চলবে। এটা আমাদের কাছে এখন আর আশ্চর্য মনে হয়না কারণ এখন গণতন্ত্র হল আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গবিশেষ। অভ্যাস হয়ে গেছে বলে গণতন্ত্রকে আমরা মেনে নি, সে বিষয়ে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা আমাদের মনে উদয় হয়না। কিন্তু একটু বড়ো হয়ে এসব ব্যাপার নিয়ে যখন ভাবতে শিখবে, বুঝবে গণতন্ত্র কী বিরাট জিনিস। দেশের শাসন ব্যাপারে দেশের প্রত্যেকটি প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের মতামত দেবার অধিকার আছে এবং সেই মত যখন অধিকাংশ লোকের মত হয় তখন শাসকেরা তা শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করতে বাধ্য থাকেন—একি যেমন তেমন কথা? দেশ বা জাতি প্রাপ্ত বয়স্ক হলেই দেশের লোককে এমন চরম অধিকার দেয়। নিজেদের নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে আমরা আর শিশু নই, আমরা বড় হয়ে উঠেছি।

গণতন্ত্রের কাঠামো কেমন হবে, গণতান্ত্রিক উপায়ে কীভাবে দেশ শাসনের কাজ চলবে—এসব বিষয়ে অনেক ধারণা আমরা ব্রিটিশ পার্লামেন্ট-এর কাছ থেকে শিখেছি। তোমরা হয়তো জানোনা ব্রিটেন-এর মতো প্রগতিশীল দেশকেও বেশ কয়েক শো বছরের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে তাদের নিজেদের দেশে গণতন্ত্র চালু করা সম্ভব হয়েছিল। অনেক সব আন্দোলন পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে তাদেরো চলতে হয়েছিল। রাজারাজড়ার স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে তাদের কম লড়তে হয়নি। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সূত্রপাত ব্রিটেনে হয় রেনেশাঁস-এর পর থেকে। রেনেশাঁস-এর অর্থ নব জাগরণ। সংকীর্ণতা, কুসংস্কার ও অন্যায়ের মধ্যে সারা দেশ আচ্ছন্ন ছিল। সেই অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসাই হল রেনেশাঁস। তারপর এল রিফর্মেশন অর্থাৎ সংস্কার সাধন। ধর্মের নামে গোঁড়ামি ও আচার বিচারের কড়াকড়ি থেকে মুক্তি লাভের সংগ্রাম হল এই রিফর্মেশন। তারপর বিরাট পরিবর্তনের আরো একটা প্রবাহ এল ইন্‌ডাষ্ট্রিয়েল রিভোল্যুসন-

এর রূপ ধরে। যন্ত্রপাতি এল, কলকারখানা বসল—মানুষ নিছক গতর খাটিয়ে, মেহন্নৎ করে, যেসব জিনিস উৎপাদন করত, এখন তার চেয়ে বহুগুণ বেশি উৎপাদন করতে লাগল মিতশ্রমিক যন্ত্রের সাহায্যে। তাতে দেশের সম্পদ প্রচুর বৃদ্ধি পেল। কিন্তু তা হলে কী হয়, শিল্প বিপ্লবের পরেও প্রায় একশো বছর কেটে যাবার পর ব্রিটেনের লোক বুঝল সে সম্পদ দেশের সম্পদ—তাতে রাজার কিংবা শিল্পপতির একচেটিয়া অধিকার থাকতে পারেনা, সে সম্পদ কীভাবে দেশের উন্নতির জন্য লাগানো যায় তা দেশের জনগণই স্থির করবে। এইভাবে রাজনীতির ক্ষেত্রে গণতন্ত্র প্রবেশ করল। এর পরের ধাপ হল সমাজতন্ত্রানুযায়ী সকল প্রজার হিত সাধন অর্থাৎ ওয়েলফেয়ার ষ্টেট। সেই রাষ্ট্রের চূড়ান্ত লক্ষ্য প্রজাসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন। বড় হয়ে এইসব কথা তুমি আরো ভালো করে বুঝতে পারবে। আপাতত এইটুকু জেনে রাখো এইভাবে বড়ো হয়ে উঠতে ব্রিটেনের সময় লেগেছে প্রায় পাঁচ শো বছর।

আয়তনে ভারত ব্রিটেনের চেয়ে চৌদ্দ গুণেরও বড়ো, লোকসংখ্যাও অন্ততপক্ষে দশ গুণ বেশি। কিন্তু তাহলে কি হয়, ব্রিটেনের যে অবস্থায় পৌঁছুতে লেগেছে পাঁচশো বছর, আমরা আমাদের বর্তমান প্রজন্মেই অর্থাৎ ত্রিশ-চল্লিশ বছরের মধ্যে সেই অবস্থায় পৌছুতে চাইছি। আমাদের বেলা পর পর না এসে, রেনেশাঁস, রিফর্মেশন ও ইন্ডাষ্ট্রিয়েল রিভোল্যুশন যেন একসঙ্গে এসে গেছে। আমরা একই সঙ্গে চাইছি শিক্ষার প্রসার, কৃষির উন্নতি, নতুন নতুন শিল্পের প্রবর্তন। সেই সঙ্গে জাত, ধর্ম ও সম্প্রদায়ের নামে যেসব শাসন বারণ মানুষকে মানুষের থেকে পৃথক করে রাখে—সেই সমস্ত কুসংস্কার আমরা ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে চাইছি। সংক্ষেপে বলতে গেলে আমরা নিরন্তর সংগ্রাম করে চলেছি অজ্ঞানতার সঙ্গে, অন্ধবিশ্বাসের সঙ্গে, কর্মে অপটুতার সঙ্গে। এক কথায় আমরা চাইছি আধুনিক প্রগতির সঙ্গে কদম মিলিয়ে চলতে। এই যে ব্যাপক ও বিরাট পরিবর্তন আমাদের চোখের সামনে ঘটছে, এর কি নাম দেওয়া যায় বলো তো? যদি বলি মহা-ভারতীয়-বিপ্লব তবে-কি খুব ভুল বলা হবে?

তুমি ফরাসী, রুশ ও চীনা বিপ্লবের কথা পড়ে থাকবে। মারামারি কাটাকাটি ছিল সেইসব বিদ্রোহ বিপ্লবের অপরিহার্য অঙ্গ। অবশ্য বলতে পারো হিংসক উপায়ে যুদ্ধ করলেও বিপ্লবীদের উদ্দেশ্য ছিল মহৎ এবং তাতে স্বার্থের

নামগন্ধ ছিলনা। আমাদের বিপ্লব ঘটেছে এবং ঘটছে শান্তিপূর্ণভাবে, সূচনায় মনের জগতে আলোড়ন এসেছে, চিন্তাভাবনার অদলবদল হয়েছে। নতুন অনুভব ও উদ্দীপনা নিয়ে তখন আমরা শাসক, শোষক ও উৎপীড়কদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছি। মনকে আগে প্রস্তুত করে কাজে নাবার ধরনটাও ভারতীয়দের নিজস্ব।

এই ধরনেই আমরা বিদেশী শাসনের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি লাভ করেছি। তোমরা নিশ্চয় শুনে থাকবে দেশ স্বাধীন হবার আগে, প্রায় দেড় শো বছর ধরে ভারত ছিল ইংরেজ শাসনের অধীনে। দীর্ঘকাল ধরে বিদেশী শাসক এ দেশকে কেবল শোষণ করেছে মুনাফার লোভে, প্রজাসাধারণের কিসে হিত হয় সেদিকে কোনো দৃষ্টি দেয়নি। বহুকাল ধরে প্রজারা এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি, টুঁ-শব্দটি পর্যন্ত করতে পারেনি অন্যায়ের প্রতিবাদে। তারপর যখন অসহ্য হল, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রচণ্ড শক্তির বিরুদ্ধে যখন সহরে নগরে গ্রামে প্রতিরোধ গড়ে তুলল—তখনো তারা বন্দুক তরোয়াল প্রভৃতি হিংসার হাতিয়ার নিয়ে মোকাবিলা করতে চায়নি। শেষ পর্যন্ত এই যুদ্ধে কিন্তু জয়ী হল ভারতের নিরস্ত্র নিরন্ন জনগণ। ব্রিটিশ প্রভুদের শক্তিমত্তা, ঐশ্বর্য বৈভব এবং প্রভূত মারণাস্ত্র পরাভব স্বীকার করতে বাধ্য হল একতাবদ্ধ ভারতের সংকল্পের দৃঢ়তার কাছে।

ভারতের এই স্বাধীনতা যুদ্ধের কাহিনী এ দেশের ইতিহাসের একটি গৌরবময় অধ্যায়। পরে আমরা সেই প্রসঙ্গে আসব। আপাতত এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে আমাদের কাজের ধরনধারন—বিশেষ করে মহৎ কাজের ক্ষেত্রে—অন্যদের থেকে একটু আলাদা।

বুঝতেই পারো ভারতীয় ধরনে যুদ্ধ করতে হলে সমস্ত জনগণের মনে সাহস ও আত্মপ্রত্যয় সঞ্চার করতে হয়। সাম্প্রতিক কালেও আমাদের এই সাহস ও আত্মপ্রত্যয়ের পরিচয় আমরা দিয়েছি দেশের সাধারণ নির্বাচন ব্যবস্থায়। নির্দিষ্ট বয়সের প্রত্যেক ভারতীয় নারী পুরুষ নির্বিশেষে ভোটের অধিকার পেয়েছে--ধনী ও দরিদ্রে, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতে কোনো তফাত করা হয়নি। ভোটের অধিকার সবার সমান। নিজেদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে দিয়ে নিজেদের দেশ আমরা নিজেরাই শাসন করব—বয়স্কের ভোটাধিকারের মূল কথা হল এই। অন্য দেশের শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা করে দেখলে বুঝতে পারবে

প্রগতির পথে এগিয়ে যাবার জন্য আমরা কত সাহসে পদক্ষেপ করে চলেছি। এই সেদিন পর্যন্ত সুইজারল্যাণ্ড-এর মতো উন্নত দেশেও প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের ভোট দেবার অধিকার ছিলনা। আমরা নির্বিচারে সবাইকে এই ক্ষমতা দিয়েছি কেন জানো? অধিকার পেলেই লোকে ভাবতে শেখে কীভাবে অধিকার প্রয়োগ করলে দেশের ও দশের মঙ্গল হয়। বৃথা সময় নষ্ট না করে যদি আমাদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তুলতে হয়—তাহলে এই এক মাত্র সিধে রাস্তা, আর অন্য রাস্তা নেই।

তাহলেই দেখো, গত পঁচিশ বছরে আমাদের কত কী করতে হচ্ছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই যে ভারত সরকার জোর করে এই সমস্ত পরিবর্তন দেশবাসীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছেন না। দেশের লোকই দেশ শাসনের ব্যাপারে এমন সব অদল বদল ঘটাতে চাইছে যা না কি তাদের জ্ঞান বিশ্বাস মতে দেশের উন্নতি সাধন করবে।

সেই জন্যই তো বলছিলাম গত পঁচিশ বছরে জাতির জীবনে একটি উদ্দীপনাময় যুগের সূত্রপাত হয়েছে। পৃথিবী জুড়েও এখন কত কী যে ঘটছে তার ঠিক নেই। এক শো বছর আগে না জন্মে আজকের যুগে যে জন্মেছে তার কত সৌভাগ্য—একবার ভেবে দেখেছো কি? যদি এ বিষয়ে কোনো দ্বিধা সন্দেহ থাকে তাহলে একবার না হয় পিছন ফিরে তাকানো যাক, দেখা যাক একশো বছর আগে ভারতের অবস্থা কেমন ছিল এবং তখন ভারতীয় হয়ে জন্মাতে যদি, সে কেমন হত।
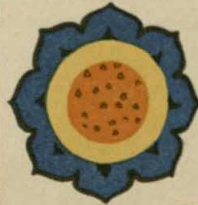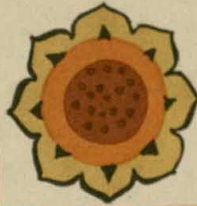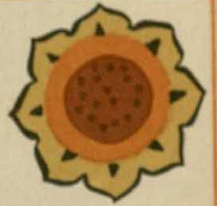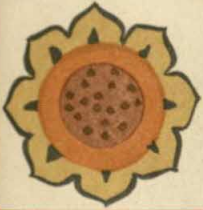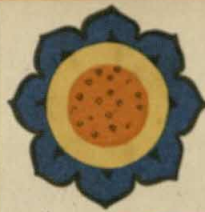
৫

আজ থেকে একশো বছর আগে

একশো বছর আগে আমরা ছিলাম পরাধীন জাতি। ভারত ছিল ব্রিটিশের শাসনে। গোড়ায় ইংরেজ এদেশে এসেছিল বাণিজ্য করতে। আস্তে আস্তে বণিকের মানদণ্ড ছেড়ে হাতে তুলে নিল রাজদণ্ড ক্রমে সারা দেশের দণ্ডমুণ্ডের অধিপতি হয়ে বসল। দীর্ঘ দেড়শো বছর ধরে ইংরেজ এদেশ শাসন করেছে যদিও, শেষ পর্যন্ত তারা বিদেশীই

থেকে গেছে—অন্য বিদেশীর মতো এদেশবাসীর সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে যেতে পারেনি। দেশ থেকে দেশের লোকের কাছ থেকে যাকিছু পেয়েছে শোষণ করে নিজেদের দেশে নিয়ে গেছে ভারতের দারিদ্র্য ও দুরবস্থার দিকে দৃক্‌পাত না করে। এমন লুটপাট এর আগে কোনো বিদেশী করেনি। এমনটা ঘটল কেমন করে?

তোমরা জান দুর্বল শরীরে রোগের বীজাণু যত সহজে প্রবেশ করতে পারে, সুস্থ সবল শরীরে তেমনটা পারে না। জাতি হিসাবে আমরা তখন দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম বলে ইংরেজ এত সহজে এদেশে অনুপ্রবেশ করতে পেরেছিল। তারা এসেছিল ভারতের ঐশ্বর্যের খ্যাতি শুনে। বাণিজ্যের লোভে আরো অনেক দেশই এ দেশে এসেছিল। ধনৈশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান লোক যদি দুর্বল হয় তাহলে তার বিপদ অনেক—সে তো সহজেই বুঝতে পারো। ব্রিটিশের খপ্পরে পড়বার পর এ দেশবাসীর দুর্দশা চরমে পৌঁছল। এ দেশের ধনদৌলত শুষে নিয়ে হাজার হাজার মাইল দূরবর্তী ব্রিটেন ফুলে ফেঁপে উঠল। স্পর্ধিত শাসকশ্রেণী ভারতীয়দের মানুষ বলে গণ্য করত না, ঘৃণা করে দূরে রাখত।

১৮০০ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে একশো বছরে না খেতে পেয়ে ভারতে লোক মরেছিল তিন কোটি বিশ লক্ষেরও বেশি। পোল্যাণ্ড কিংবা স্পেন এর মতো দেশের সমগ্র লোক সংখ্যাও এর চেয়ে কম। বেঁচে ছিল যারা তাদের মধ্যে বেশির ভাগ লোক আধপেটা খেয়ে কোনো প্রকারে প্রাণ ধারণ করত। দেশে দুর্ভিক্ষ লেগেই থাকত। দুর্ভিক্ষে বিশ ত্রিশ লক্ষ লোক মরে গেলেও কেউ আশ্চর্য বোধ করত না। ইংরেজ যদি ভারতীয়কে নিজেদের মতো মানুষ বলে গণ্য করত, এরকমটা কখনো হতে পারত না।

দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ তবু দুর্ভাগ্য বলে মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু নিজ বাসভূমে পরবাসীর মতো ঘৃণ্য হয়ে থাকা—সে কি সহ্য করা যায়? ইংরেজদের পার্ক-এ, ক্লাবে-এ, রেস্তোরাঁয়—এমন কি ইংরেজদের রেলকামরাতেও—ভারতীয় কেউ ঢুকতে পেত না। এরকম হাজারো উপায়ে ইংরেজ দেখাত যে তারা রাজার জাত—উঁচু জাত। কসুর করলেও ভারতীয় জজ-এর এজলাসে তারা দাঁড়াত না। সমানে সমানে মেলামেশা দূরে থাক, ভারতীয়দের ‘কালা আদমি’ বলে তারা দূরে রাখত। শাসন সংক্রান্ত বড় বড় কাজে, মোটা মাইনের উচ্চ পদে

বসত ইংরেজ– ভারতীয়েরা হত অধস্তন কর্মচারী। ভারতীয় সেনার মধ্যে যারা বীর, যারা সত্যকার সাহসী– তারা বড় জোর হত হাবিলদার। বিদ্যায়, বুদ্ধিতে,

কর্মদক্ষতায় শ্রেষ্ঠ হলেও ভারতীয় কাউকে কখনো দায়িত্বপূর্ণ পদে বসানো হতনা। এদেশে কী করা হবে না হবে তার সিদ্ধান্ত নেওয়া হত লণ্ডনে– এদেশে নয় এবং সিদ্ধান্ত নিত এমন সব লোক– ভারতীয়দের সম্বন্ধে যাদের বিন্দু মাত্র মাথা ব্যথা ছিলনা। এই লাঞ্ছনা অপমান ভারতীয়দের বুকে গভীরভাবে বাজত সন্দেহ নেই– কিন্তু এ সবের প্রতিকার করবে এমন সাহস তাদের ছিলনা। মুষ্টিমেয় কিছু দুঃসাহসী লোক প্রতিবাদ করত তৎসত্বেও।

আমাদের এগিয়ে যাবার সমস্ত রাস্তা ছিল বন্ধ, কিন্তু তাই বলে যে আমরা একটা জায়গায় স্থিতিশীল থেকে গেলাম তারও উপায় ছিলনা। পৃথিবীর আর সমস্ত দেশ যখন সমানে এগিয়ে যাচ্ছে, আমরা পিছু হটতে লাগলাম। পশ্চিমের দেশগুলি দ্রুত সম্পদশালী হয়ে উঠতে লাগল, নতুন নতুন যন্ত্র উদ্‌ভাবন করে উৎপাদনের ক্ষেত্রে তারা কায়িক শ্রমের প্রয়োজন কমিয়ে আনল এবং সেই সঙ্গে ভোগ্য সামগ্রী বিলাসের সামগ্রী ক্রমাগত বাড়িয়ে তুলল। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তারা অনেক নতুন জিনিস শিখতে লাগল। নানা দিক থেকে তাদের জীবনের মান উন্নত হতে লাগল। এ সব কিছু থেকে আমরা কিন্তু বঞ্চিতই থেকে গেলাম। কিছু কিছু এদেশী লোক কল কারখানা পত্তন করেছিল সত্য, কিন্তু ব্যবসা বাড়ানোর কোনো প্রস্তাব পেশ করলেই ব্রিটিশ সরকার 'না' বলে হাঁকিয়ে দিত। ঘুমন্ত পুরীর রাজকন্যার মতো বহু বছর ধরে দেশ ছিল যেন ঘুমে অচেতন।

সূক্ষ্ম বস্ত্রবয়নে ও দৈনন্দিন ব্যবহারের বস্তু কারুশিল্পে মণ্ডিত করে তোলায় এক কালে ভারতের নাম ছিল জগৎজোড়া। অদৃষ্টের এমনি বিপাক যে সেই দেশকেই কিনা ব্রিটিশ যুগে ম্যাঞ্চেষ্টারে মিলে প্রস্তুত বস্ত্র কিনে লজ্জানিবারণ করতে হত। আরো মজার কথা এই যে তুলো চালান যেত ভারত থেকে, আর কাপড় তৈরি হত বিলেতের কাপড় কলে আর নিত্যব্যবহারের দেশী জিনিসের কেনাবেচা তো ইংরেজ এক প্রকার বারনই করে দিল, 'মেড ইন্ ইংল্যাণ্ড' ছাপ দিয়ে সবকিছু চালান হয়ে আসতে লাগল রাজার দেশ থেকে। রাজপুত্র তো এককালে সওদাগরপুত্র ছিল, সুতরাং মুনাফার
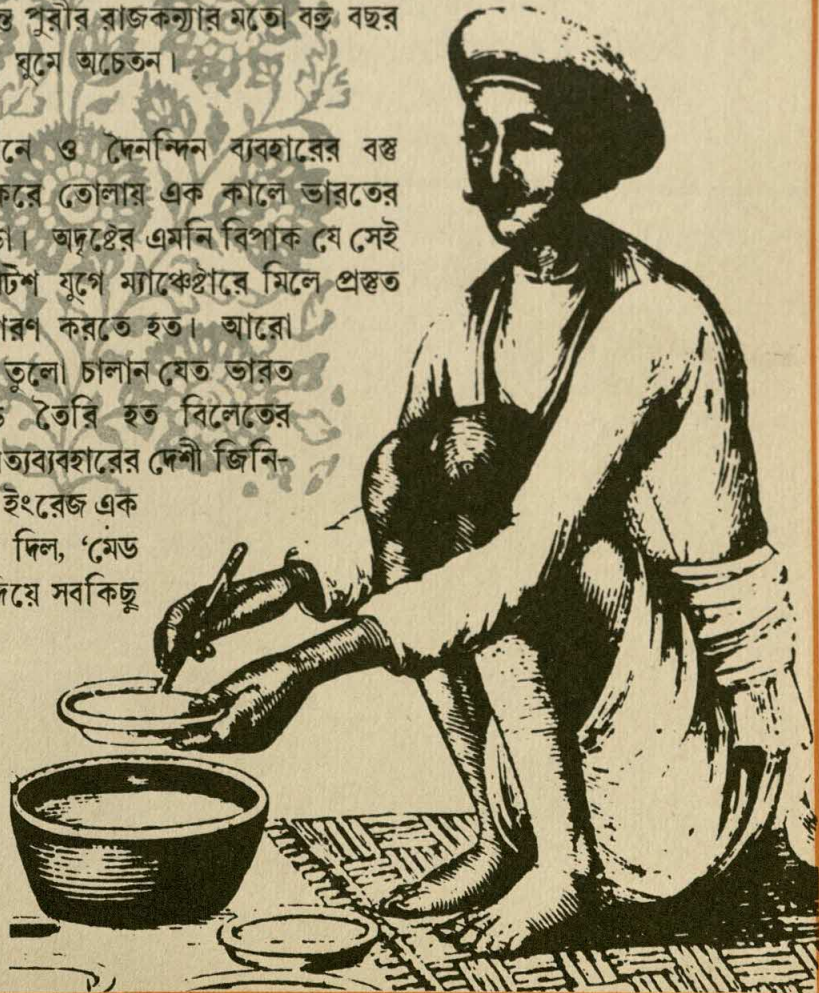
নেশা যাবে কোথায়! ফলে ভারতের ভালো ভালো তাঁতি ও কুশলী শিল্পী মার খেল প্রচণ্ড—কারণ হাতের কাজের জিনিসের তখন আর কদর রইলনা, বিলেতী কলকারখানার তৈরি অপেক্ষাকৃত সস্তা মালে বাজার ছেয়ে গেল।

যন্ত্রশিল্পে অন্যান্য দেশ খুবই এগিয়ে চলল, কিন্তু ব্রিটিশ প্রভুরা ভারতে কেবল এমন যন্ত্র আমদানী করল যার সাহায্যে এই বিরাট দেশকে কড়া শাসনে দাবিয়ে রাখা যায়। কাজে কাজেই বিলেত থেকে এল ষ্টীম ইঞ্জিন, পাতা হল রেলপথ দূর দূরান্তে, রাস্তাঘাট সাঁকো সেতুও বানাতে হল। যানবাহনের সুবিধা না থাকলে কি এত বড় দেশকে বাগে আনা যায়!

বুদ্ধিমান ইংরেজ আরো একটি কাজ করলেন—কিছু ভারতীয়কে ইংরেজী ভাষা শিখিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে দিলেন—যাতে তারা শাসক শ্রেণীর তল্পীবাহক হতে পারে। খাস বিলেত থেকে অনেক সংখ্যায় কেরাণী
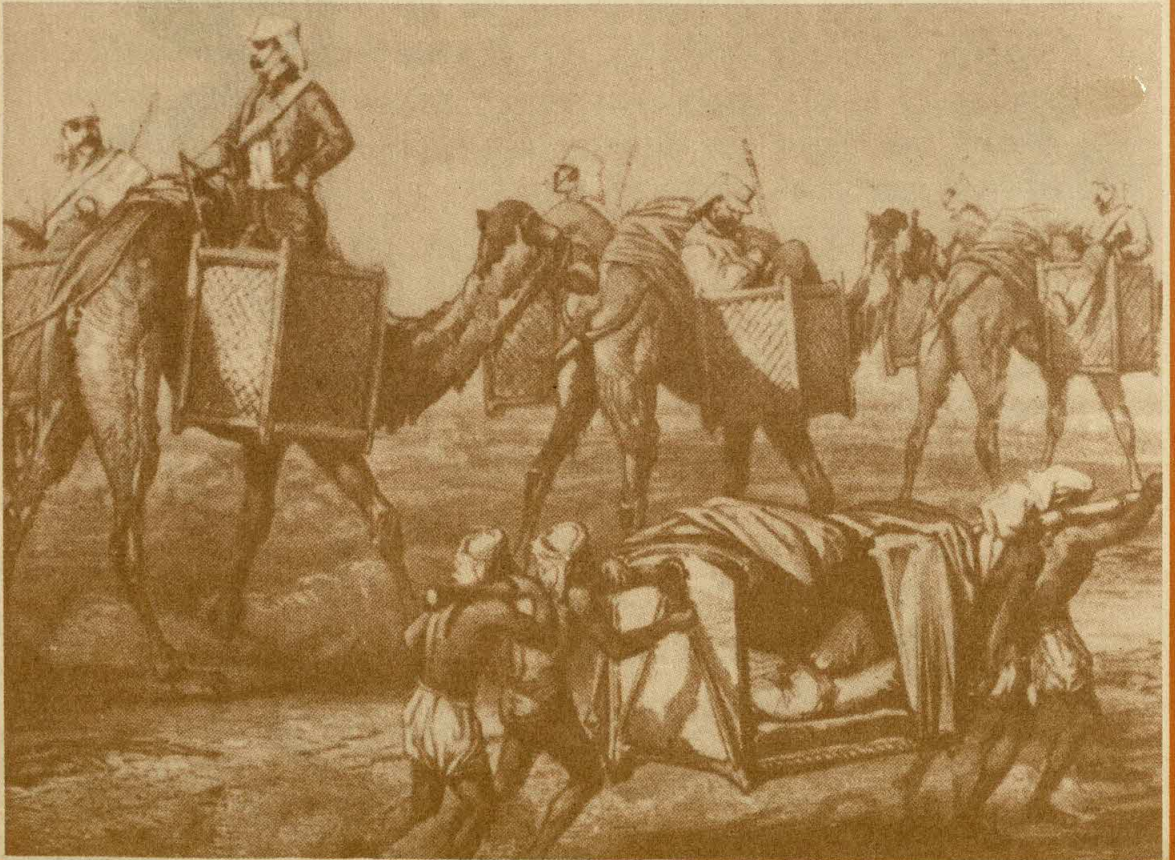
আমদানী করাটা সহজসাধ্য হতনা, খরচও হত দেদার। কলমপেষার জন্য তার চেয়ে অনেক সহজ দেশী কেরাণী বহাল করা।

তোমরা তো জানোই এ দেশের শতকরা আশি জন লোক থাকে গ্রামদেশে। গ্রামের কীসে সুবিধা অসুবিধা তা দেখতে ইংরেজদের বয়ে গেছে। সুতরাং গ্রামবাসীদের দুর্দশার অবধি রইলনা। অথচ দেশের জনসংখ্যা বাড়তে লাগল প্রবল হারে। তাতে দুরবস্থা বাড়ল প্রচুর। বাড়তি জনসংখ্যার হিসাবে খাদ্য তো বাড়ল না, বাড়ল কেবল দুঃখ দারিদ্র্য। খিদে মেটাবার জন্য খাদ্য যা এবং যতটুকু পাওয়া যেত, তাতে পেটও ভরতনা, পুষ্টিও হত না। ফলে শরীর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল, আর সেই সুযোগে ম্যালেরিয়া, বসন্ত, কলেরা প্রভৃতি মহামারী গ্রাম অঞ্চলে কায়েম হয়ে বসল। বেশির ভাগ লোকের খাবার পয়সাই জুটত না, ওষুধের দাম জোগাবে কোথা থেকে? তা ছাড়া গ্রামে না ছিল

ডাক্তার না হাসপাতাল। সেসব শৌখিন ব্যাপার শহুরে বাবুদের জন্য কেবল। উপরন্তু অধিকাংশ গ্রামের লোকের ঘটিবাটি পর্যন্ত বাঁধা থাকত মহাজনের কাছে, দেনার দায়ে। তখন বেঁচে থাকার মেয়াদ ছিল বড় জোর সাতাশ বছর। মাথা গোঁজার ঠাঁই বলতে একটা মাটির কুটির। ছেলেপিলেকে পাঠশালা স্কুলে পাঠানো দূরের কথা, খেতে পরতে দেবার পর্যন্ত সঙ্গতি ছিলনা। অনেক গ্রামে পানীয় জল পর্যন্ত ছিল দুর্লভ বস্তু। শহরের অবস্থাও খুব যে ভালো ছিল তা নয়, সেখানকার বহুলোক ছিল বেকার, কাজ যারা পেত তারা মাইনে পেত যৎ-সামান্য। মনে হত ভবিষ্যৎ যেন অন্ধকার, কোথাও একটুও আশার আলো নেই।

ব্রিটিশ সরকার যদি কেবল ব্রিটিশ স্বার্থ সংরক্ষণ করে থাকেন—এতে আর আশ্চর্য কি! ভারতে তো সেই জন্যই উপনিবেশ পত্তন। তারা তো আমাদের উপকার করবে বলে এতদূর দেশ থেকে সমুদ্রপাড়ি দিয়ে আসেনি। বাঘ তো হরিণের উপকার করতে চায়না, তার ঘাড় মটকাতেই চায়। কিন্তু নিয়তি যে কোন পথে কোথায় নিয়ে যায় সব সময় ঠিক বুঝা যায় না। ইংরেজ আমাদের ঘাড়ে চেপে থাকবে বলেই এদেশে এসেছিল, কিন্তু ইংরেজই আমাদের সুযোগ সুবিধা ঘটিয়ে দিল তাদের ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলতে। এই অঘটন কেমন করে ঘটল—সেই কথাটা এখন বলি।

আগেই বলেছি ইংরেজ দেশময় রেলরাস্তা পেতেছিল, পথঘাট তৈরি করেছিল, ডাকঘর দিয়ে দেশ ছেয়ে ফেলেছিল—এ দেশকে ভালো করে শাসন করার জন্য। যানবাহন ও ডাক চলাচলের সুবিধা হবার ফলে দেশের লোক পরস্পরের কাছে আসার, পরস্পরকে জানবার সুযোগ পেল। কিছু ভারতীয় ইংরেজী ভাষা শিখেছিল বলে, উত্তরে দক্ষিণে পূর্বে পশ্চিমে যে যেখানে ছিল—
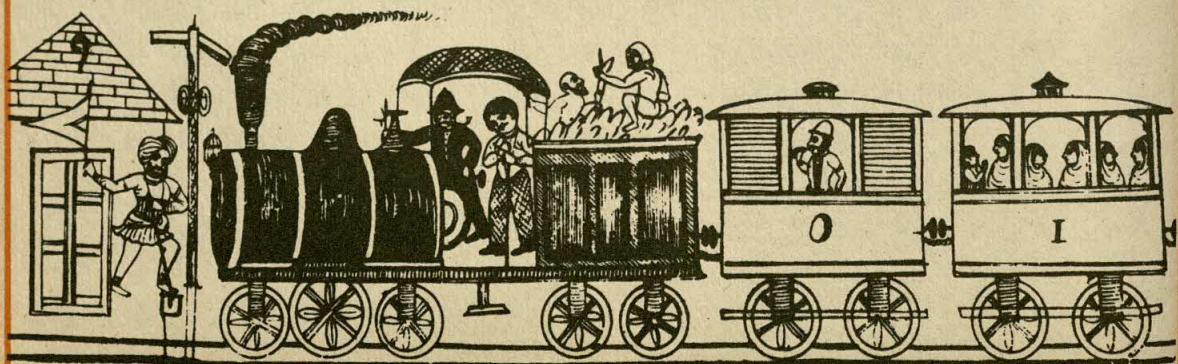
পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান করার সুবিধা হল। ইংরেজী বই ও খবর কাগজ মারফত তারা পাশ্চাত্য ভাবধারার সঙ্গে পরিচয় লাভ করল, জানতে পারল সেসব দেশে সাম্য, স্বাধীনতা ও মানুষের মনুষ্যত্বকে কত উঁচু স্থান দেওয়া হয়। তখন ভারতীয়দের মনে প্রশ্ন জাগল, সকল মানুষ যদি সমান হয় তাহলে অর্থ ও ক্ষমতার লোভে কেন একজাতি অন্য জাতিকে দাবিয়ে রাখবে? আর দাবিয়ে রাখতে চাইলেই বা কেন আমরা তাদের শাসন বারণ মেনে চলব? এসব প্রশ্ন মনে জাগতেই দেশের লোকের মন জেগে উঠল।

যানবাহন ডাক চলাচলের সুবিধা থাকায় এই ধরনের চিন্তাভাবনা দেশময় ছড়িয়ে পড়ল। দেশ যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল, মানুষের চিন্তার ধরনই গেল পালটে। এক এক করে বহু লোক মনে মনে বলতে লাগল, 'আমরাও মানুষ। মানুষ হয়ে বাঁচবার অধিকার আমাদেরও আছে। আমরা স্বাধীন হব, আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হব। মানুষ হিসাবে আমরা ইংরেজদের চেয়ে কিসে কম?' স্বাধীনতা অর্জনের আকাঙ্খা এইভাবে উন্মেষিত হল। যে দেশ এতদিন ঘুমে অচেতন ছিল, মুখে রা ছিলনা—সে যেন হঠাৎ জেগে উঠে কথা কইতে শুরু করল। প্রথমে চলল নীচু গলায় ফিসফাস, ক্রমে কণ্ঠস্বর উচ্চ থেকে উচ্চতর গ্রামে পৌছল অবশেষে লক্ষ লক্ষ কণ্ঠের দাবী পরিণত হল সমুদ্র গর্জনে। সে দাবী উপেক্ষা করার আর উপায় রইল না।

তারপর দেশময় যে আন্দোলনের সূচনা হল সাম্প্রতিক কালে সেরকমটি আর দেখা যায়নি। আন্দোলনকে ঠিক পথে এগিয়ে দেবার জন্য মহানেতারা একে একে এলেন—এলেন টিলক, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও আরো অনেক বরেণ্য
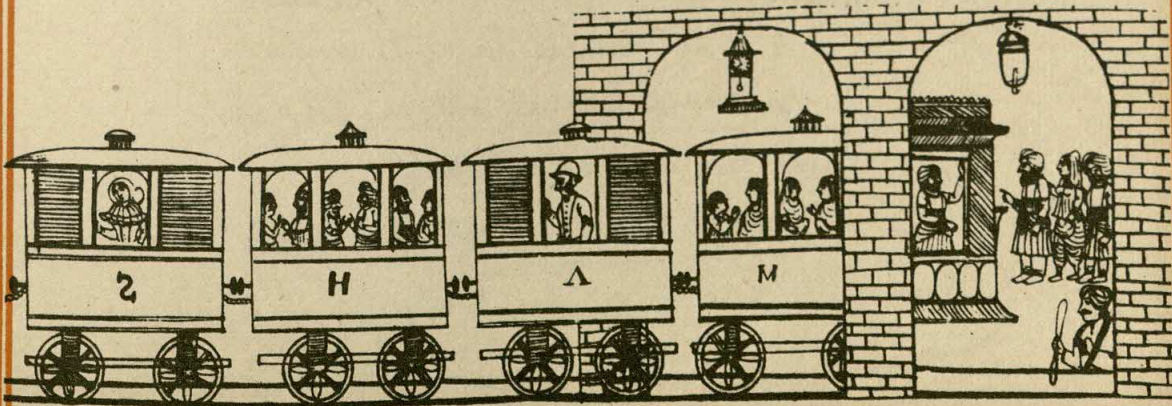
নেতা। তাঁরা তাঁদের নিজস্ব ধরনে একই ধ্বনি তুললেন, 'স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার। স্বাধীনতা আমাদের চাই।' অযুত কণ্ঠের প্রতিধ্বনি বেজে উঠল যুদ্ধের ভেরীর মতো। এইভাবে শুরু হল ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধ। সে এক অদ্ভুত যুদ্ধ—তাতে হিংসা নেই, অস্ত্র নেই।

VISVA-BHARATI
SANTINIKETAN, BENGAL.

Victim

You seemed from afar
Titanic in your mysterious majesty of terror.
With palpitating heart I stood before your presence.
Your knitted brows boded ill,
and suddenly burst down upon me
your blow with a crash.
My bones cracked,
with bowed head I waited for the final fury to come.
It came,
and I wondered if this was all of the menace?
With your weapon held high in suspense
you looked mightily big.
To strike me you came down
to where I crouched low on the ground.
You suddenly became small, and I stood up.
Great you are as death itself,
but your victim is greater than death.
From thence there was only pain for me
but no fear.

Rabindranath Tagore

৬
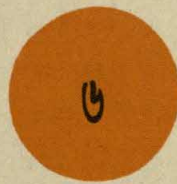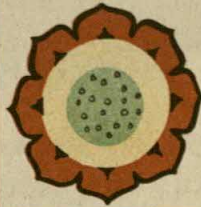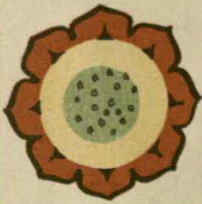
স্বাধীনতার যুদ্ধে ভারতের জয়

দেশের নিদারুণ দুরবস্থার কথা ছড়াতে লাগল বহু লোকের মুখে মুখে, কিন্তু কেউ জানতনা কীভাবে সে দুর্দশার প্রতিকার করা যায়। সে সময় দেশে একজন অসাধারণ লোকের আবির্ভাব হল। তাঁকে তোমরা না দেখলেও তাঁর নাম তোমরা জানো। তিনি হলেন গান্ধীজী। শান্ত কণ্ঠে তিনি সহজ কথা বলতেন। তিনিই দেশবাসীকে বুঝিয়ে দিলেন যদিও তাদের ধনসম্পদ নেই, যুদ্ধবাহিনী নেই, অস্ত্রসম্ভার নেই, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রচণ্ড শক্তির মুখোমুখি তারা দাঁড়াতে পারে চাই কি তাদের হারিয়েও দিতে পারে।

কেমন করে তা সম্ভব হতে পারে জিজ্ঞাসা করায় গান্ধীজী বললেন, 'ভয় জিনিসটা তোমাদের মন থেকে সম্পূর্ণ দূর করতে হবে। অভয় হতে হবে। কীসের ভয়, কাকে ভয়? এখন যে দুর্দশার মধ্যে তোমরা রয়েছো তার চেয়ে বেশি এমন কী দুর্দশা তোমাদের হতে পারে? তোমাদের জেলে পুরতে পারে, ভিটেমাটি উচ্ছন্ন করতে পারে, অন্য নানা উপায়ে তোমাদের শাস্তি দিতে পারে, চাই কি বন্দুকের গুলিতে প্রাণও নিতে পারে। তা যদি হবার হয় তো হবে— তা নিয়ে ভয় পেলে চলবে কেন? যদি স্বাধীনতা এতই তোমাদের কাম্য হয়, তাহলে স্বাধীনতার খাতিরে দুঃখবরণ তো আনন্দেরই সামিল। তাহলে মনে অন্তত এই তৃপ্তিটুকু থাকে যে দুঃখ বেদনা যা কিছু বরণ করছ তার মূলে আছে দেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য ব্রত উদ্‌যাপন।' দেশের লোককে গান্ধীজী এইভাবে বুঝালেন। সবাই যে তাঁর সব কথা ভালো করে বুঝল, তা নয়। কিন্তু তাঁর কথা বলার ধরনে যেমন ছিল শক্তি তেমনি জাদু—তাই তিনি যেখানে যেতেন লোকে মন্ত্রচালিতের মতো তাঁর পিছনে চলত।

হাজার হাজার লোক ঘরবাড়ি ছাড়ল, পরিবার পরিজন ছাড়ল, চাকরী-বাকরী ছাড়ল গান্ধীজীর স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য। তরুণ তরুণীরা দলে দলে বের হল দেশের সর্বত্র গান্ধীজীর বাণী পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যে। যারা মন দিয়ে তাঁর অভয়মন্ত্র শুনল তাদের মনে সাহস এল। এ মন্ত্রের মজাটা এই যে একজনের কানে গোপনে দেবার মন্ত্র এ নয় প্রকাশ্যে লক্ষ লক্ষ সমবেত জন-সাধারণকে দেবার মতো এই মন্ত্র। সহজ ভাষায় শান্তভাবে গান্ধীজী যে শিক্ষা

দিলেন তার ফলে দেশের লোকের সাহস বৃদ্ধি পেল, তারা মানুষের মতো মানুষ হবার পথে পা বাড়াল। সঙ্গে সঙ্গে দেশে প্রবল একটা শক্তির সঞ্চার হল। লক্ষ লক্ষ লোক যখন নির্ভয় হয়ে পরস্পরের পাশাপাশি দাঁড়ায়, ঈপ্সিত ধন পাবার জন্য স্থিরসংকল্প হয়ে, তখন পৃথিবীতে হেন শক্তি নেই যা তাদের রুখতে পারে।

গান্ধীজীর অগ্নিময়ী বাণী দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল দাবানলের মতো। কাতারে কাতারে নারীপুরুষ এসে দাঁড়াল তাঁর কাছে, বলল তিনি যেমন বলবেন তারা তেমন করবে। ছাত্রছাত্রীরা বেরিয়ে এল স্কুল কলেজ থেকে, উকিল ডাক্তার তাদের পেশা ছেড়ে দিল, বহুলোক তাদের কাজে ইস্তফা দিল গান্ধীজীর পদাংক অনুসরণ করবে বলে। তাঁর সেই অনুচরদের মধ্যে ছিলেন নেহরুরা—পিতাপুত্রে, ছিলেন আবুল কালাম আজাদ, বল্লভভাই পাটেল, রাজেন্দ্র প্রসাদ, সরোজিনী নাইডু, রাজগোপালাচারী ও আরো অনেকে। আজকের দিনের অনেক দেশনেতাও সেকালে ছিলেন গান্ধীজীর অনুচর। দেশের সর্বত্র বিশেষত গ্রামদেশে—একটা যেন অভূতপূর্ব পরিবর্তন দেখা দিল। গ্রামের দরিদ্রতম চাষী, সবার অধম যারা, সবার নীচে সবার পিছে থাকে যারা—তাদের মধ্যেও একটা এমন আশা ও উদ্দীপনার সঞ্চার হল যে তারা যেন মাথা উঁচু করে সোজা হয়ে দাঁড়াল। অভয়মন্ত্রে দীক্ষা পেয়ে সমস্ত দেশের মেরুদণ্ড যেন নতুন শক্তিতে দৃঢ় হয়ে উঠল।

গান্ধীজী বললেন স্বাধীনতা অর্জন করা খুবই বড় কথা সন্দেহ নেই—কিন্তু কী উপায়ে স্বাধীনতা অর্জন করা উচিত সেকথাও ভালো করে বিবেচনা করা দরকার। কাউকে আঘাত দেওয়া তাঁর মনঃপূত ছিলনা, তিনি মনে করতেন বিরুদ্ধ পক্ষকে আঘাত দেওয়াও অন্যায়। ব্রিটিশের প্রতি তাঁর মনে কোনো ঘৃণা ছিলনা কারণ তাঁর ধারণায় ঘৃণাও এক ধরনের হিংসা। স্বাধীনতার যুদ্ধ তাহলে কীভাবে চালাতে হবে—কোন্ অস্ত্রে?

গান্ধীজী বললেন, যে আইন অন্যায় তা মানা হবেনা, ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগ করা হবেনা, ব্রিটেনে প্রস্তুত কোনো পণ্যদ্রব্য কেনা হবেনা, খোলাখুলিভাবে ব্রিটিশ শাসনের দোষত্রুটির সমালোচনা করা হবে এবং দেশের লোককে বলা হবে যেন তারা দলে দলে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করে।
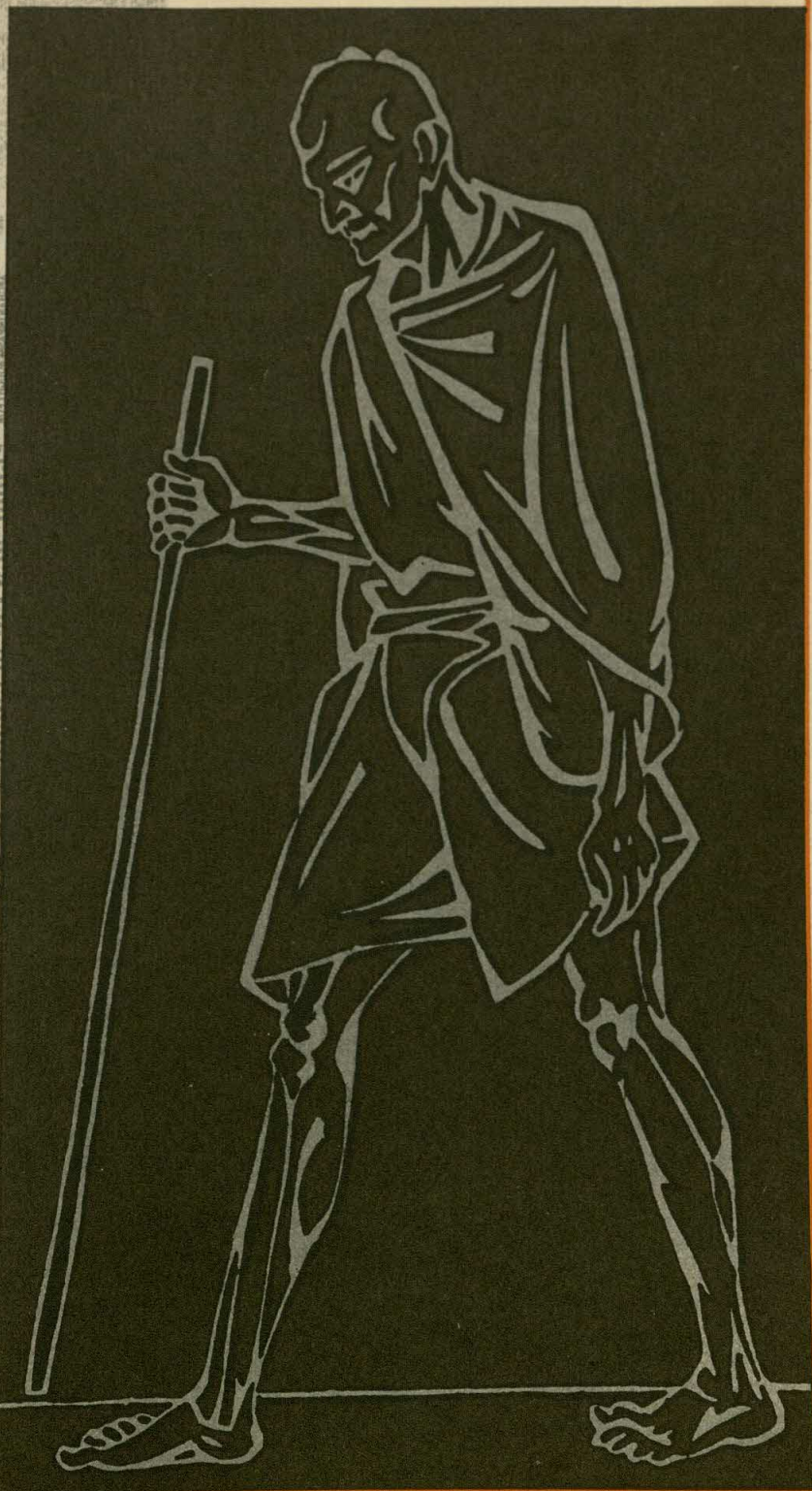
পুলিসের লাঠিতে হাজার হাজার লোক জখম হল, কারাদণ্ডে দণ্ডিত হল বহু লোক। স্বাধীনতার যোদ্ধারা হাসিমুখে এইসব নির্যাতন বরণ করল, আঘাত পেল, কিন্তু আঘাত ফিরিয়ে দিলনা, কারণ গান্ধীজী বললেন ভারতে স্বাধীনতার যুদ্ধ হবে অহিংস যুদ্ধ। এ যুদ্ধে বিরতি নেই, সুতরাং জেল থেকে খালাস পাবার সঙ্গে সঙ্গে আবার আন্দোলনে যোগদান। তারা জানত স্বাধীনতার জন্য কারাবরণ করা গৌরবের বিষয়—কোনো পাপ বা অন্যায়ের জন্য তো তারা দণ্ড ভোগ করতে যাচ্ছেনা। তারা একথাও জানত যে সত্য ও ন্যায় ছিল তাদের দিকে। নিরস্ত্র হলে কি হয়, তাদের সাহসের অভাব ছিলনা, স্বাধীনতা যুদ্ধের বীর সেনানী ছিল তারা। তারা ভাবত সত্যের জন্য তারা যে যুদ্ধ করতে পেরেছে—সেই তাদের পরম পুরস্কার।

Amrita Bazar Patrika

THEY WALK OUT OF THE PRISO

MOULANA AZAD RELEASED
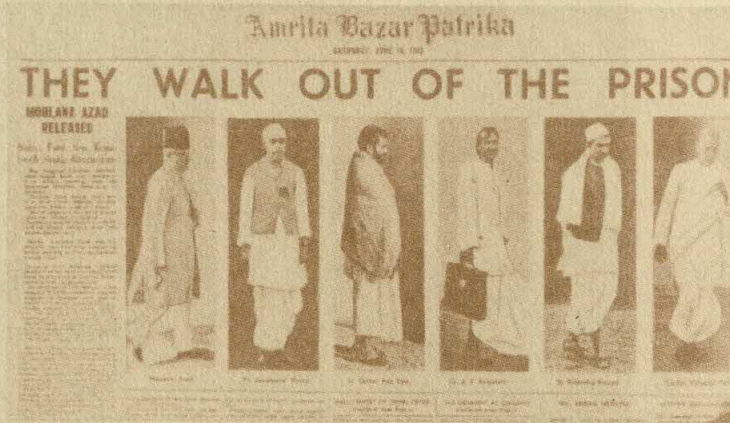
দেশের লোকের উপর এই উৎপীড়নের দরুন কোনো কোনো ভারতীয় ইংরেজদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতে লাগল। রোষ বশে তারা স্থির করল ইংরেজদের প্রতিটি অন্যায় কাজের প্রতিশোধ নিতে হবে। তারা বোমা ফেলল, রেলগাড়ি লাইনচ্যুত করল, এমনকি প্রাণ নিতেও ইতস্তত করলনা। তারা ভাবল ভারতবাসীর উপর অত্যাচার ও নির্যাতনের সমুচিত শোধ তুলতে হবে, ইংরেজকে শাস্তি পেতে হবে। তোমাদের কেউ কেউ হয়তো ভগৎ সিং-এর নাম শুনে থাকবে। তিনি ইংরেজদের অনাচারের প্রতিবাদে দিল্লীর কেন্দ্রীয় বিধানসভায় বোমা ফেলেছিলেন। সনাক্ত হবার পর তিনি পালাতে চেষ্টা করেননি, তার কাছে রিভলবার থাকা সত্ত্বেও আত্মরক্ষা করতে চাননি। তাঁর যখন ফাঁসির

হুকুম হল তিনি ছিলেন বিশের কোঠায়। শোনা যায় তিনি হাসতে হাসতে ফাঁসির মঞ্চে উঠে নিজের হাতে ফাঁসির রজ্জু গলায় পরেছিলেন। ভগৎ সিং-এর মতো আরো অনেকে এইভাবে প্রাণ দিয়েছিল।

এ প্রসঙ্গে আরো একজনের নাম নিশ্চয় তোমাদের মনে পড়বে—তিনি হলেন সুভাষচন্দ্র বসু। তাঁকে অনেকে নেতাজী বলে থাকে। গান্ধীজী ব্রিটিশের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন ব্রিটিশ শাসিত ভারতেরই জমিতে। নেতাজীর ইচ্ছা ছিল বাইরে থেকে তিনি আক্রমণ চালিয়ে ব্রিটিশকে ভারত থেকে হটিয়ে দেবেন। সেইজন্য তিনি দেশ থেকে পালিয়ে গিয়ে বিদেশে একটি ভারতীয়দের যুদ্ধবাহিনী গঠন করেছিলেন। যেসব ভারতীয় সৈন্য ব্রিটিশের হয়ে যুদ্ধ করতে গিয়ে জার্মেনী ও জাপানের হাতে বন্দী হয়, নেতাজীর বাহিনীর অধিকাংশ সৈন্য ছিল তারা। এই যুদ্ধবন্দী ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে নেতাজী গঠন করেছিলেন তাঁর

The Hindustan Times

.N.A. TRIAL OPENS IN RED FORT

WOMEN WARRIORS | SHAH NAWAZ | DHILLON | SAHGAL | DEFENCE COUNSEL

ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল আর্মি। ইংরেজের শত্রু জাপানের সঙ্গে যোগ দিয়ে এই ভারতীয় জাতীয় বাহিনী ব্রিটিশের সঙ্গে লড়াই করেছিল মণিপুরে, কোহিমায়।

গান্ধীজী, নেতাজী এবং ভগৎ সিং-এর মতো বিপ্লবী বীরেরা ব্রিটিশের সঙ্গে লড়বার জন্য আপন আপন পদ্ধতি স্থির করেছিলেন। কিন্তু একদিকে তাঁদের মধ্যে একটা গভীর মিল দেখা যায়। যোদ্ধা হিসাবে প্রত্যেকেই ছিলেন বীর ও দেশপ্রেমিক।

ভারতের অনেকেই তখন ত্যাগ, অনাসক্তি ও দুঃখ স্বীকার প্রতিদিনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিল। তাদের দেশপ্রেম বীরত্ব ও আত্মাহুতির গল্প তখন

মুখে মুখে রটনা হত দেশময়। ওই কয়েক বছরে ভারতে যত বীর সন্তান দেখা গিয়েছিল তেমন আর আগে কখনো দেখা যায়নি। সেই গৌরবময় যুগের কথা আমরা এখনো বলে থাকি।
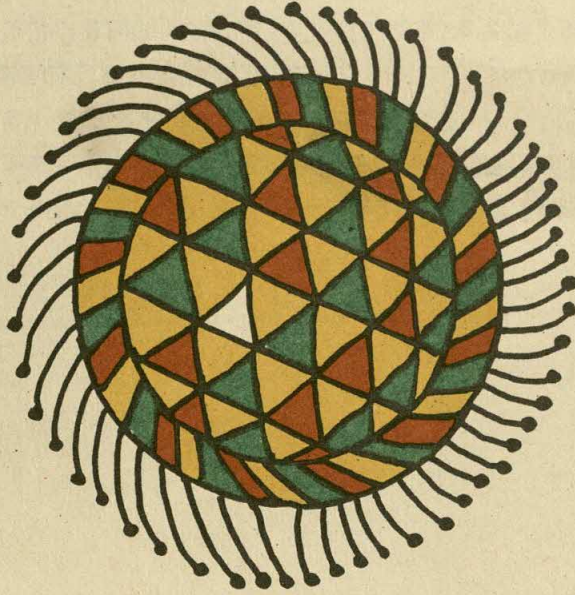
জেলে থাকতে জওহরলাল নেহরু স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখতে খুব ভালোবাসতেন। তাঁর স্বপ্নের দেশ ছিল এমন দেশ যেখানে চাষী মজদুর এবং বিশেষ করে গাঁয়ের মানুষ সুখে থাকবে। এদের অবস্থার উন্নতির জন্য তিনি আগাম বহু পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল বিজ্ঞান ও আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে এদের জীবনের মান উন্নত করবেন। তাঁর আরো একটি স্বপ্ন ছিল এই যে বিশ্বের জাতিসংঘে একদিন ভারত যেন সম্মানের আসন পায়, ভারতের বাণী যেন বিশ্বের লোক শ্রদ্ধার সঙ্গে শোনে।

India will find herself again when freedom opens out new horizons and the future will then fascinate her far more than the immediate past of frustration and humiliation. She will go forward with confidence, rooted in herself and yet eager to learn from others and cooperate with them. Today she swings between a blind adherence to her old customs and a slavish imitation of foreign ways. In neither of these can she find relief or life or growth. It is obvious that she has to come out of her shell and take full part in the life and activities of the modern age. It should be equally obvious that there can be no real cultural or spiritual growth based on imitation.

Jawaharlal Nehru

জওহরলাল নেহরু বুঝেছিলেন তাঁর সেই স্বপ্ন সফল করে তোলার প্রধান অন্তরায় ছিল বিদেশী শাসন। সেইজন্য তিনি স্থির করেছিলেন সর্বস্ব পণ করেও দেশের স্বাধীনতা অর্জন করতেই হবে। দেশকে মহান করার চেষ্টায় তিনি হয়েছিলেন দেশের একজন মহানেতা। আজ যে দেশে তুমি আমি বসবাস করছি সে দেশকে বলা যায় নেহরুর ভারতবর্ষ। জাতি হিসাবে আজো আমরা চেষ্টা করে চলেছি যাতে তাঁর স্বপ্নের দেখা ভারত একদিন সত্য হয়ে উঠতে পারে।

ভারতের একটি প্রজন্মের বহুলোক গান্ধীজীর নির্দেশিত পথে নিজেদের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে আজীবন ব্রিটিশের সঙ্গে সংগ্রাম করে গেছে। তাদের সে যুদ্ধে হিংসা বিদ্বেষ ছিলনা তারা কাউকে আঘাত করতে চায়নি। নানা বিপত্তির মধ্যে দিয়ে তারা সাহসের সঙ্গে এগিয়ে গিয়েছিল এই আশায় যে একদিন ব্রিটিশকে ভারত ছেড়ে যেতেই হবে—একদিন ভারত স্বাধীন হবেই। বহুলোক যখন একনিষ্ঠ আগ্রহে একটা জিনিসের জন্য সাধনা করে তখন তাদের সমবেত সংকল্পের শক্তির কাছে অতি পরাক্রান্ত যুদ্ধবাহিনীও হার মানতে বাধ্য হয়। একটা এমন সময় এল যখন ইংরেজ শাসকদের ভারত ছেড়ে চলে যাওয়া ছাড়া অন্য উপায় রইলনা। ভারতীয় জনগণের ইচ্ছাশক্তির কাছে তাদের হার মানতেই হল। গান্ধীজীর স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগ্রামীরা একটি গুলি না ছুড়লেও ভারত স্বাধীন হল ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে।
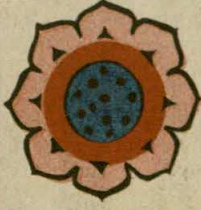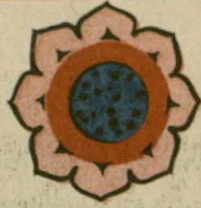
নিজেদের একটা আস্তানা

স্বাধীন হওয়া একটা মস্ত ঘটনা। যেন স্বপ্ন সফল হল। কিন্তু বারো আনা অংশ সত্য হল মাত্র। দেশ দু'ভাগে ভাগ হয়ে হল—ভারত ও পাকিস্তান। দেশ ভাগ না করলে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটানো যেত না—সুতরাং এতে

আমাদের রাজী না হয়ে উপায় ছিলনা। স্বাধীনতা আন্দোলন চলা কালেই একটা দুঃখকর ব্যাপার ঘটল। কয়েকজন মুসলিম নেতা বললেন মুসলমানেরা জাতি হিসাবে পৃথক সুতরাং তাদের জন্য একটি পৃথক দেশ বরাদ্দ করতে হবে তার নাম হবে পাকিস্তান। যারা পাকিস্তানের পক্ষে তারা অখণ্ড ভারতের পক্ষে যারা ছিল তাদের সঙ্গে বিবাদ বাধাল। শেষ পর্যন্ত স্থির হল ভারতের অঙ্গচ্ছেদ করে এমন একটা অংশ বের করা হবে যার নাম হবে পাকিস্তান। ব্রিটিশ সরকার শেষ পর্যন্ত যখন ভারত ছেড়ে চলে গেল, দেখা গেল ভারতের মানচিত্র কেটে তিন টুকরো করা হয়েছে। মাঝখানের সবচেয়ে বড় অংশটাকে বলা হল ভারত, আর পূর্ব পশ্চিমের দুটি খণ্ড (মাঝখানে যাদের হাজারো মাইলের ব্যবধান) মিলিয়ে হল নতুন রাষ্ট্র – পাকিস্তান। এই দুই খণ্ডের কিছু লোক বলল যে তারা ভারতীয় এবং ভারতীয় হয়েই থাকতে চায়, পাকিস্তানী হতে চায়না। ভীত সন্ত্রস্তভাবে তারা তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে দলে দলে এসে ভারতে আশ্রয় নিল। এইভাবে প্রায় আশি লক্ষ বাস্তুহারা মানুষের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হল ভারতকে। কিছু কিছু লোক ভারত ছেড়ে পাকি-স্তানে বসবাস করবে বলে চলে গেল, কিন্তু তুলনায় তাদের সংখ্যা ছিল অনেক কম।

পাকিস্তান থেকে বাস্তুহারা যারা এল, প্রথম প্রথম তাদের অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয় – ঘর নেই বাড়ি নেই আহার নেই কাজকর্ম নেই। নিজের বলতে যা কিছু ছিল সব ফেলে রেখে তাদের পালিয়ে আসতে হয়েছে ভারত পাকিস্তান সীমান্ত পেরিয়ে। তাদের মধ্যে, সকল শ্রেণীর লোক ছিল – ধনী, দরিদ্র,

মধ্যবিত্ত: কৃষক, মজদুর, ব্যবসায়ী, কেরাণী, শিক্ষক, ডাক্তার উকিল। পুরুষ নারী নির্বিশেষে পুত্রকন্যা সহ তারা এল কাতারে কাতারে। আশি লক্ষ লোককে আশ্রয় দান করে, স্বাভাবিক জীবন যাত্রায় তাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা তো সহজ কথা নয়। এ যেন গ্রীস কিংবা বুলগেরিয়ার মতো দেশের সমস্ত লোক হঠাৎ একত্রে এসে পড়া। তাদের দেখা শোনা করে আতিথ্যবিধান খুবই শক্ত ব্যাপার। অন্য কোনো কাজে হাত দেবার আগে এই বাস্তহারা-দের পুনর্বাসনের দিকটা আমাদের সামাল দিতে
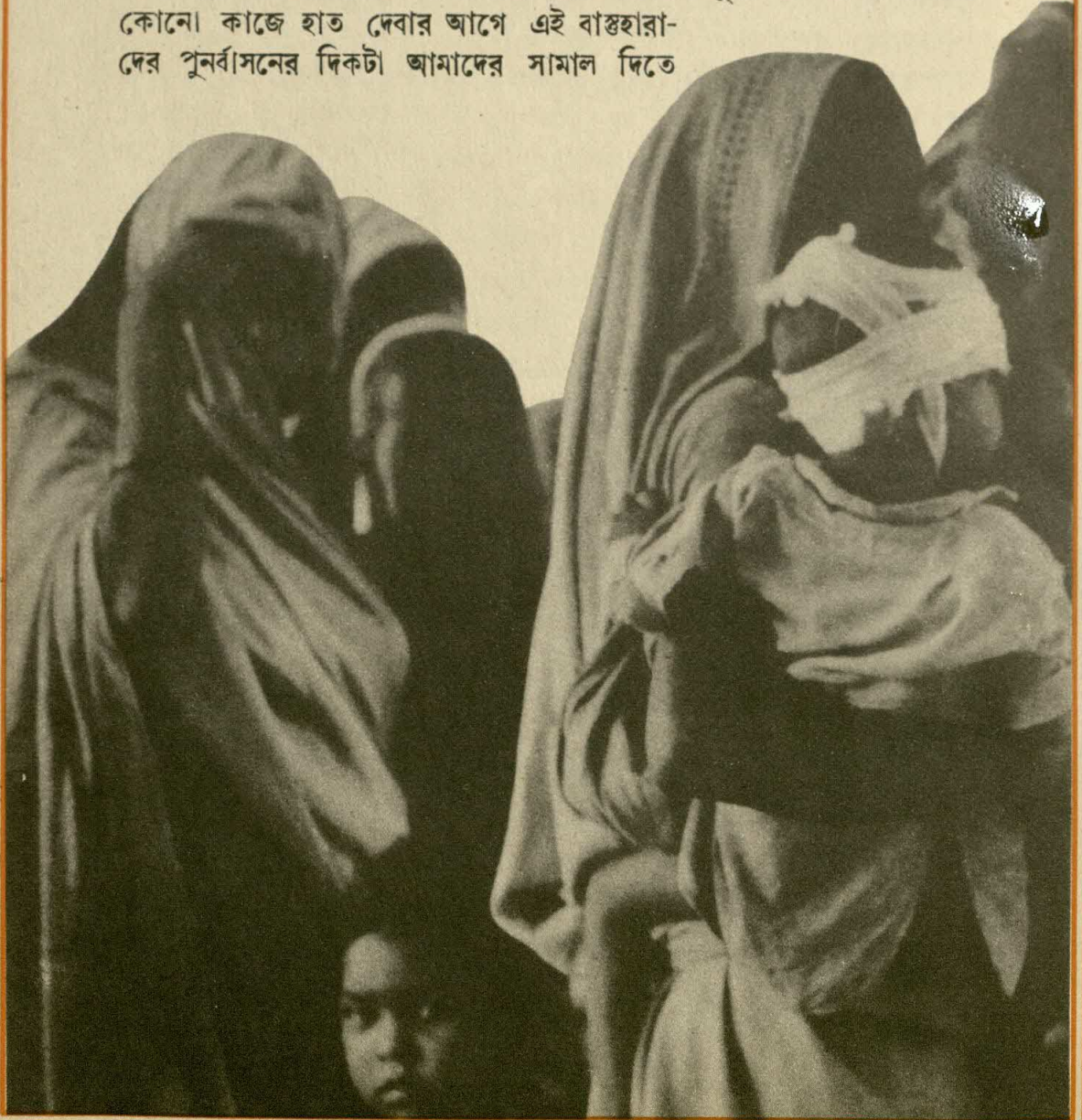
হল। পৃথিবীর কোনো দেশকেই এরকম একটি সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়নি।

দেশবিভাগের ফলে আরো অনেক সমস্যার উদ্ভব হল। বহু বিস্তীর্ণ চাষের উৎকৃষ্ট জমি হস্তান্তর হয়ে চলে গেল বিদেশে। ফলে ব্রিটিশ জমানায় ভারতের আয়তন যেমন ছিল সে তো হ্রাস পেলই, উপরন্তু দেশ হয়ে গেল দরিদ্রতর।

কোনো প্রকারে আমাদের তো এই ঘাটতি পূরণ করতে হবে, তা না হলে স্বাধীন হবার তো কোনো অর্থ হয়না। দেশ যখন আমাদের নিজেদেরই হাতে, দেশের লক্ষ লক্ষ দরিদ্র নিরন্ন দেশবাসীর কথা তো আমাদেরই ভাবতে হবে। স্বাধীনতা তো এমন বস্তু নয় যে তারা ধুয়ে খাবে, এমন কিছুও নয় যা গায়ে পরে লজ্জা কিংবা শীত নিবারণ করা যায়। তবে স্বাধীন হয়ে কী লাভ হল তাদের? স্বাধীনতা লাভের গৌরব বা আনন্দ ভাঙ্গিয়ে কতদিনই বা চলে! স্বাধীনতার আন্দোলন চলার কালে দেশের নেতারা যে সমস্যা নিয়ে সর্বদা মাথা ঘামিয়েছিলেন, এখন সে প্রশ্ন দাঁড়াল একেবারে তাদের চোখের সামনে— স্বাধীন তো আমরা হলাম—কিন্তু স্বাধীনতা নিয়ে করব কী?

স্বাধীনতা লাভের মূল উদ্দেশ্যটাই ছিল দেশের জনসাধারণের জীবনে মান উন্নয়ন ও ভবিষ্যৎ নিয়ে তাদের মনে আশা ভরসার সঞ্চার। সবাই যথেষ্ট খেতে পাবে, খাদ্য হবে পুষ্টিকর, পানীয় জল হবে নির্দোষ ও নির্মল, আশ্রয়ের জন্য বাড়িখানা ভালো হবে, অর্থসঙ্গতি বৃদ্ধি পাবে, স্কুলের শিক্ষার ব্যবস্থা হবে সর্বজনীন, যার ইচ্ছা উচ্চশিক্ষা লাভ করবে। প্রয়োজন হলে ডাক্তার হাসপাতালের ব্যবস্থা থাকবে, কেউ বেকার বসে থাকবেনা, কাজের ফাঁকে ফাঁকে খেলাধুলা ও বিনোদনের ব্যবস্থা থাকবে। তুমি হয়তো ভাবছ এ আবার বেশি কথা কি— এরকম ব্যবস্থা তো হামেশাই হয়ে থাকে। দেশের অন্যান্য লোকের তুলনায় তোমার অবস্থা অনেক ভালো বলেই তুমি এমনটা ভাবতে পারছ। তুমি তো লেখাপড়া করতে পারো, দেশ যখন স্বাধীন হল দেশের শতকরা লোকের মধ্যে পনেরো জন মাত্র লিখতে পড়তে পারত, বাকি পঁচাশির মধ্যে যেমন তোমার বয়সী ছেলেমেয়ে ছিল তেমনি বয়স্ক লোকেরাও ছিল। তুমি তো যথেষ্ট খেতে পরতে পাও, দেশ স্বাধীন হবার পর বেশির ভাগ লোক খাওয়া পরার জন্য দিনে এক টাকার বেশি খরচ করতে পারতনা।
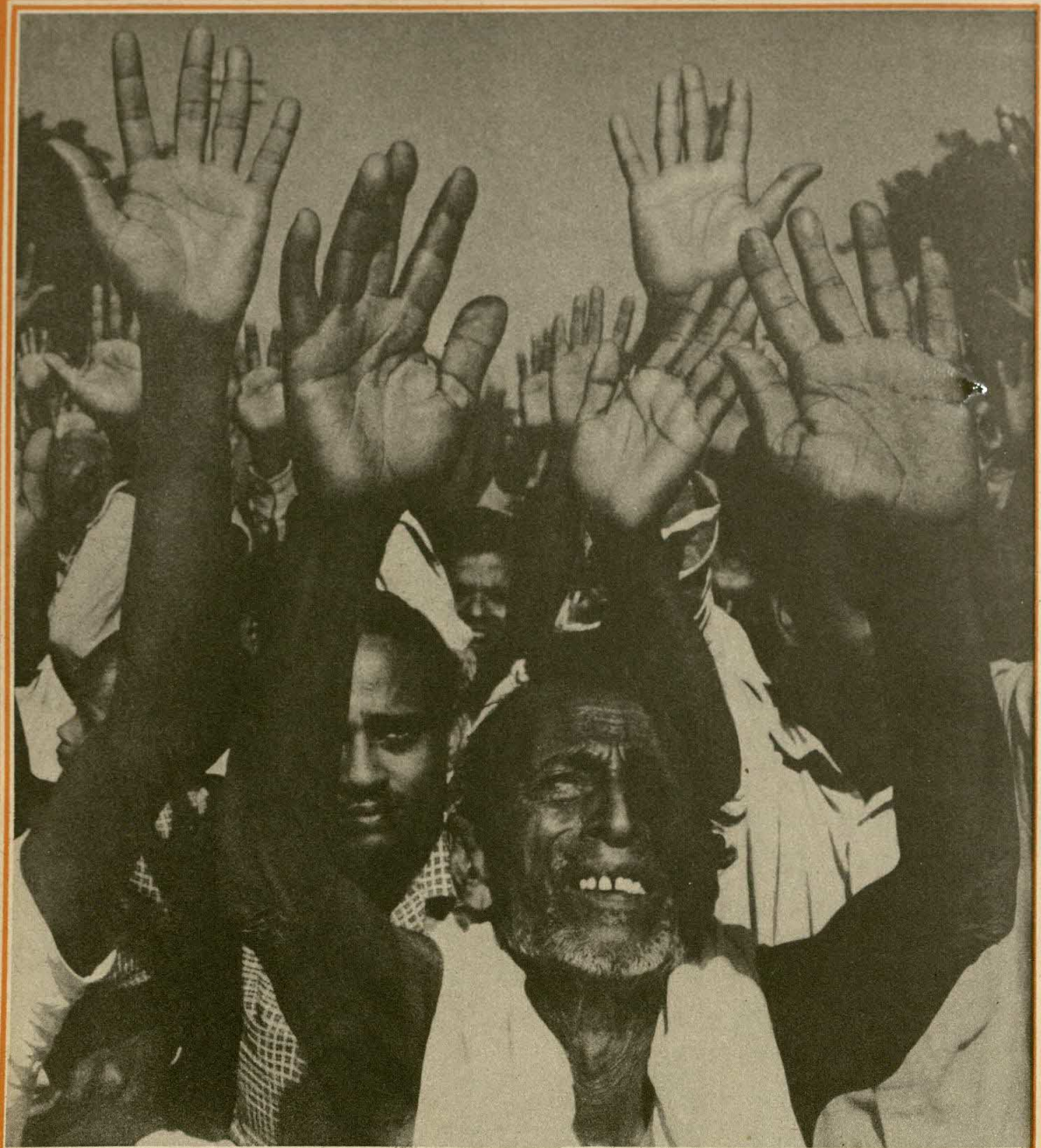
আরো একটি কারণে আমরা চেয়েছিলাম ব্রিটিশ যেন এদেশ ছেড়ে চলে যায়। আমাদের দেশ বিদেশীরা শাসন করবে, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আমাদের থাকবেনা এতে আমাদের আত্মমর্যাদায় বড় ঘা লাগত। দেশের শাসন ব্যবস্থা

আমরা নিজেদের হাতে নিতে চেয়েছিলাম যেমন লোকে চায় নিজের ঘরসংসার নিজের মতো করে চালাতে। নিজেদের হাতে শাসন ব্যবস্থা নিয়ে নিজেরাই যদি সব কিছু না করি তাহলে দেশের লোক স্বায়ত্ত-শাসনে পাকা হয়ে উঠবে কেমন করে? দেশের কাজে দেশের লোক যদি হাত না লাগায়, তাহলে দেশ ঠিকমত এগোতে পারেনা। স্বাধীনতার জন্য যখন আমরা যুদ্ধে নেবেছিলাম, তখন দেশের লোকের সংকল্পের দৃঢ়তাই তো ছিল আমাদের শক্তির প্রধান উৎস। এখন দেশের জীবন নতুন করে গড়ে তোলার সংগ্রামেও জনগণই দেশের প্রধান ভরসা।

ভালোভাবে জীবনধারণের জন্য যাবতীয় উপাদান দেশ স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গে তো দেশের লোককে দেওয়া সম্ভবপর হয়নি। পর্যাপ্ত জিনিস না থাকলে এই বিরাট দেশের অসংখ্য লোককে সব জিনিস দেওয়া যায়না। মেহনত করে যারা, তারা যদি খেতে খামারে কলে কারখানায় প্রচুর উৎপাদন করে তবেই তো সকলের মধ্যে ভাগবাঁটোয়ারা করে দেবার মতো পর্যাপ্ত সম্পদ দেশের ভাণ্ডারে জমতে পারে।

ধরা যাক দেশ আমাদের প্রকাণ্ড একখানা বসতবাড়ি এবং আমরা চাই এর আমূল সংস্কার সাধন করতে। শুরুতেই চুণকাম আর উপর উপর মেরামতি করে, বিস্তর খেটেখুটে কয়েকটা আরামের ব্যবস্থা করলেই কি ঠিক সংস্কার করা হল বলা চলবে? গোড়ায় দেখতে হবে ভিৎ যথেষ্ট শক্ত কিনা, গাঁথুনি মজবুত কিনা। আর দেখতে হবে ইমারতের কোনো কোনো কামরা কুলুপ-আঁটা কিনা। দেশ যখন স্বাধীন হল দেশে তখন ছিল প্রায় ছ'শো সামন্ত রাজ্য। ব্রিটিশের তাঁবে থেকে রাজা মহারাজারা সেইসব দেশীয় রাজ্য শাসন করত। কোনো কোনো রাজ্য ছিল আয়তনে বিরাট—যেমন হায়দরাবাদ ও কাশ্মীর। আবার কয়েক বর্গমাইলের ছোট ছোট রাজ্যও ছিল। রাজ্যের প্রজাদের যথেষ্ট আহার না জুটলেও রাজামহারাজাদের বিলাস ব্যসনের অন্ত ছিলনা। প্রতিটি রাজ্যের ছিল নিজস্ব আইন কানুন, রাজামহারাজারা ছিল হর্তাকর্তা বিধাতা, নিজেদের খেয়ালখুশি মাফিক তারা নিজ নিজ রাজ্য শাসন করত। তার মানে এই যে সমস্ত রাজ্যের প্রজারা ভারতীয় হলে কি হয়, তাদের জীবনযাত্রার ধরনধারন ছিল অন্যরকম। আমরা চেয়েছিলাম সকল ভারতীয় যেন একত্র

এক দেশে বসবাস করে, যেন তারা পরস্পরের সমান হয় ও একই ধরনের জীবনযাত্রায় সহভাগী হয়। আমাদের দেশ-নামক বসত বাড়ির কোনো কোনো কামরা কুলুপ-আঁটা থাকবে—সে আমরা চাইনি।

রাজামহারাজাদের অনেকেই তাদের রাজ্য ছেড়ে দিতে চায়নি। তারা জানত রাজ্য হাতছাড়া হয়ে গেলেই প্রজাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে জাঁকালো জমকালো জীবনযাপন করা আর চলবে না। কিন্তু সর্দার প্যাটেলের দক্ষতা ও

দৃঢ়তার ফলে দু'বছরেরও কম সময়ে ভারতের অন্তর্গত প্রতিটি সামন্ত রাজ্য স্বাধীন ভারতের অঙ্গীভূত হয়ে যায়। খুব বেশি মন কষাকষি কিংবা ঝগড়াঝাঁটি না করেই এটা ঘটেছিল বলা যায়।

কাশ্মীর রাজ্যের এক সীমান্তে ছিল পাকিস্তান, অন্য সীমান্তে ভারত। তাই কাশ্মীরের মহারাজাকে বলা হয়েছিল কোন দেশে তিনি যাবেন তা যেন তিনিই স্থির করে নেন। শেষ পর্যন্ত তিনি ভারতভুক্তির পক্ষে মত দিয়েছিলেন। পাকিস্তান তাঁর এই সিদ্ধান্তে খুশি হতে পারেনি। পাকিস্তানের উপজাতি অঞ্চল থেকে হাজারে হাজারে হানাদার সৈন্য এসে কাশ্মীর উপত্যকা আক্রমণ করে। পাকিস্তানের আশা ছিল কাশ্মীরীদের প্রভাবিত করে দেশটা তারা ছিনিয়ে নেবে। স্বাধীন ভারতের উপর সেই ছিল বহিরাগতের প্রথম আক্রমণ। ভারত হানাদারদের পরাস্ত করে হটিয়ে দেয়।

পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসা বাস্তুহারাদের পুনর্বাসন, সামন্ত রাজ্যগুলির ভারতভুক্তি ও কাশ্মীর আক্রমণ প্রতিহত করা—এই তিনটি বিরাট কাজ সম্পন্ন করতে গিয়ে ভারতকে প্রচুর শ্রম, অর্থ ও সময়ের অপব্যয় করতে হয়। ভারতকে ভারতীয়দের নিজস্ব বাসভূমিরূপে গঠন করাটাই ছিল আমাদের প্রথম ও প্রধান কাজ। দুঃখের কথা, যত তাড়াতাড়ি এ কাজে আমাদের হাত লাগানো উচিত ছিল তেমনটা আমরা পারিনি—আমাদের বিশেষ আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও।

সংগঠনের কাজ এমনিতেই বিরাট কাজ। উপরোক্ত তিনটি কারণ ছাড়াও অন্য কতকগুলি কারণে কাজটা সুসাধ্য হয়নি। ব্রিটিশদের চলে যাবার পর এ দেশের লোকসংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পায়। দেড়শো বছরের বিদেশী শাসন চলার কালে ভারতের অধিকাংশ সম্পদ ইংরেজ কবলিত হয়ে বিদেশে চলে যায়। দেশের জনসাধারণ ছিল দরিদ্র, অশিক্ষিত, হাতে কলমে শেখার সুযোগ পায়নি বলে কর্মে তাদের পটুতা ছিল যৎসামান্য। তারা নানা অঞ্চলের অধিবাসী, নানা ভাষায় কথা বলে। বেশির ভাগ তারা চাষবাস করে দিনগুজরান করে। কিন্তু অতিকর্ষণের ফলে ও সারের অভাবে জমির উর্বরতা হ্রাস পেয়েছে। ফলন প্রতি বছরেই একটু একটু করে কমে যায়। এ সমস্তই আমাদের অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক। কিন্তু স্বাধীন হবার পর আমরা

বুঝতে পেরেছি যে সংকল্পে দৃঢ় থাকলে সকল সমস্যাই আমরা নিরসন করার ক্ষমতা রাখি। অগ্নি পরীক্ষায় আমরা তো উত্তীর্ণ হয়েছি। শক্ত কাজে আমাদের ভয় নেই, শক্ত শক্ত কাজ তো আমরা আগেও করেছি। ব্রিটিশের কবল থেকে দেশকে মুক্ত করেছি, সামন্ত রাজ্যগুলি ভারতের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছি, কাশ্মীর আক্রমণ প্রতিহত করেছি এবং আশি লক্ষ বাস্তহারাকে আশ্রয় দিয়েছি। উপরন্ত আরো কিছু করতে পারা নিঃসন্দেহে শক্ত, কিন্তু অসম্ভব নয় নিশ্চয়।

ভারতীয়দের চিন্তাধারা এই খাতেই বয়েছিল। অন্যেরা কিন্তু ততটা আশা করেনি। অন্যান্য দেশের অনেক লোক ভেবেছিল ভারতীয়েরা কাজের মতো কিছু কাজ করতে পারবে বলে মনে হয়না, যদি পারে তা হবে অসম্ভবকে সম্ভব করার মতো একটা ব্যাপার।
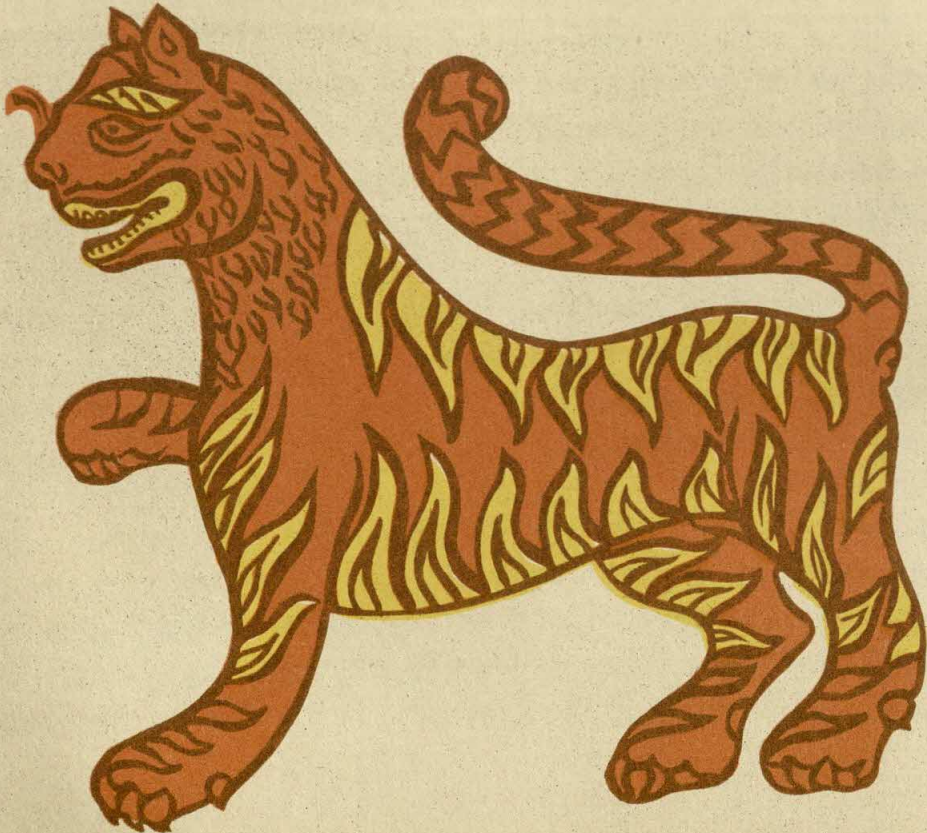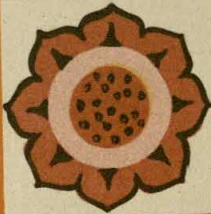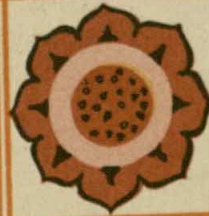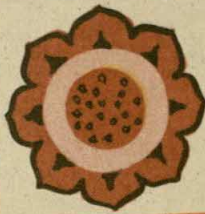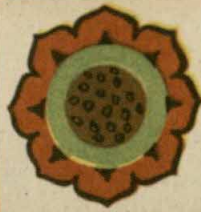
৮

দিশারী
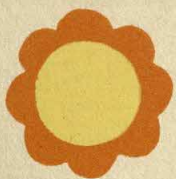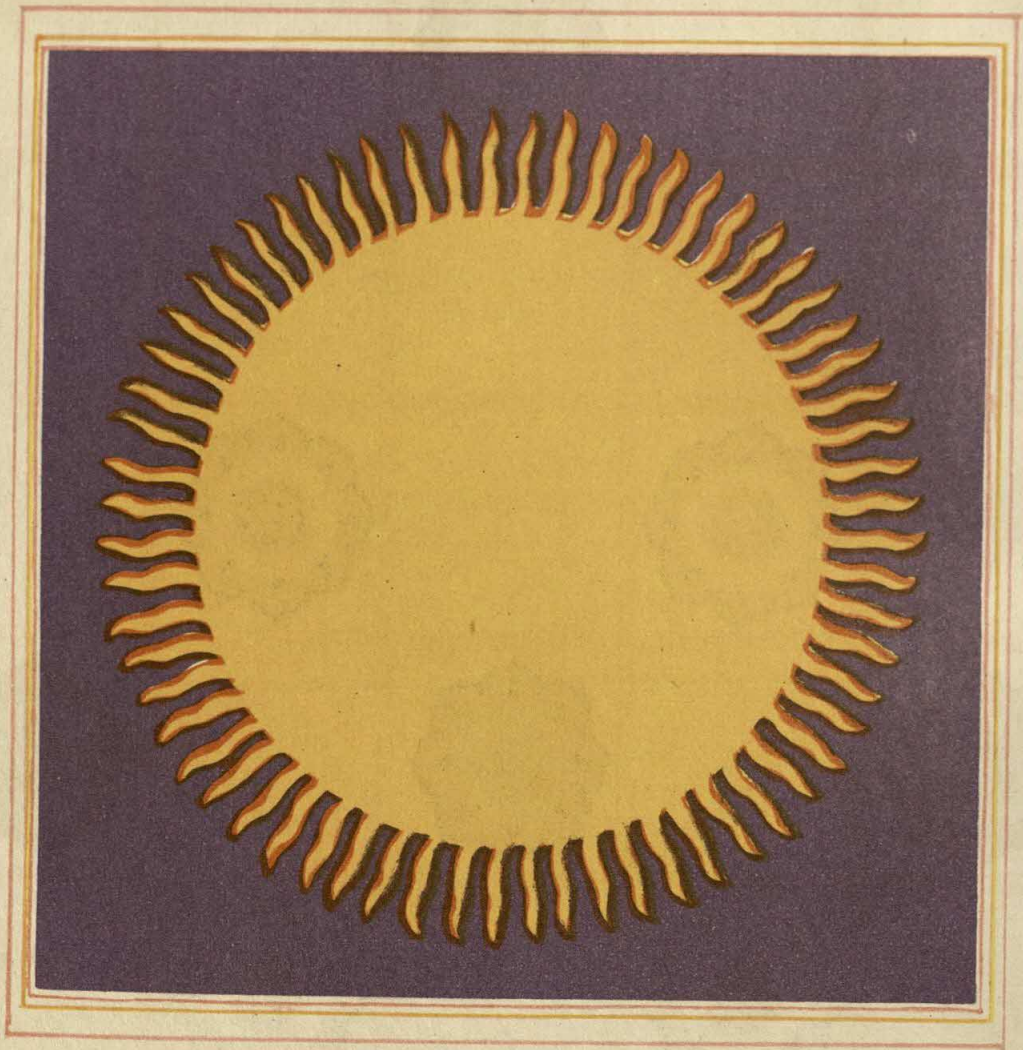
তুমি কি কখনো পথ হারিয়েছ? যদি না হারিয়ে থাকো তাহলে খুব আশ্চর্য বলতে হবে, কারণ বেশির ভাগ লোকেই কোনো না কোনো সময়ে পথ হারিয়ে থাকবে। হয়তো অন্যমনস্কভাবে কেউ ভুল মোড়টায় ঘুরেছিল, তারপর ঠিক রাস্তা বের করতে কী হয়রানি! সমুদ্রেও ঝড়তুফানের সময় জাহাজ পথ হারাতে পারে। পথহারা জাহাজকে সাবধান করে দেবার জন্য লাইট্ হাউস তৈরি

করা হয়। শহরে নগরে রাস্তাঘাটের নাম থাকে, বাড়ির নম্বর থাকে, কিংবা অন্য কোনো এমন চিহ্ন থাকে যা থেকে ঠিক রাস্তাটা চিনে নিতে কষ্ট হয়না। একা একা জঙ্গলে ঘোরাফেরা করতে হলে পথিক সূর্য, চন্দ্র কিম্বা আকাশের গ্রহতারার সংস্থান দেখে অনেক সময় বুঝতে পারে সে কোন দিকে যাচ্ছে। গ্রাম থেকে গোরুর গাড়ি শহরের দিকে যখন যায়, দেখতে পাবে গোরুর গাড়ির গাড়োয়ান দিব্য নিদ্রা দিচ্ছে। শহরের রাস্তা একটিই এবং সেটি ঠিকই তাকে তার গন্তব্য জায়গায় নিয়ে গিয়ে পৌঁছুবে—একথা জেনে গাড়োয়ান নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারে। সবাই জানতে চায় কোন পথে কোন দিকে সে চলেছে—সবাই নিশ্চিত হতে চায় সে যে পথ নিয়েছে সেইটাই ঠিক পথ কিনা, বিশেষত তার হাতে যদি সময় কম থাকে এবং সে হয়রান হতে না চায়।

স্বাধীনতা লাভের পর ভারতকে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে যেতে হয়—নিদারুণ দারিদ্র্য থেকে শুরু করে প্রত্যেক ভারতবাসীর অভাব মোচন করা কি সহজ রাস্তা? কোনো জায়গায় জিরোবে তিষ্ঠাবে, কোথাও বৃথা শক্তি ক্ষয় করবে- এমন অবস্থা হয়নি ভারতের। তোমরা তো জানো মানুষ নানা উপায়ে টাকা রোজগার করতে পারে—চুরি ডাকাতি করে, ভিক্ষা করে, ধার নিয়ে, লোক ঠকিয়ে, গুপ্তধন আবিষ্কার করে এবং নিদেন পক্ষে গতর খাটিয়ে। এই উপার্জনের ব্যাপারটা যদি কোনো একজন ব্যক্তি বিশেষকে করতে হত তো সে নিশ্চয় বুঝে দেখত এসবের মধ্যে কোন উপায়টা তার পক্ষে সবচেয়ে সহজ। কিন্তু এক আধজন তো নয়, দেশের কোটি কোটি লোককে যদি স্থির করতে হয় কী উপায়ে দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করা যায় -তাহলে ঠিক পথের সন্ধানটা আগেভাগে পাওয়া জরুরী হয়। দারিদ্র্য জগদ্দল পাথরের মতো দেশের বুকের উপর পড়ে আছে। তাকে হটাতে হবে। ধরো রাস্তার একখণ্ড মস্ত পাথর তোমরা দশ বারো জন মিলে সরাতে চাও। এখন প্রত্যেকে তোমরা যদি আলাদা আলাদা দিকে ঠেলতে চাও—পাথর যেমন কে তেমন অনড় হয়ে বসে থাকবে। কিন্তু সবাই যদি আগের থেকে ঠিক করো কোন দিকে ঠেলবে, তারপর 'রাম, দো, তিন, হেঁইয়া' বলে একযোগে ঠেলতে পারো, তাহলে পাথরের সাধ্য নেই রাস্তা জুড়ে বসে থাকবে। সেই জন্যই দরকার যে, দেশের কোটি কোটি মানুষ আগের থেকে স্থির করবে তারা কী উপায়ে দারিদ্র্য দূর করবে। তারপর সবাই মিলে যদি সেই রাস্তায় চলে—তা হলে কোনো কিছু তাদের ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

সমৃদ্ধতর জীবনের দিকে লক্ষ্য রেখে, কোন দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে তাকে চলতে হবে—সে পথ ভারত পূর্ব থেকেই স্থির করে নিয়েছিল। পাছে রাস্তা ভুল হয়ে যায় কিংবা হারিয়ে যায়, সেইজন্য শুরুতেই ভারত ধ্রুবতারার মতো পথ নির্দেশক একটি আলোকের উৎস সন্ধান করে নিয়েছিল। সেই ধ্রুবতারা কিংবা পথের আলো হল আমাদের সংবিধান। দেশের পক্ষে এরচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলিল আর কিছু হতে পারেনা। দেশ কিংবা রাষ্ট্র হিসাবে কোন নীতিতে আমাদের বিশ্বাস, কী আমরা করতে চাই, এবং কোন উপায়ে করতে চাই, কীভাবে দেশ আমরা শাসন করব—এই সমস্ত কথা সংবিধানে স্পষ্ট ভাবে লিখিত আছে। বলতে পারো এই সংবিধানই আধুনিক ভারতের শাস্ত্রগ্রন্থ।

প্রতি কাজে সংবিধান আমাদের পথ দেখায়। পিতামাতা যেমন সন্তানসন্ততির মঙ্গল সাধনে সর্বদা যত্নবান থাকেন, সংবিধান তেমনি ভাবে আমাদের রক্ষণা-বেক্ষণ করে।

ভারতের সংবিধান কী বলে? প্রথমত এই কথা বলে যে এই দেশের

সবকিছু সাব্যস্ত করবে দেশের জনগণ এবং জনগণের সমবেত ইচ্ছা এদেশে হবে সর্বাগ্রগণ্য। দ্বিতীয়ত, ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা ও সাম্যের অধিকার সকলের এবং রাষ্ট্র লক্ষ্য রাখবে সেই অধিকার যেন কিছুতেই ক্ষুণ্ণ না হয়। প্রত্যেক ব্যক্তিই শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের পাত্র বলে গণ্য হবে। দেশের লোকের মধ্যে সৌভ্রাত্র যাতে বৃদ্ধি পায় সেদিকে রাষ্ট্র সর্বদা লক্ষ্য রাখবেন যাতে জাতির একতা কখনো বিপন্ন না হয়।

সংবিধানের একটি অংশে ভারতীয় নাগরিক সাধারণের মৌলিক অধিকার বিবৃত হয়েছে, বলা হয়েছে এগুলি তাদের জন্মগত অধিকার এবং এ

क सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा उसके
ामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति
ासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा औ र अवसर की समता प्रा-
बमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुरक्षित कर
ने के लिये दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान
ो अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

অধিকার থেকে কেউ তাদের বঞ্চিত করতে পারবেনা। মনন, চিন্তন ও বচনে তুমি স্বাধীন। তোমার ধর্মবিশ্বাসে কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবেনা। এ সবে তোমার মৌলিক অধিকার। আইনের চোখে তুমি আর পাঁচজনের সমান। তোমার জাত ধর্মের কথা তুলে কেউ তোমার প্রতি অন্যায় করতে পারবেনা। নারী পুরুষ নির্বিশেষে চাকুরী বা পেশার সকলের অধিকার সমান। তুমি

বিশেষ কোনো ধর্মের লোক বলে বিশেষ বিশেষ বিদ্যালয়ে তোমায় ছাত্র করে নেবেনা—এমনটা হতে পারবেনা। বড় হোক ছোট হোক, ধনী হোক নির্ধন হোক, নামজাদা হোক নামহীন হোক—সংবিধানের দৃষ্টিতে সবাই সমান।

কারো যদি ধারণা হয় যে সরকার তার প্রতি অবিচার করেছেন, সেখানেই ব্যাপারটা শেষ হয়ে যায়না। সত্যই যদি তার প্রতি অবিচার করা হয়ে থাকে, তাহলে সে তার অধিকার ফিরে পাবার জন্য কোর্ট-এর কাছে সুবিচার প্রার্থনা করতে পারে। রাষ্ট্রের প্রত্যেক দেশে হাইকোর্ট আছে, এগুলি নিয়ন্ত্রণ করেন বিচারাধিকার—সরকারের উপর তাঁরা নির্ভরশীল নন। হাইকোর্ট-এর উপর আছেন সুপ্রীম কোর্ট—হাইকোর্ট-এর রায়ের উপর যদি কেউ আপীল করেন সুপ্রীম কোর্ট-এ তার শুনানী হয়। বহু শত কেস-এ দেখা গেছে অভিযোগকারী সাধারণ লোক হলেও আইন সরকারের বিরুদ্ধে তার অনুকূলে রায় দিয়েছে। সুতরাং এ দেশে ন্যায় বিচারের দিক থেকে কেউ অসহায় নয়।

তুমি তো জানো কিছু কাল আগেও ভারতের এরকম অবস্থা ছিলনা। ইংরেজ যখন এ দেশের শাসক ছিল, ভারতীয় বিচারপতির এজলাসে ইংরেজ কখনো আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে চাইতনা। খুব স্বল্পসংখ্যক ভারতীয়ের ভোটাধিকার ছিল। দেশের ব্যাপারে দেশের লোক কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারতনা, দেশের অবস্থা সম্বন্ধে মনখুলে কথাও বলতে পারতনা। শাসকদের অপ্রিয় কোনো সত্য কথা বললে সঙ্গে সঙ্গে জেল হয়ে যেত।

ব্রিটিশ এদেশে আসার আগেও এসব দিক থেকে দেশের অবস্থা মোটেই ভালো ছিলনা। ভারতীয়েরা সবাই সবার সমান তো ছিলইনা—অন্যদের তুলনায় দেশের মুষ্টিমেয় লোকের হাতে টাকা ছিল অনেক বেশি, তাদের ক্ষমতা প্রতিপত্তিও ছিল বেজায়। সে যুগেও ধনী লোকেরা গরীবকে কাজে লাগাত নিজেদের মুনাফা বৃদ্ধি করতে। দেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশে আইন কানুন ছিল ভিন্ন ভিন্ন। গরীবের ভাগ্য নির্ভর করত আমীর ওমরাহের খোশখেয়ালের উপর। ভিন্ন ধর্মের লোকেরা পরস্পরের সঙ্গে খোলাখুলি মেলামেশা করতে পারতনা। কাউকে কাউকে অচ্ছুৎজ্ঞানে ঘৃণায় দূরে সরিয়ে রাখা হত। গরীব যে তার

অবস্থার উন্নতি করবে—সে সুযোগ ছিলনা বললেই হয়। যার কপালে যতটুকু জুটত অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে সে তা নীরবে মেনে নিত।

আমাদের সংবিধান এইসব কিছু ঢেলে সাজাতে চায়। এখন ভারতের লোক নিজেরাই নিজেদের ভাগ্যের নিয়ন্তা। যে ভারত আমরা গড়ে তুলতে

চাই, সেখানে যেমন তাদের অভাব অভিযোগ দূর করার চেষ্টা হবে, তেমনি চেষ্টা হবে তাদের নানা ইচ্ছা ও স্বপ্ন সত্য করে তুলতে।

স্বাধীনতা, সাম্য, সুবিচার, ন্যায়পরায়ণতা, সৌভ্রাত্র বোধ—এইসব মহান আদর্শ আমরা কোথা থেকে লাভ করেছি? এ প্রশ্নের জবাবে বলব এর কিছু কিছু পেয়েছি নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে, কিছু অন্য দেশের অভিজ্ঞতা থেকে

তৃষ্ণার্ত যেমন এক অঞ্জলি জলের জন্য আকুল হয়, ব্রিটিশ আমলে তেমনি আকুল আগ্রহে আমরা স্বাধীনতা লাভের অপেক্ষা করেছি। স্বাধীনতা লাভের অনেক আগের থেকেই আমাদের দেশনেতারা বলেছিলেন যে অন্য জাতির ক্ষেত্রে যেমন, ভারতের ক্ষেত্রেও তেমনি স্বাধীনতার অধিকার আমাদের জন্মগত; পরিশ্রমলব্ধ ধনসম্পদেও আমাদের অধিকার অবিসম্বাদী; মানুষের মতো মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে যা কিছু দরকার তা থেকে আমরা কিছুতেই বঞ্চিত হতে চাইনা। দেশের জন্য এসব তাঁরা একান্তভাবে চেয়েছিলেন কারণ এ সবের অভাবটুকুই তখন সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ত। এ দেশের মানুষের জন্য গান্ধীজীর প্রাণ নিরন্তর কাঁদত, তাই তো তিনি বলেছিলেন 'দেশের লোকের প্রতিটি চোখের প্রত্যেক অশ্রুবিন্দু' মুছে দিতে না পারা পর্যন্ত তাঁর আর বিশ্রাম নেই।

স্বাধীনতা লাভের অল্প কিছু দিন আগে জওহরলাল নেহরু দেশবাসীকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে অতীতে যেমন ভারত বহু ধর্ম ও ধর্মমতকে আশ্রয় দিয়েছিল, ভবিষ্যতেও তেমনিই দেবে। ভারতের সকল ধর্ম ও ধর্মমত সমান শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করবে। কিন্তু ধর্ম ও ধর্মমত নির্বিশেষে প্রত্যেক ভারতীয় দেশের প্রতি ভক্তি ও আনুগত্যের ক্ষেত্রে একতাবদ্ধ যেন হয়, কারণ প্রত্যেক ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়েও ভারত হবে ধর্মনিরপেক্ষ দেশ।

যেসব দেশনেতা ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে অগ্রণী ছিলেন, যাঁরা চেয়েছিলেন ভারত যেন দ্রুত প্রগতির পথে এগিয়ে যায়, তাঁদের সকলের চিন্তা, ভাবনা, আশা, অনুভব ভারত-সংবিধানের মধ্যে কোথাও না কোথাও স্থান পেয়েছে।

স্বাধীনতা, সাম্য, ন্যায় ও ব্যক্তিমহিমা সম্পর্কে পাশ্চাত্য দেশের চিন্তাবীর মনীষীরাও অনেক কিছু ভেবেছেন ও বলেছেন। তাঁদের সেইসব ভাবনার সূত্র ধরে গত দেড়শো বছর বহুদেশের স্বাধীনতাকামী দেশব্রতী প্রেরণালাভ করেছেন, আন্দোলন করেছেন। এইসব ভাবধারার সঙ্গেও আমাদের যোগাযোগ ছিল। সংবিধান রচনায় এইসব চিন্তাভাবনা থেকে আমরাও প্রেরণালাভ করেছি এবং এ থেকে এমন অনেক কিছু গ্রহণ করেছি যা না কি আমাদের দেশের বিশেষ অবস্থা ও প্রয়োজনের সঙ্গে খাপ খায়। সংবিধান রচনায় আমাদের প্রায় তিন বছর লাগে। স্বাধীন গণতন্ত্রের গঠন ও প্রগতির পক্ষে সহায়ক সকল রকম সূত্র একত্র গ্রন্থন করে সংবিধান যখন রূপ নিল, আমরা বললাম এই সংবিধানই আগামী কালে আমাদের পথ দেখাবে। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারী তারিখে ভারতকে গণতন্ত্র বলে ঘোষণা করা হল, সংবিধানও বিধিবদ্ধভাবে স্বীকৃত হল। ভারতের ইতিহাসে সে দিনটি স্মরণীয় দিন বলে প্রতি বছর গণতন্ত্র দিবসের বার্ষিকী আমরা জাতীয় উৎসব রূপে পালন করি।

আমাদের সংবিধানের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য অঙ্গ হল রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশক নীতি। সংবিধানের অপর অংশ বলে দেয় আমরা কোন পথে চলব। নির্দেশক নীতি নির্দিষ্ট করে দেয় আমাদের চরম লক্ষ্য কেমন রূপ নেবে। যাত্রার শেষে আমরা ঠিক কোথায় গিয়ে পৌঁছুতে চাই, তার একটি ছবি সর্বদা যদি মনের চোখের উপর ভাসে, তাহলে চলার পথে এগিয়ে যেতে আমরা কেবল উৎসাহ পাই এমন নয় অনাগত দিনে কোন নীতি অনুসরণ করব সে বিষয়েও নির্দেশ লাভ করতে পারি।

নির্দেশক নীতি বলে দেয় যে গণতন্ত্রী রাষ্ট্রকে এমনভাবে চলতে হবে যাতে বুঝতে কষ্ট না হয় যে জনগণের মঙ্গলই দেশের প্রধান লক্ষ্য। সেই জনমঙ্গল রাষ্ট্রে অর্থ বা বিত্ত উপার্জনে, শক্তি বা ক্ষমতা লাভে—এক কথায় নিজের উন্নতি বিধানে সকল লোকের সমান অধিকার থাকবে। অর্থাৎ, ভারতকে আমরা এমনভাবে গড়তে চাই যাতে এখানে শ্রেণীভেদ, জাতিভেদ কিংবা অপর কোনো রকম বৈষম্য না থাকে এবং সবাই সকল জিনিস সমানভাবে ভাগ করে নেবার সুযোগ পায়। অন্য অনেক কাম্য বস্তুর মতো এই সাম্যভাব চাওয়া সহজ, পাওয়া তত সহজ নয়। কিন্তু যে দেশে এমন কথা ইতিপূর্বে কেউ বলতে সাহস

পায়নি, সে দেশে সাহস করে এমন কথা বলা এবং সাম্যভাবকে আদর্শরূপে গ্রহণ করে সেই লক্ষ্য ধরে চলা—সেটাও তো প্রগতির পথে মস্ত পদক্ষেপ।

আমাদের সংবিধান বলে সবার উপরে দেশের মানুষের সমবেত ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। এখন কথা হচ্ছে জনগণ কীভাবে তাদের সেই ইচ্ছা প্রকাশ করবে? তাদের ইচ্ছা প্রকাশের উপায় হল নির্বাচন। গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে একেবারে লোক সভা পর্যন্ত তারা তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি মারফত তাদের মতামত প্রকট করে। প্রত্যেক বয়স্ক লোকের অধিকার আছে বলার যে কীভাবে দেশের শাসন ব্যবস্থা চলবে। যদি গরিষ্ঠ সংখ্যক কোনো এক বিষয়ে একমত না হয়, তবে সে মতের কোনো মূল্য দেওয়া হয়না। স্বৈরাচারী রাজামহারাজা ও বিদেশী শাসক যে দেশে অত্যাচার নির্যাতন করে শাসন করত, সে দেশে যদি জনমতকে এতটা প্রাধান্য দেওয়া হয়, তাহলে তাকে সামান্য ব্যাপার বলি কি করে?

নতুন সংবিধান অনুসারে এ দেশে প্রথম সাধারণ নির্বাচন হয় বিশ বছর আগে। লোক সভা ও বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভার জন্য সর্বশুদ্ধ চার হাজার চারশো জন প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়। ভোট দেয় সতরো কোটি ষাট লক্ষ লোক। তাদের অনেকেই ছিল লেখাপড়া না জানা মানুষ। পৃথিবীতে কোথাও এমন নির্বাচন হয়নি যাতে এত লোক ভোট দিয়েছে। অথচ এমন শান্তিপূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গতভাবে নির্বাচন সমাধা হল দেখে সকলেই প্রশংসা করেছিলেন। পাঁচ বছর পরে আবার সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল, এবার ভোটার-এর সংখ্যায় যোগ হয়েছিল আরো দু'কোটি লোক। এবারও শান্তি শৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে নির্বাচন হয়ে যায়।

এসব দেখে শুনে স্পষ্টই বুঝতে পারা গেল যে গণতন্ত্রের বীজ এদেশে শিকড় নিতে আর দেরি নেই।
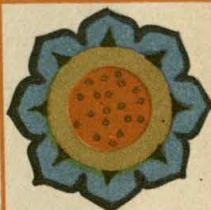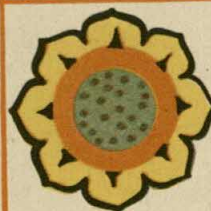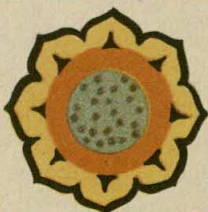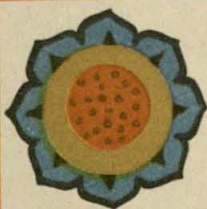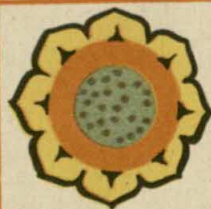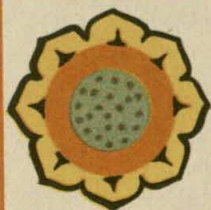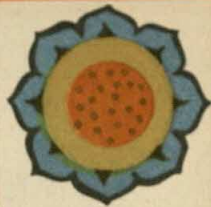
৯

আমাদের নিজস্ব পরিকল্পনা

গরীব বাড়ির একটি ছেলের যেন অসুখ হল। ডাক্তার ওষুধে বিস্তর টাকা লাগে, কিন্তু উপস্থিত মতো ছেলেটিকে সুস্থ করে তোলাটাই পরিবারের প্রধান কাজ।

যদি সব টাকাটাই ওষুধে ডাক্তারে খরচ হয়ে যায়, তাহলে খিদে পেলে তারা খাবে কি? ভালো হয়ে যাবার পর রুগ্ন ছেলেটি যদি খেতে না পায় তাহলে সে তো আবার অসুখে পড়বে। ছেলেটির বাবা যদি অনাহারে থাকে তাহলে সে না পারবে কাজে যেতে না পারবে পরিবারের অন্ন সংস্থান করতে। ছেলের মা উপোস দিলে সে না পারবে রান্না করতে বাসন ধুতে ঘরদোর ঝাঁটপাট দিতে. না পারবে স্বামী ও ছেলেপিলের দেখাশোনা করতে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে পরিবারের পক্ষে প্রথমেই দরকার আহার। কাপড় চোপড় না হলেও চলবেনা। পরিবারে স্কুলে যাবার মতো ছেলেপিলে যদি থাকে তো তাদের পুঁথিপত্তর দরকার। কাজের জায়গায় যাবার জন্য বাবার পকেটে কিছু পয়সা থাকা দরকার। কাজের জায়গা যদি বাড়ির কাছাকাছি হয় তাহলে হয়তো তাকে কাজের যন্ত্রপাতি কেনার জন্য কিছু পয়সা খরচ করতে হয়।

একটি পরিবারের পক্ষে আরো অনেক জিনিসের দরকার হয়—জুতো, কম্বল, সাবান, চিরুনি, একটা ট্র্যানজিস্টার রেডিয়ো, সাইকেল, ঝাড়ু, খবর কাগজ, রান্না খাওয়ার বাসনপত্র, নতুন জামা কাপড় এবং আরো কত কী। বাবা হয়তো মাঝে মধ্যে সবাইকে নিয়ে সিনেমা দেখে আসতে চায়। মা হয়তো চায় কিছু ফুল কিনে ঘর সাজাতে। ছেলেরা হয়তো নতুন একটা ফুটবল, কিংবা কোনো বন্ধুর জন্মদিনের উপহার কিংবা হয়তো কোথাও বেড়াতেই যেতে চায়।

পরিবারের পক্ষে এ সমস্ত জিনিসই হয়তো দরকার, কিন্তু কোনোটা হয়তো না পেলেই নয়, আবার কোনোটা না পেলেও চলতে পারে কিংবা সেটা না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা যায় যদিচ পেলে মন্দ হয়না। কিছু জিনিস না থাকলে কিছু এসে যায়না যদিচ থাকলে ভালোই লাগে। এই শেষোক্ত পর্যায়ের জিনিসকে বলা যায় বিলাস সামগ্রী। গরীব যারা, বিলাসিতা করতে পারেনা।

নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিস অর্থাৎ যা না পেলেই নয় তার জন্য টাকা

খরচ করতে হয় পরিবারের যৎসামান্য মাসিক আয় থেকে। দরকারী জিনিস কিছু যাতে বাদ না যায়, সেজন্য পরিবারের লোকেদের আগাম একটা পরিকল্পনা ছকে নিতে হয় - খাবার দাবারে, কাপড় চোপড়ে, ঘরবাড়িতে আর অন্য ব্যাপারে কেমন কেমন খরচ করা হবে। আগে ভাগে যদি বেশ খুঁটিনাটিতে ভেবে রাখতে পারে - তাহলে সেটা পরিকল্পনার দিক থেকে অনেক ভালো। ধরো তারা যেন ঠিক করল খাওয়াদাওয়াতে তারা এত টাকা খরচ করবে, তার আগে
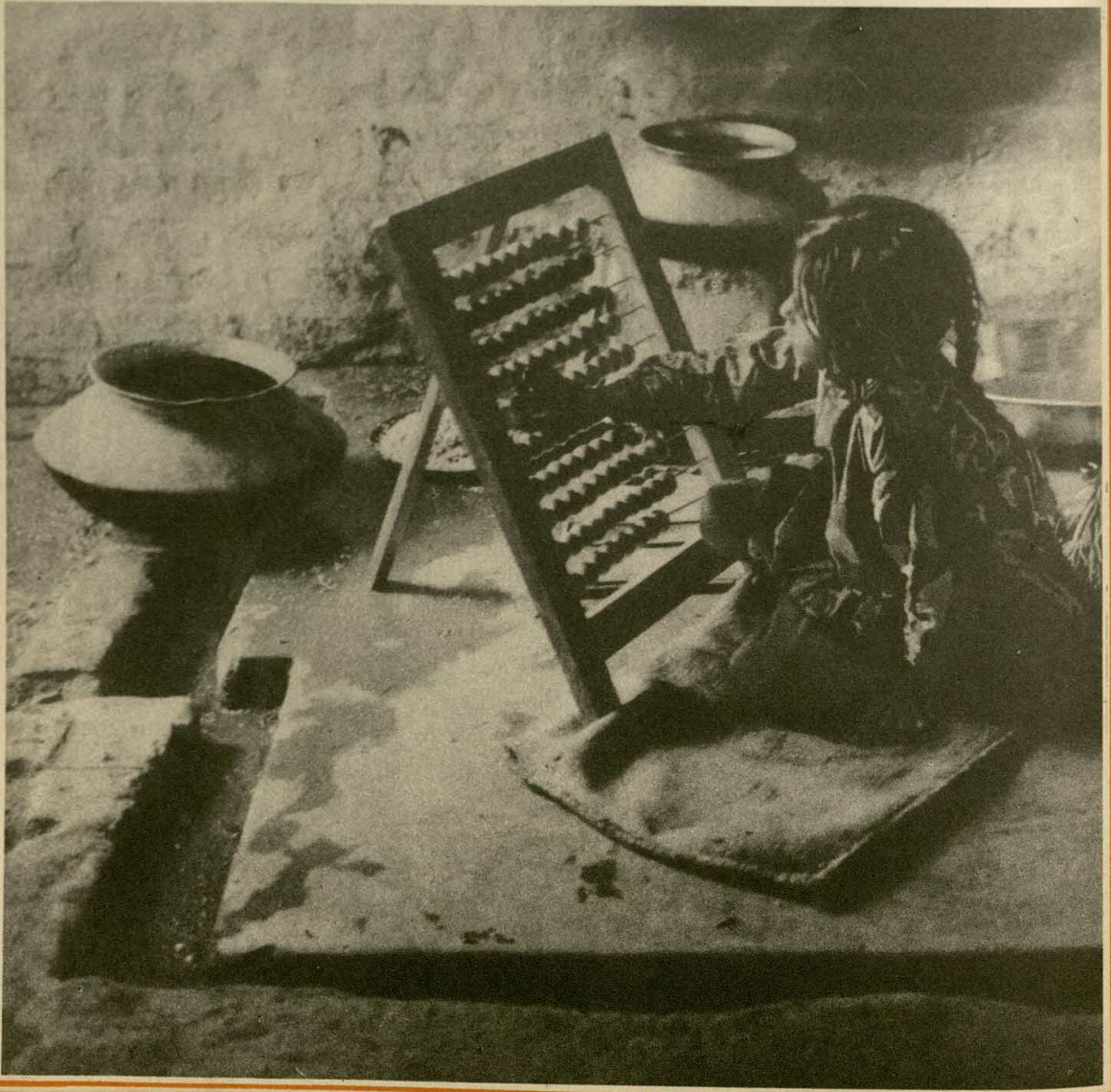
তাদের ভেবে রাখা দরকার বাগানে তারা কতটা শাকসজী ফলাতে পারবে, বাজার থেকেই বা কতটা কেনা দরকার; তারপর সজী রান্না করতে তেল লাগবে কত, ঘুঁটেকয়লাতে কত খরচ পড়বে কিংবা বাসনেকোসনে, কতটা সময় লাগবে রান্নাবান্না করতে, কে কি করবে কখন করবে ইত্যাদি ইত্যাদি। যেসব বাড়িতে রান্নাবান্না নিয়ে খুব যত্ন, তেমন বাড়িতেও তরকারি পুড়ে যেতে পারে, দুধের ছানা কাটতে পারে—অর্থাৎ খাবারদাবার নষ্ট হতে পারে এবং নষ্ট খাবার ফেলে দিতে হতে পারে। এইসব আকস্মিক দুর্ঘটনার কথা মনে যদি রাখা না যায় পরিকল্পনা রচনার সময়, তাহলে সে পরিবার হয়তো খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে বরাদ্দ টাকার অতিরিক্ত কিছু খরচ করতে বাধ্য হবে।

পরিকল্পনা দুরকম ভাবে ছকা যায়। এক রকম পরিকল্পনা হতে পারে নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসের ব্যবস্থা করা নিয়ে। এইমাত্র আমরা একটি যে পরিবারের কথা তুলেছিলাম, তারা তো খাবারদাবার, কাপড় চোপড়, ওষুধপত্তর ছাড়া চলতেই পারেনা। প্রতিমাসে তাই এই তিন খাতে তাদের নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা বরাদ্দ করতে হয়। এসব খরচ নির্বাহের পর তাদের এমন কিছু উদ্বৃত্ত থাকেনা যা দিয়ে এমন জিনিস কেনা যায় যা থেকে একটু বেশি আরাম পাওয়া যায় কিংবা আনন্দ পাওয়া যায়। কাজে কাজেই এসব জিনিসের জন্য তারা কোনো টাকা বরাদ্দ করেনা। বছরের পর বছর, মাসের পর মাস—তাদের এইরকম একঘেয়ে ভাবে দিন গুজরান হয়। যেখানে তাদের বাস সেখান থেকে তারা বড় একটা নড়তে চড়তে পারেনা। নতুন জায়গায় বেড়াতে যাওয়া, নতুন একটা ফুটবল কেনা, নতুন বইয়ের মুখ দেখা—এ সমস্তই থাকে তাদের আয়ত্বের বাইরে। এই পরিবার কোনো প্রকারে সংসার চালায়, এদের জীবনের মানে কোনো উন্নতি ঘটেনা। এই হল এক ধরনের পরিকল্পনার ছবি।

দ্বিতীয় এক ধরনের পরিকল্পনার লক্ষ্য আজ যে অবস্থা আছে কাল তার উন্নতি সাধন। এতটা ঝটপট উন্নতি সম্ভবপর না হলেও তার সম্ভাবনার জন্য পূর্ব থেকে প্রস্তুত হওয়া তো যায়। তাহলে আজ যা পাওয়া গেল না কিছুকাল পরে তা পাওয়া যেতেও পারে। কত কাল অপেক্ষা করতে হবে

সেটা নির্ভর করে যা চাও তা আজ তোমার নাগালের কতটা বাইরে, সেটা নাগালে পাবার জন্য কতটা পরিশ্রম করতে তুমি রাজি, তোমার উদ্যমে তুমি কতটা সাহায্য পেতে পারো এবং যা পেতে চাও তার জন্য কতখানি ছাড়তে পারো।

যা তুমি চাও, তা কেনবার মতো পয়সা আজ তোমার পকেটে নাও থাকতে পারে। কিন্তু কাল থেকে যদি প্রতিটি পয়সা তুমি জমাতে শুরু করো, একদিন নিশ্চয় তুমি কিনতে পারবে। তার চেয়েও ভালো হয় যদি তুমি নিজের হাতে জিনিসটা তৈরি করে নিতে পারো—যদিও যন্ত্রপাতি সরঞ্জামে কিছু পয়সা খরচ করতে হতে পারে। কিংবা তুমি এমন কোথাও গেলে যেখানে জিনিসটা তৈরি করা শেখানো হয়। তাহলে যন্ত্রপাতিতে তোমার কিছু লাগলনা কেবল সরঞ্জামটা কিনতে হল।

যদি জিনিসটা তুমি শেষ পর্যন্ত তৈরি করতে পারলে, তাহলে তোমার নিজের জন্য যেমন করলে তেমনি অপরের জন্যও করতে পারো। তারাও তাহলে বেশ মজা পায় এবং তোমার কাছ থেকে শিখে নেয় কীভাবে জিনিসটা বানাতে হবে। কিছু কালের মধ্যে হয়তো জিনিসটা সহজেই পাওয়া যাবে অর্থাৎ সস্তায় পাওয়া যাবে। এরকমটা যদি ঘটে অন্য নানা সামগ্রীর ক্ষেত্রে, তাহলে বুঝতে হবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাচ্ছে ও তার ফলে জীবনযাত্রার মান উন্নত হচ্ছে।

স্বাধীন হবার অব্যবহিত পরে ভারত যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছে—তার ছকটা এই দ্বিতীয় ধরনের পরিকল্পনার মতো। ভারতের জনগণ জীবনযাত্রার যে নিম্ন মানে ছিল সেখানেই থেকে যেতে চায়নি, তারা চেয়েছে এগিয়ে যেতে, জীবনের মান উন্নত করতে।

১০
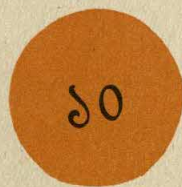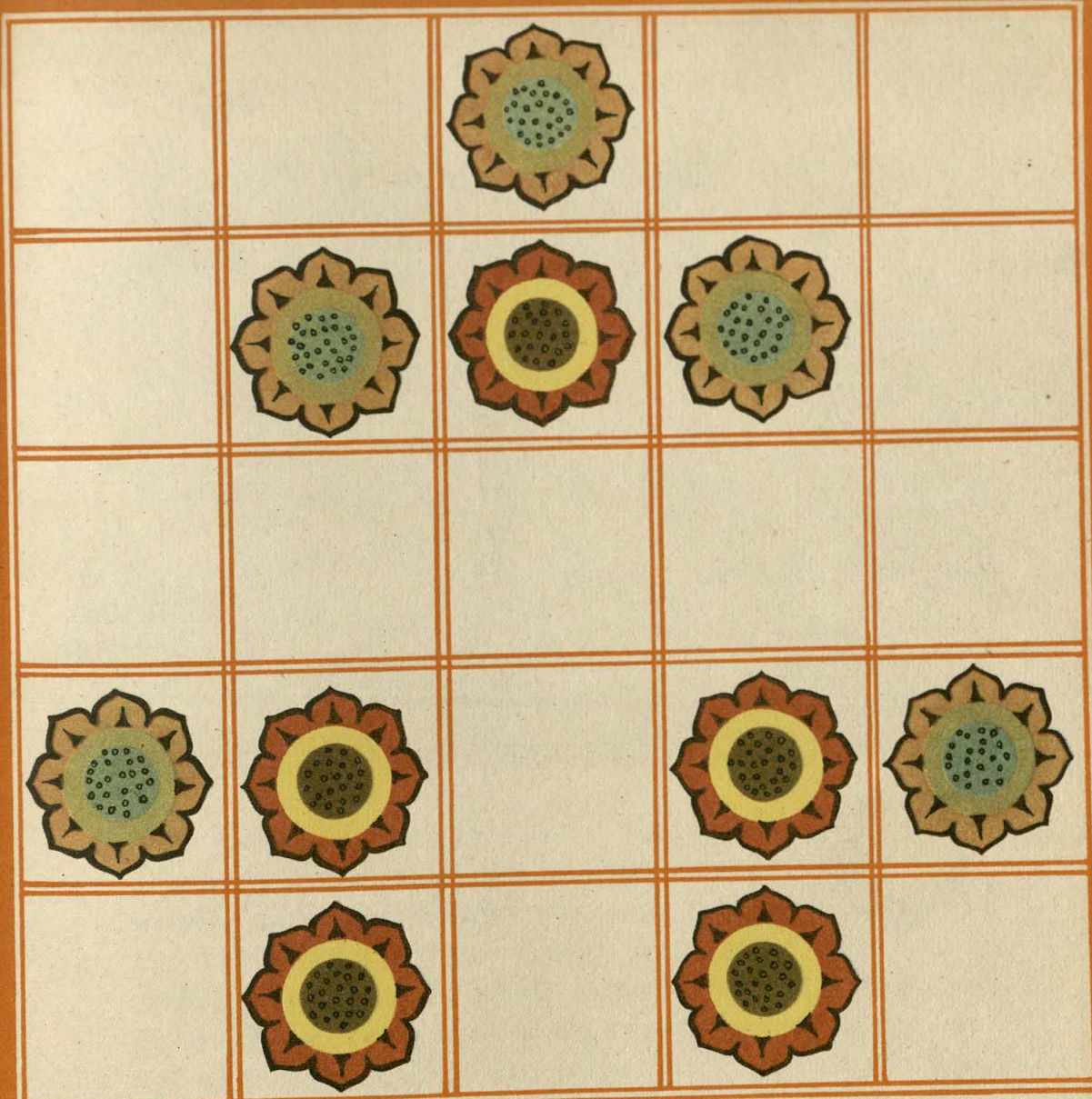
যেখানে সবাই রাজা

তুমি তো জানো আমরা যা চেয়েছিলাম তার তুলনায় আমরা পেয়েছিলাম যৎসামান্য। সুস্থ হয়ে বেঁচে থাকতে হলে মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজন যতটুকু ততটুকু আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকের ভাগ্যে জুটতনা। তাছাড়া লোকসংখ্যা ছিল প্রচুর এবং তাদের সংখ্যা ছিল ক্রমবর্ধমান। পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশের মধ্যে আমরা ছিলাম একজন। আমাদের ভাণ্ডারে এমন অপর্যাপ্ত অর্থ ছিলনা যা নাকি সকলের মধ্যে বণ্টন করা চলত। আর থাকতও যদি তা দিয়ে তো খুব বেশি কাল চালানো যেতনা।

কাজটা মোটেই সহজ ছিলনা, তাই আমাদের পরিকল্পনার ছকটা আঁকতে গিয়ে আমাদের বেগ পেতে হয়েছিল যথেষ্ট। প্রথম থেকেই স্পষ্ট বুঝা গিয়েছিল যে প্রত্যেক লোককে একটা কোনো কাজের ভার নিতে হবে এবং সে কাজ তাকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হবে।

কাজ করার সবচেয়ে সহজ উপায় হল হুকুম দেওয়া—যেমন হুকুম দেয় জঙ্গী জাঁদরেলরা। বাড়ির কর্তা যিনি তিনিও মাঝে মাঝে, বিশেষত গুরুতর ব্যাপারে হুকুম দিয়ে বলতে পারেন, 'তোমাকে এমনটা করতে হবে', 'এমনটা তুমি করতে পাবেনা'! অনেক পরিবারে কর্তার আদেশ বিনা বাক্যব্যয়ে পালন করা হয়। এরকমটা আমরা ভারতের বেলাও করতে পারতাম। সরকার ডিক্টেটর হয়ে যাকে যেমন ইচ্ছা করতে বলতে পারতেন। কেউ অমান্য করলে সরকার শাস্তি বিধানও করতে পারতেন। তাহলে হয়তো বাইরের দিক থেকে দেশের উন্নতি ত্বরান্বিত হত এবং পরিকল্পনার ছক মাফিক সবকিছু হতে পারত। কিন্তু এ দেশের লোক ভেবেছিল এই ধরনে হুকুম তামিল করে কাজ করাটা আমাদের পক্ষে ঠিক উপযোগী হবেনা। ভয়ে কিংবা জবরদস্তিতে পড়ে কাজ করাটা আমাদের স্বভাবে নেই।

হুকুমের চাকর হয়ে তুমিও তো নিশ্চয় ঘরসংসারের কাজ করতে চাওনা। কাজ করতে তোমার ভালো লাগে বলেই তো বাড়ির কাজ করো—কেমন কি না? আর পাঁচ জন বয়স্ক লোকের মতো তোমাকেও যদি সংসারের সমস্যা আলোচনা করতে ডাকা হয়, তাহলে তো তুমি নিজের থেকেই সাধ্যমতো কাজ-কর্ম করতে চাইবে—কারণ পরিবার তো তোমারই পরিবার সুতরাং সমস্যাগুলি তোমার নিজেরও সমস্যা। অবশ্য এমনটা যে হবেই তার কোনো মানে নেই। তুমি যদি স্বার্থপর হও তাহলে সংসারের আর পাঁচ জনের কী হল না হল—তাতে বড় তোমার বয়েই গেল। অথবা তুমি কী করবে না করবে তাই নিয়ে ভাবতে ভাবতেই হয়তো তোমার বেলা বয়ে যাবে। কিন্তু

পরিবার যদি তোমায় আপন জেনে তোমার উপর বিশ্বাস ন্যস্ত করতে চায়, তা হলে তুমি উল্‌টা বুঝতে পারো সেই ভয়ে তারা পিছু পা নিশ্চয় হবেনা।

আমরাও পরিকল্পনা রূপায়ণের কাজে এই পারিবারিক ধরনে কাজ করার রাস্তাটাই বেছে নিয়েছি। আমরা ঠিক করে নিয়েছি কাজে হাত দেবার আগে দেশের লোককে দেশের সমস্যাগুলি আলোচনা করে কাজটা কীভাবে করতে হবে সে বিষয়ে মনস্থির করতে দেওয়াটাই সব চাইতে ভালো। কাজ কি করতে হবে, কেমন ভাবে করতে হবে—সে বিষয়ে প্রত্যেক ভারতীয়ের মতামত জেনে নিয়ে তবেই যদি কাজে হাত লাগানো হয়, তাহলে সময় লেগে যাবে অনেক বেশি। একটু ধীরে সুস্থে হলেও এইভাবে কাজ করাটাই আমরা প্রশস্ত মনে করি। এই পদ্ধতিতে কাজ করার নাম গণতান্ত্রিক পরিকল্পনার রূপায়ণ। শাসন ব্যবস্থায় যেমন, পরিকল্পনা রূপায়ণেও তেমনি, দেশের লোকের সমবেত ইচ্ছাকেই আমরা সবচেয়ে প্রাধান্য দিতে চাই।

এই পদ্ধতিকেই সর্বোৎকৃষ্ট বলে আমরা কেন বেছে নিয়েছি? কেননা ঝটপট কাজ করাটাই কাজের কৃতিত্বের একমাত্র পরিমাপ নয়। দেশের লোককে বেশি বেশি বস্তুসম্ভার দিয়ে কীলাভ—যদি তারা মনে করে তাদের মতামতের মূল্য নেই, তাদের পরামর্শ না করেই সবকিছু তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, সরকারের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক এখনো শাসক-শাসিতের সম্পর্ক? স্বাধীন ভারতকে সুপরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলার প্রধান উদ্দেশ্যই হল দেশের লোকের মঙ্গল। অন্য কোনো উপায়ে আমরা হয়তো ঝটপট অনেকগুলি কলকারখানা, সেতু কিংবা বাঁধ নির্মাণ করতে পারতাম। কিন্তু আমরা যে চাই দেশের মানুষকে মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে। বড় বড় ব্যাপারে তাদের নিজেদেরই যদি সিদ্ধান্ত নিতে হয় তবেই তো তারা সত্য সত্য সাবালক হয়ে উঠবে, শক্তিমান হয়ে উঠবে নিজেদের অন্তরে। যে কোনো দেশের পক্ষেই দেশের লোকের আত্মিক বল সব চাইতে মূল্যবান সম্পদ।
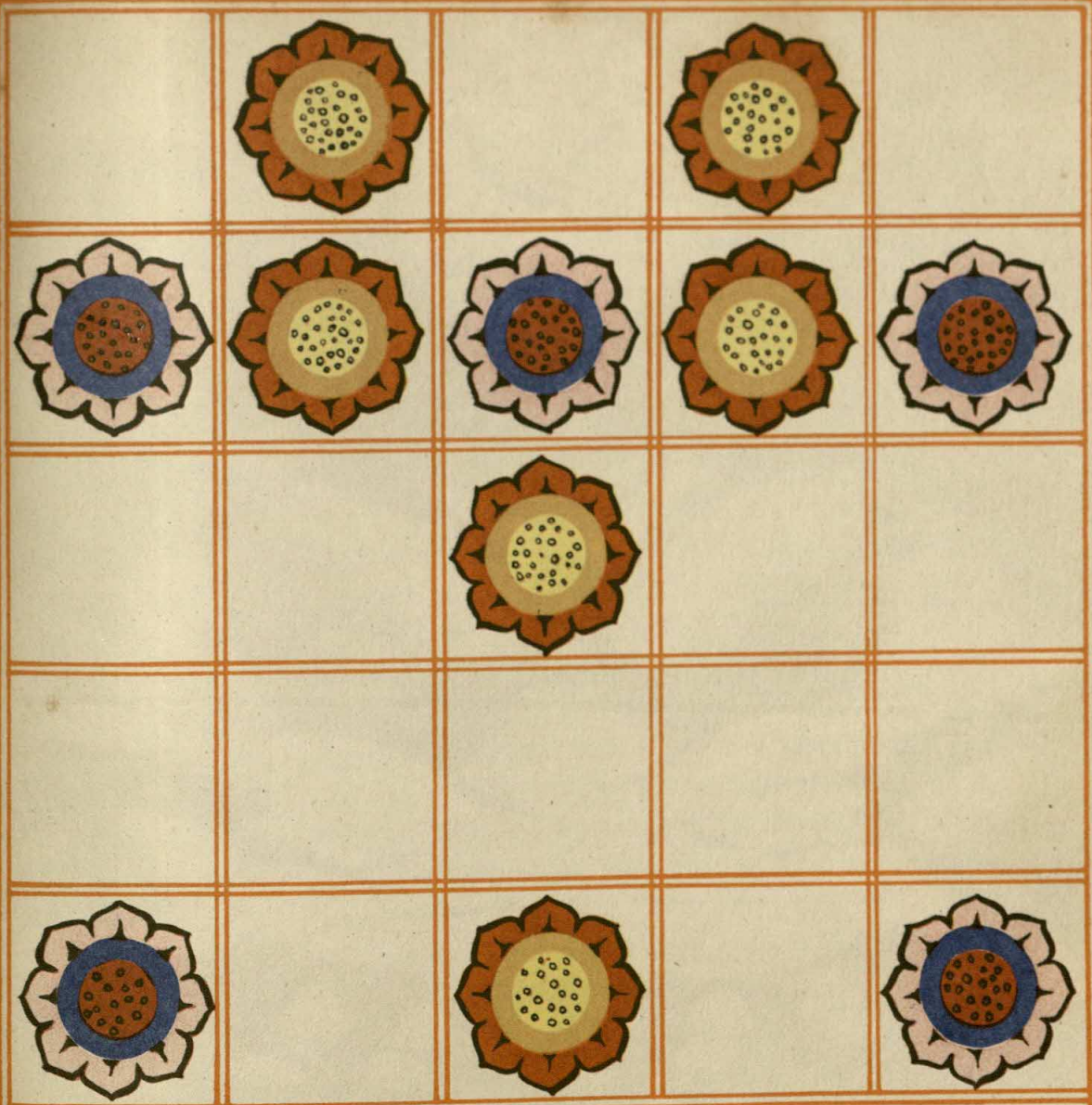
১১

চাওয়া পাওয়া
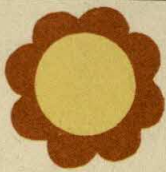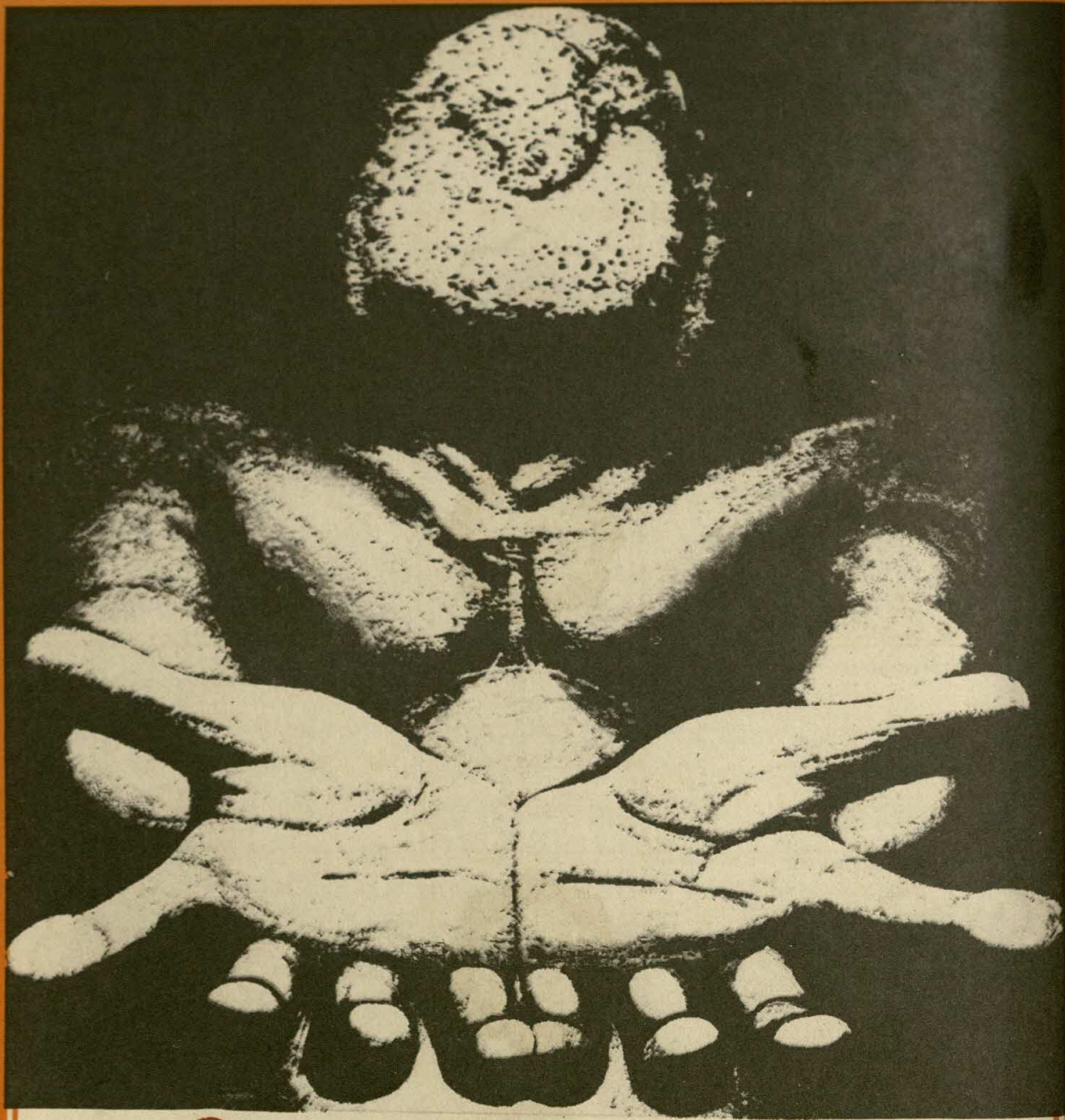
অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয় সকল লোকেরই দরকার। বুনো জন্তুরাও বেঁচে থাকার জন্য শিকার ধরে খায়। তাদের অবশ্য বস্ত্রের বদলে গায়ে লোম আছে কিম্বা পালক আছে। আশ্রয় একটা তারা নিজেরাই খুঁজে নেয় অথবা বানিয়ে নেয়। কিন্তু মানুষের

অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়ের অতিরিক্ত অনেক কিছু দরকার।

তুমি নিশ্চয় লক্ষ্য করে থাকবে কোনো একটা বাধা থাকার ফলে গাছ সোজা হয়ে বেড়ে উঠতে পারেনি, কোনো প্রকারে বেঁকেচুরে দাঁড়িয়ে আছে। এমন ফুলের গাছও হয়তো দেখেছ যা যথেষ্ট পরিমাণে সূর্যের আলো ও তাপ পায় না বলে অথবা জলের অভাবে অথবা মাটিতে সার না থাকায়, ফুল ফোটাতে পারেনা। অন্ন, বস্ত্র ও আশ্রয়ের অতিরিক্ত মানুষের যা দরকার—তা না পেলে মানুষেরও একইরকম দশা হয়। এমনটা হয়েছে, এবং এখনো এদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের ক্ষেত্রে হয়।

এই অতিরিক্ত জিনিসগুলি কি? কাজ করে ক্লান্ত হয়ে গেলে মানুষ বিশ্রাম চায়। চিন্তা, বোধ ও অনুভূতির শক্তি তীক্ষ্ণ রাখতে গেলে তার চর্চার জন্য অবকাশ দরকার। মানুষ বই পড়বে, গানবাজনা শুনবে, ছবি কিংবা মনোরম দৃশ্য দেখবে, অন্য লোকের সঙ্গে চিন্তাভাবনার আদান প্রদান করবে —তার জন্য সময় ও সুযোগ না হলে কেবল বেঁচে থেকে কী লাভ? উপরন্তু মানুষ কাঁদবে, হাসবে, কিংবা একান্তে চুপ করে বসে জন্ম মৃত্যুর রহস্য বিষয়ে ভাববে—তা না হলে সে কিসের মানুষ? এসব ব্যতিরেকে ঠিক যেভাবে মানুষের গড়ে ওঠা দরকার তেমন ভাবে সে গড়ে উঠতে পারেনা। তার অবস্থা হয় অষ্টাবক্র গাছটার মতো অথবা অ-ফুলা ফুলগাছটির মতো।

পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বে মানুষ যদি বড় হয়ে উঠতে চায় তবে যেসব জিনিসের প্রয়োজন সেগুলি তো আপনা থেকে এসে জোটেনা। কাজ থেকে কিছু সময় উদ্বৃত্ত না হলে অবসর আসবে কোথা থেকে? তাছাড়া তাদের শরীর স্বাস্থ্য ভালো থাকা দরকার, শিক্ষিত হওয়া দরকার, এবং দরকার কিছু অতিরিক্ত টাকা পয়সা—যা দিয়ে বই কেনা যায় কিংবা গানের রেকর্ড।

তুমি তো জানো সকল জিনিসই পয়সা দিয়ে কিনতে হয়। অন্ন, বস্ত্র যেমন পয়সা না দিলে পাওয়া যায়না, অবসর এবং অন্য প্রয়োজনীয় জিনিসেরও তেমনি দাম আছে। বাস্তবপক্ষে নিছক শরীর ধারণের জন্য যেসব জিনিস দরকার তার তুলনায় অন্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য অনেক বেশি। কেন

এমনটা হয়—একটু বড় হলে বুঝতে পারবে। অথচ শরীর ধারণের জন্য যা দরকার তার সঙ্গে সঙ্গে এগুলির ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত বলা যায়না যে দেশের লোকের সমূহ কল্যাণ করছি। আজো আমাদের দেশের লোক পেট ভরে দু'মুঠো খেতেও পায়না। গোড়াতে তাই অন্নবস্ত্রের দিকটা বড় করে না দেখলেই নয়। তাহলেই বুঝতে পারো পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে বেঁচে থাকার মতো ব্যবস্থা করতে হলে কতটা দীর্ঘ পথ এক পা এক পা করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

গান্ধীজী একবার বলেছিলেন গরীবের কাছে রুটিই ভগবান। তার অর্থ হল এই যে খিদে যতক্ষণ না মেটে ক্ষুধার্ত মানুষ অন্য কোনো বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করতে পারেনা। কিন্তু অন্ন বস্ত্র আশ্রয়ের প্রয়োজন মেটবার পরেও অনেক কিছুর দরকার থাকে। ছেলেমেয়েদের জন্য স্কুল, অসুস্থ লোকেদের জন্য হাসপাতাল, যানবাহন, রাস্তাঘাট, খবরাখবর পাওয়ার ব্যবস্থা—এবং আরো কত কি। এখনো আমরা আছি এইসব প্রয়োজন সাধনের প্রথম ধাপে—এখনকার মতো আমাদের লক্ষ্য দেশের কোনো লোক যেন ভুখা না থাকে। অন্য জিনিস আসবে পরে। যেহেতু আমরা ঠিকই করেছি যে প্রয়োজন সাধনের ব্যাপারে সবাই সমান সুযোগ পাবে, আমাদের চিন্তা করে দেখতে হচ্ছে কী উপায়ে সাতান্ন কোটি লোকের অন্ন বস্ত্র ও আশ্রয়ের সংস্থান করা যায়।

বিদেশ থেকে অনেকে এদেশে বেড়াতে এসে দেখতে পান রাস্তায় রাস্তায় হাটে বাজারে ছেঁড়া কাপড় পরা নগ্নপ্রায় ভিখারীর দল বসে বসে ভিক্ষা চাইছে, কাজ কিছু করছেনা। তাঁদের অনেকে আমাদের জিজ্ঞাসা করেন, 'এদের দিয়ে তোমরা কোনো কাজ করাও না কেন—এরা তো বসে বসে ভিক্ষা চাইছে?' কেউ হয়তো বলেন, 'তোমাদের সরকারের উচিত ওদের কোনো কাজ দেওয়া, আর কাজ দিতে যদি না পারেন, কিছু টাকা পয়সা ওদের হাতে তুলে দেওয়া।' এই ধরনের চিন্তা হয়তো তোমার মনেও উদয় হয়ে থাকবে। এখন দেখা যাক, এই প্রশ্নের ঠিক জবাব কী।

সরকার তো সবাইকার সবরকম প্রয়োজনের জিনিসের সংস্থান অবশ্যই করতে চান। কিন্তু যত আগ্রহই থাক এবং যত চেষ্টাই তিনি করুন না কেন,

সরকারের হাতে যে সম্বলটুকু আছে তার অতিরিক্ত তো তিনি দিতে পারেন না। সরকারের হাতে অজস্র কাজও নেই, অঢেল টাকাও নেই। এই দুটো ব্যাপারই নির্ভর করে সামগ্রিকভাবে দেশের উন্নতির উপর, অর্থাৎ ইতিমধ্যেই সরকার দেশের লোকের জন্য কতটুকু কী করতে পেরেছেন—তার উপর। এই দরিদ্র দেশে আমরা তো সবেমাত্র উন্নতির পথে পদক্ষেপ করেছি। এমন অবস্থায় আমাদের পক্ষে অচিরাৎ সকল লোকের সকল প্রয়োজন মেটানো সম্ভবপর হয় কি?

তুমি হয়তো বলবে যে কিছু লোকের অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি আছে, সুতরাং তাদের কাছ থেকে কিছু কিছু নিয়ে অন্যদের বিতরণ করে দিলেই তো সকলে প্রায় সমান সমান পেতে পারে। সেটা যে আমরা একেবারে না করছি এমন নয়, কিন্তু কেবল সেটুকু করলেই সমস্যার সমাধান হতে পারেনা। এক হাজার তৃষ্ণার্ত লোকের মধ্যে এক ঘটি জল সমান ভাগে ভাগ করতে গেলে কি কারো কোনো সত্যকার লাভ হয়? আসল কথাটা হল এই যে এ দেশে দরিদ্র যত লোক আছে তার তুলনায় ধনীর সংখ্যা নিতান্তই কম। হিসাব করলে হয়তো দেখা যাবে ধনীদের সমস্ত ধন একত্র করে তা যদি দরিদ্রদের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে দেওয়া যায়, দেশের গরীবি ঘুচবেনা। প্রত্যেকের ভাগে যা পড়বে তা হবে নিতান্তই যৎসামান্য। আগে যেমন ছিল প্রায় তেমনই হবে। ধনীর ভাণ্ডারে যত টাকাই জমা পড়ে থাক না কেন, সাতান্ন কোটি ভারতীয়ের মধ্যে তা সমভাবে ভাগ করতে গিয়ে দেখবে মোটা-মুটিভাবে যেমনকার তেমনই রয়ে গেল। না, এভাবে সমস্যার সমাধান হয়না।

তাহলে সমাধান কি কিছু নেই? সৌভাগ্যের কথা একটা সমাধান আছে—যদি আমরা সবাই মিলে জোর চেষ্টা করি। তুমি, আমি আর দেশের অন্য পাঁচজন মিলে সবকিছু প্রয়োজনের জিনিস বেশি করে উৎপাদন করার জন্য যদি যথাসাধ্য চেষ্টা করি, তাহলে একটা কাজের মতো কাজ হয়। আরো একটি কথা, ইতিপূর্বে আমরা যেসব জিনিস বেশি বেশি খরচ করে এসেছি, এখন তা কম কম করে খরচ করতে হবে। এইভাবে দেশের ভাণ্ডার বাড়ানো যেতে পারে। এই ভাণ্ডার থেকে অতিরিক্ত জিনিস তখন বহু লোকের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া যাবে। নিতান্ত যারা গরীব, যাদের যৎসামান্য আছে তাদের কিঞ্চিৎ

বেশি দেবার এই একমাত্র উপায়। তাহলেই দেখছো সমাধানের চেষ্টা করতে হয় দুটো দিক থেকে। প্রথমত, সারা দেশের জন্য যে লাড্ডুটা গড়তে হবে সেটা আকারে বেশ বড় হওয়া দরকার। তা হলে প্রত্যেকে তা থেকে একটু করে টুকরো পাবে। দ্বিতীয়ত, সমান ভাগে যাতে সবাই পায় সেটা দেখতে হবে, কেউ বেশি কেউ কম পেলে চলবেনা। এই দুটোই জরুরী। দুটোর একটাও যদি আমরা ঠিক মতো করতে না পারি, দেশের লোক ভুখা থাকবে।

১২
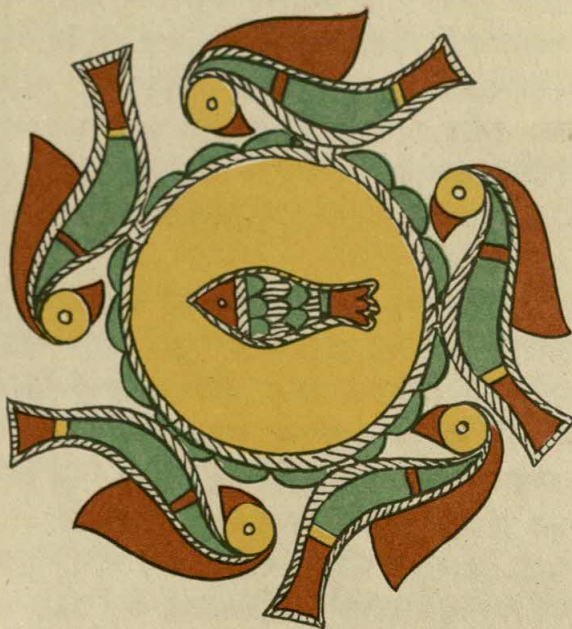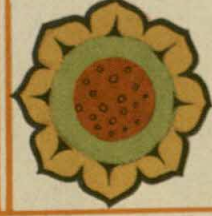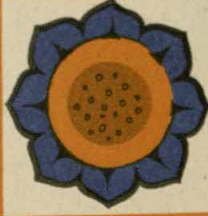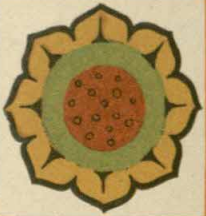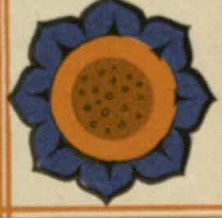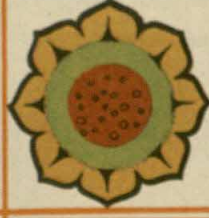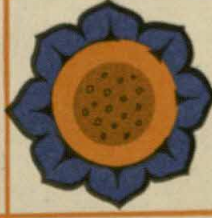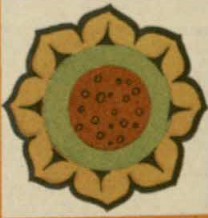
পরিবারের কর্তা
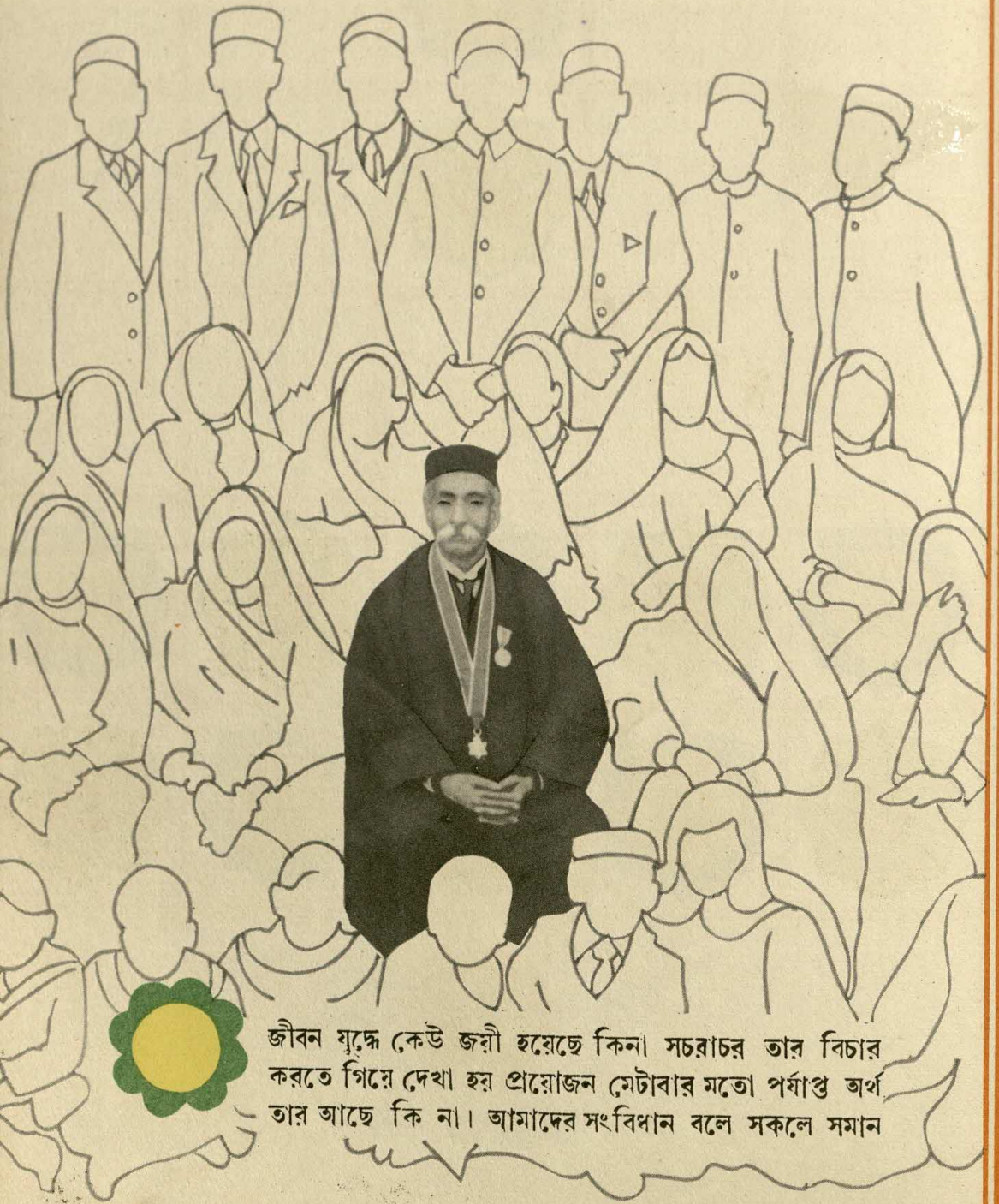
জীবন যুদ্ধে কেউ জয়ী হয়েছে কিনা সচরাচর তার বিচার
করতে গিয়ে দেখা হয় প্রয়োজন মেটাবার মতো পর্যাপ্ত অর্থ
তার আছে কি না। আমাদের সংবিধান বলে সকলে সমান

সুযোগ লাভ করুক অর্থাৎ দেশের সবাই সমান ধনী হোক—কারো বেশি কারো কম টাকা যেন না হয়।

দোকানে পসারে যা কিছু সাজানো আছে দেখবে—বুঝবে কোনো না কোনো খদ্দের সেসব জিনিস চায়। এই চাওয়া মানে টাকা দিয়ে কিনতে চাওয়া। যাদের টাকা আছে তারা থাকবার ঘর চায়, চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল চায়, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্য স্কুল চায়। যেমন তাদের চাহিদা আছে তেমনি তাদের টাকাও আছে—দাম তারা দিতে পারে বলে বাড়িঘর, হাসপাতাল, স্কুল তৈরি হয়। গরীব মাবাবাও চায় তাদের ছেলেমেয়ে স্কুলে পড়ুক কিন্তু তাদের সেই চাহিদার পিছনে টাকার জোর না থাকায় স্কুল তৈরি হয়না। তারাও বাড়িঘর চায়, হাসপাতাল চায়—কিন্তু চাওয়ার অর্থমূল্য দেবার সংগতি তাদের নেই বলে বাড়িঘর হয়না, হাসপাতাল হয় না।

কোনো কোনো দেশে সরকার সমস্ত প্রয়োজন মেটানোর ভার নিজের হাতে তুলে নেন। সরকার ঠিক করেন কোন কোন মাল তৈরি হয়ে বাজারে যাবে এবং কাকে কত দামে বিক্রি করা হবে। অন্যান্য দেশে টাকার মাপে চাহিদামাফিক জিনিস পত্রের যোগান হয়। এইরকম দেশে বইয়ের চাইতে সিনেমার চাহিদা যদি বেশি হয়, তাহলে বইপড়া সিনেমা দেখার চেয়ে ভালো হলেও, সরকার নির্বিবাদে সিনেমা ঘর তৈরি করার অনুমতি দিয়ে দেন। আমরা এই দুই ধরনের ব্যবস্থা থেকে কিছুটা কিছুটা নিয়েছি—অর্থাৎ কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা চাহিদামাফিক জোগান দেবার পক্ষে আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরাই বলে দি কী কী তৈরি হবে এবং সেসব কার কাছে কত দামে বিক্রি করা হবে।

আপন ধারায় নদীকে বইতে দেওয়া যায়, আবার নদীকে বেঁধে, বাগে এনে, একটা পরিকল্পনা মাফিক খাতে প্রবাহিত করাও যায়। আবার যেসব অঞ্চলে বন্যার ভয় নেই সে অঞ্চলে নদীকে আপন খাতে চলার স্বাধীনতা দিয়ে, যে-যে অঞ্চলে নদী পাড় ভাঙে কিম্বা বন্যায় স্ফীত হয়ে খেতবসতি ভাসিয়ে নিয়ে যায়—সেসব জায়গায় বাঁধ দেওয়া চলে। আমরা এই শেষোক্ত ধারায় চলার পক্ষপাতী।

একেবারে নিজের মতে চললে যেসব ব্যবস্থা দেশের ক্ষতি বা অপকার করতে পারে, সরকার ইচ্ছা করেই সেই সব ব্যবস্থা নিজের হাতে তুলে নেন। ধানবাদ শহরের মতো একটি শহরের কথা ধরো। এই শহরের কয়লাখনির মজুরেরা যেসব ঘিঞ্জি বস্তিতে থাকে সেগুলি মানুষের বাসের অযোগ্য। ধানবাদের জনৈক বিত্তশালী ব্যক্তি হয়তো স্থির করলেন খনি মজুরদের জন্য বাড়ি না বানিয়ে যদি একটা সিনেমা হাউস বানানো যায়, মুনাফা হয় অনেক বেশি। সরকারের অনুমতি চাইলে পর সরকার যদি দেখেন একটা ছেড়ে অন্যটা বেছে নেওয়া সম্ভব, তাহলে সরকার হয়তো সিনেমা হাউস-এর প্রস্তাব নাকচ করে সেই লোকটিকে বলবেন টাকা যদি বিনিয়োগ করতে হয় তো মজুরদের জন্য বাড়ি বানাও, স্কুল বানাও, হাসপাতাল বানাও—সরকার ন্যায্য হারে ভাড়া নেবে। সেই লোকটিই যদি এমন একটি ইমারত বানায় যা নাকি ধানবাদের লোকেদের কাজে লাগে, যদি এমন কিছু উৎপাদন করে অথবা এমন জিনিস নিয়ে ব্যবসা করে যা শহরের যথার্থ প্রয়োজন মেটায়—সরকার কোনো রকম বাধা দিতে যান না। তখন বরঞ্চ সরকার নিজের টাকা থেকে এমন একটা কিছু করে দেন যা লোক সাধারণের দরকার, কিন্তু যার দরুন খরচ তারা জোগাতে পারেনা।

এই ধরনের কার্যপদ্ধতির একটা বিশেষ গুণ এই যে এই ব্যবস্থায় লোক সাধারণের হয়ে সরকার স্থির করতে পারেন তাদের পক্ষে কোন জিনিসটা জরুরী। তখন সেই জরুরী বিষয়টিকেই সরকার প্রাধান্য দিতে পারেন, অগ্রগণ্য বলে স্থির করতে পারেন। এসব ব্যাপারে সফল হতে গেলে অবশ্য জনসাধারণের দিক থেকে সরকারের সহযোগিতা করা দরকার, কারণ তারাই তো উপকৃত হবে।

যেসব ক্ষেত্রে লোকে ঠিক জিনিসটা চায় সেখানে সরকার কোনোরকম বাধার সৃষ্টি করেন না। লোক সাধারণ যেখানে এমন অসহায় যে তাদের প্রয়োজনীয় জিনিস তারা চাইতেও জানেনা, সেসব ক্ষেত্রে সরকারই ভারতের বিরাট গৃহপরিবারের কর্তারূপে তাদের হয়ে ঠিক জিনিসটুকু চেয়ে নেন। ভারতের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ধরন চলছে এই ধারায়।

১৩
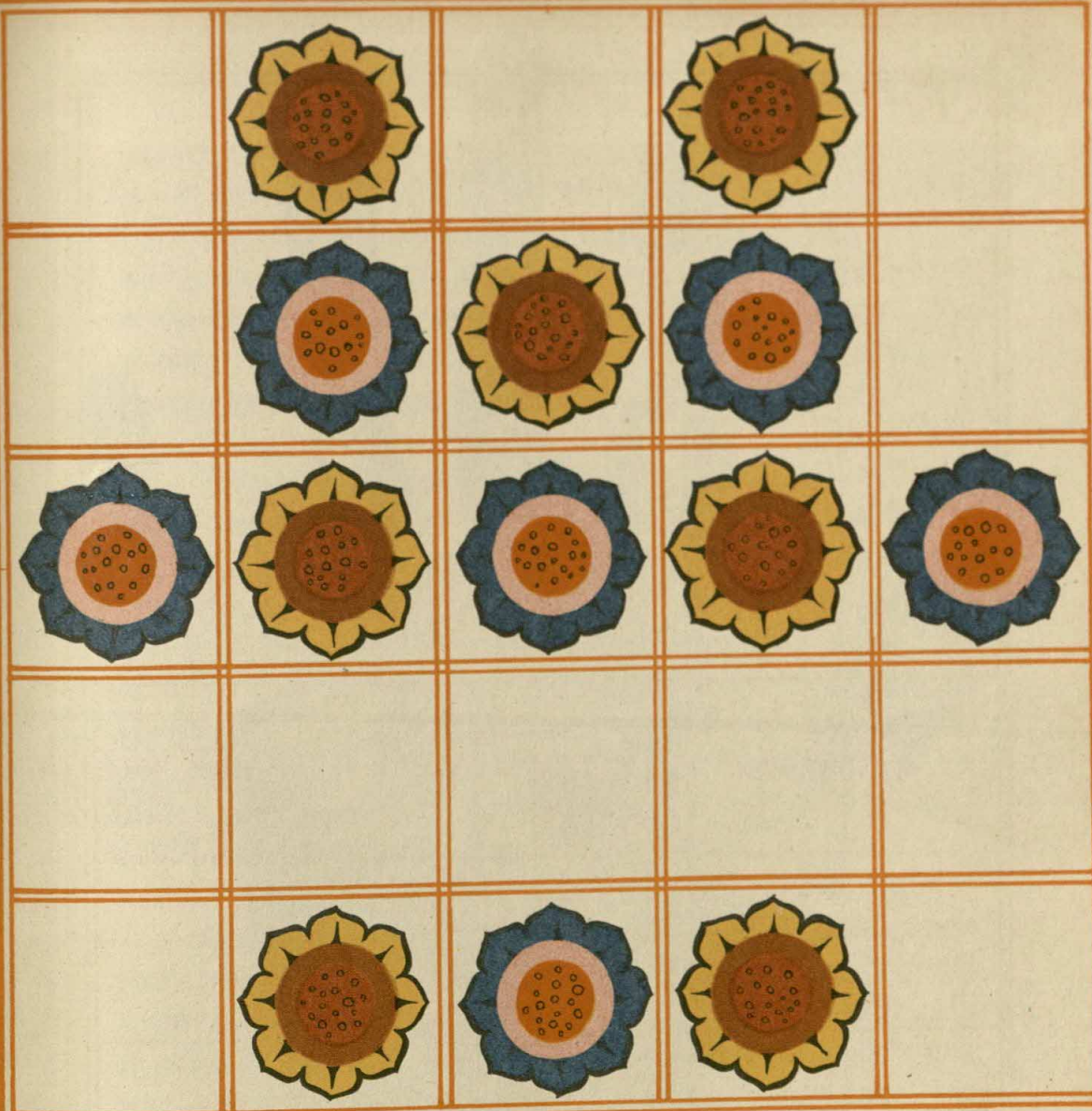
পাঁচ বছরের কার্যসূচি
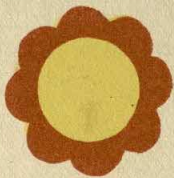
পণ্ডিত নেহরুর ডান হাতের ছাপ

পরীক্ষার পড়া তৈরি করতে গেলে তোমায় অনেক কিছু করতে হয়। বেশকিছু বই পড়তে হয়, পুরানো পাঠ ঝালিয়ে নিতে হয়, সূত্র সংজ্ঞা সব মুখস্থ করতে হয়। এ সমস্ত যদি

দুটো মাসের মধ্যে তোমার করতে হয় এবং তুমি যদি চাও যে কোনো বিষয় বাদ না পড়ে, তাহলে সবচেয়ে বুদ্ধিমানের মতো কাজ হবে একটা সময়সূচি তৈরি করে নেওয়া। সময়সূচি বলে দেবে কোন দিন কখন তোমার কী কাজ করা দরকার, কতটা সময়ে। সময় সূচিমাফিক চললে আসলে তুমি দু'মাসের কাজটা প্রত্যেকটি দিনের মধ্যে একটু একটু করে ভাগ করে দিচ্ছ, কারণ তা করলে নিজেকে তুমি একটা নিয়মের মধ্যে ফেলতে পারো। এত সব করার উদ্দেশ্যটা অবশ্য দু'মাস পরের পরীক্ষায় পাশ করা।

দীর্ঘকাল ধরে কোনো একটা দৈনিক সময়সূচি অনুসারে যদি চলতে থাকো, দেখবে বছরের শেষে পাঠ্যবিষয়ে তোমার আগে যে জ্ঞান ছিল তা অনেকখানি বেড়ে গেছে। মনে পড়ে একটা সময় ছিল যখন সাধারণ যোগ ছাড়া আর কোনো অঙ্ক তুমি করতে পারতে না? আর এখন তো তুমি অঙ্কের জটিল সব প্রশ্ন সমাধান করে দিতে পারো—এমন কি বীজগণিত এবং জ্যামিতির মত নতুন বিষয়ও শিখতে শুরু করেছ। একেবারে ছেলেবেলায় যে কেবল দুয়ে দুয়ে চার হবার অঙ্ক জানত, আজ সে কেমন করে সমীকরণের মতো শক্ত জিনিস করতে পারছে? স্কুলে, বাড়িতে রুটিন মাফিক চলেছ বলেই এতখানি এগোতে পেরেছ। সময়সূচি অনুসরণ করে দিনে দিনে বছরে বছরে একটু একটু করে তুমি অনেক কিছু শিখে নিয়েছ।

ভারতের পাঁচসালা পরিকল্পনার বিষয়ে এখানে ওখানে এত যে তুমি শুনতে পাও, তাও কিন্তু একপ্রকার দৈনিক সময়সূচি—কোনো পরীক্ষার্থী ছাত্রের নয়, সমস্ত দেশের। তুমি বলবে পাঁচসালের হিসাবে সময়সূচি তৈরি হয় কেন? দশ, বিশ, ত্রিশ—এমনকি একশো বছরের হিসাবেও তো পরিকল্পনা প্রস্তুত হতে পারত। তার কারণটা হল এই যে দেশে আমাদের এখন যেমন পরিস্থিতি, তাতে পাঁচটা বছর খুব অল্প সময়ও নয় আবার খুব দীর্ঘ সময়ও নয়। তোমার মতো পড়ুয়া কোনো ছেলের জীবনে একটা দিন যেমন ভারতের পক্ষে পাঁচটা বছরও তেমন। এক মাসের সময়সূচি তৈরি করার চেয়ে একটা দিনের সময়সূচি তৈরি করা তো অনেক সহজ। তেমনি ভারতের পক্ষে একশো বছরের মতো পরিকল্পনা তৈরি করার চেয়ে দফায় দফায় পাঁচসালা পরিকল্পনা তৈরি করা অনেক সহজ।

পাঁচসালা পরিকল্পনাকে যদি তোমার দৈনিক সময়সূচির সঙ্গে তুলনা করা যায় তাহলে বলব দৈনিক সময়সূচি পালন করে তুমি কতটা যে এগোলে তার যেমন বিচার হয় বাৎসরিক পরীক্ষায়, তেমনি পাঁচসালা পরিকল্পনা কতটা সফল হল তারও একটা বিচার হয়। সে পরীক্ষার প্রশ্ন একটিই: পাঁচসালা পরিকল্পনা পালন করে দেশের লোক সাধারণের জীবনের মান কি উন্নত করা হয়েছে? এক একটা পাঁচসালা শেষ হয় আর আমরা দেখি আমাদের চরম লক্ষ্যের দিকে এক ধাপ এগিয়েছি কি না। আরো একটা ব্যাপারে তোমার দৈনন্দিন সময়সূচির সঙ্গে দেশের পাঁচসালা পরিকল্পনার একটা মিল আছে। প্রথম প্রথম দিনের যে সময়ে তুমি ভূগোল পড়বে ঠিক করেছিলে, পরে দেখলে সে সময় অঙ্ক শেখাই সুবিধা। গোড়ায় হয়তো ভেবেছিলে বিজ্ঞানে কম সময় দিলেও ইতিহাসে বেশি সময় দিতে হবে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে হল তার ঠিক উল্টো। যে বিষয় বেশি শক্ত হবে বলে ভেবেছিলে, পড়তে বসে হয়তো সেটাই বেশ সহজ মনে হল। রুটিন মাফিক চলতে গিয়ে তুমি দেখলে এখানে ওখানে রুটিনের অদলবদল করা দরকার—পরীক্ষায় পাশ করারই খাতিরে। রুটিন একটা ছক মাত্র, আসল লক্ষ্যটা পরীক্ষায় পাশ, কাজে কাজেই তোমার তৈরি ছক তোমার নিজের সুবিধা মাফিক এবং প্রয়োজন মাফিক যদি পরিবর্তন করে নাও, কেউ তোমায় মন্দ বলতে পারবেনা।

ভারতের পাঁচসালা পরিকল্পনাগুলিও ঠিক তেমনি—সময়সূচির ছক মাত্র। আমাদের সুবিধা হবে বলেই তো সময়সূচি তৈরি করা। তাকে যদি আমরা লোহার খাঁচা বানিয়ে তার মধ্যে ঢুকে পড়ি—সে তো বুদ্ধিমানের কাজ হবেনা। পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত বহু কাজই তোমাদের নতুন কোনো পাঠ্য বিষয়ের মতো। কিছুকাল তা নিয়ে নাড়াচাড়া না করা পর্যন্ত বলা মুশকিল কাজগুলি সহজ হবে না কঠিন হবে। পরের পাঁচসালা পর্বে অবশ্য সেটা খানিকটা বুঝতে পারা যাবে। কিন্তু সেই নতুন পর্বেও তো নতুন বিষয় আমদানি হতে পারে যার বিষয় এখন আমাদের বিশেষ কিছু জানা নেই। সুতরাং পরীক্ষা-নিরীক্ষা আমাদের চালিয়ে যেতেই হয়। এ যেন নতুন একটা জামা তৈরি করে সেটাকে গায়ের মাপমাফিক করার জন্য আবার কাটছাঁট করা। ভারতীয় পরিকল্পনায় এই ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে বিশেষ স্থান দেওয়া হয়েছে।

লোকেরা কাজ করে যেমন রোজগার করে, দেশও তেমনি রোজগার করে। একে বলা যায় জাতীয় উপার্জন। খেতখামারে, কলকারখানায় এবং অন্যত্র কাজ করার ফলে দেশের যে মোট আয় হয় সেটাই জাতীয় উপার্জন। এই উপার্জন দেশের সমস্ত লোককে সমানভাবে ভাগ করে নিতে হয়। তাদের প্রত্যেকে যদি অতিরিক্ত কিছু চায় তাহলে জাতীয় উপার্জন বাড়িয়ে আবার নতুন করে সমানভাবে তার বিলিব্যবস্থা করা দরকার হয়ে পড়ে। কিন্তু গত পঁচিশ বছর ধরে একটা যে ব্যাপার ঘটে চলেছে তাহল এই : জাতীয় উপার্জন
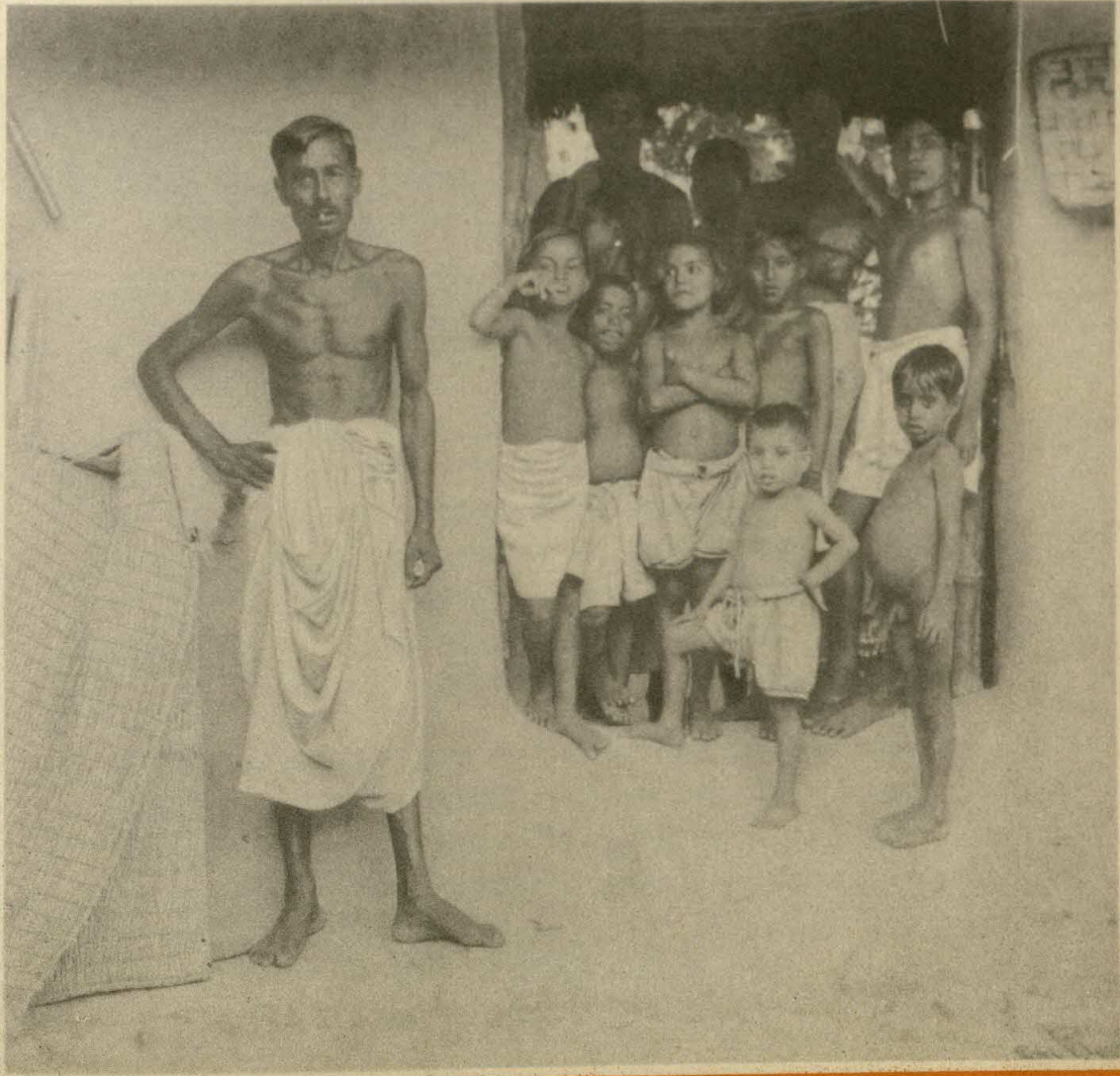
যেই একটু বাড়ল, দেখা গেল দ্রুতগতিতে ভারতের লোক সংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছে। ফলে প্রত্যেকের ভাগে যা পড়ছে তার বিশেষ কোনো ইতর বিশেষ হচ্ছেনা।

ধরো একটা কলা তোমাদের চারজনের মধ্যে ভাগ করে দিতে হল। তাহলে প্রত্যেকের ভাগে পড়ল এক-চতুর্থ ভাগ কলা অর্থাৎ কলার যৎসামান্য একটা অংশ। সুতরাং তোমরা বেশ কষ্ট করে হয়তো আরো একটি কলা জোগাড় করলে। ইতিমধ্যে আরো চারজন এসে তোমাদের দল যদি ভারি করে, তাহলে তোমাদের প্রত্যেকের ভাগে সেই চতুর্থাংশটুকুই পড়ে। তাহলে দেখা যাচ্ছে দুটো কলাতেই যথেষ্ট হলনা—যদিচ আয়ের দিক থেকে হল আগেকার তুলনায় দ্বিগুণ। আটের জায়গায় ভাগীদারের সংখ্যা যদি দশ হত, তাহলে প্রত্যেকে তো চতুর্থাংশের চেয়েও কম পেত। ভারতের জাতীয় উপার্জনের বেলা কতকটা এইরকম ঘটেছে। কাজের মতো কাজ হত যদি ভাগীদারের সংখ্যা কম হত এবং সেই তুলনায় কলার সংখ্যা বেশি হত।

প্রত্যেক ভারতীয়ের সম্পদের সঙ্গে আমি একটি কলার হিস্যার প্রসঙ্গ তুলেছি। সে তার নিজের ভাগটুকু খেয়ে ফেলার পর তার কি কলার খিদে মেটে, না আগে যেমন তার অবস্থা ছিল তেমনি থেকে যায়? সে বেচারা তো চেয়েছিল তার কলার খিদে না মেটা পর্যন্ত সে যেন কলা খেয়ে যেতে পারে। তা যদি পারত তাহলে একটা কিছু লাভ হল বলতে পারত। কখন সে তা বলতে পারবে? যখন দেশে কলার ফলন বাড়তেই থাকবে। তেমন ব্যবস্থা করতে হলে তো অনেক টাকা খরচ করতে হয়। এতো টাকা ঢালতে হবে যে তাতে কলার খরচ পর্যন্ত পোষাবেনা। টাকাটা আসবে সেই জাতীয় তহবিলের সঞ্চয় থেকে। সব টাকাটা যদি আমরা পেটপুরে কলা খাওয়ার আনন্দে খরচ করে ফেলি, তাহলে আর কোনো দিকে তো জীবিকার মান উন্নত করা যাবেনা।

সুতরাং পরিকল্পনা রচনা করতে গিয়ে আমাদের তিনটি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হয় : এক। উৎপাদনের হার আমাদের বাড়িয়ে যেতে হবে; দুই। খরচটা কমিয়ে জমার দিক বাড়াবার জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে; এবং তিন। ভারতের জনসংখ্যা আগের মতো দ্রুত হারে যেন বৃদ্ধি না পায় সেদিকে নজর দিতে হবে।

১৪
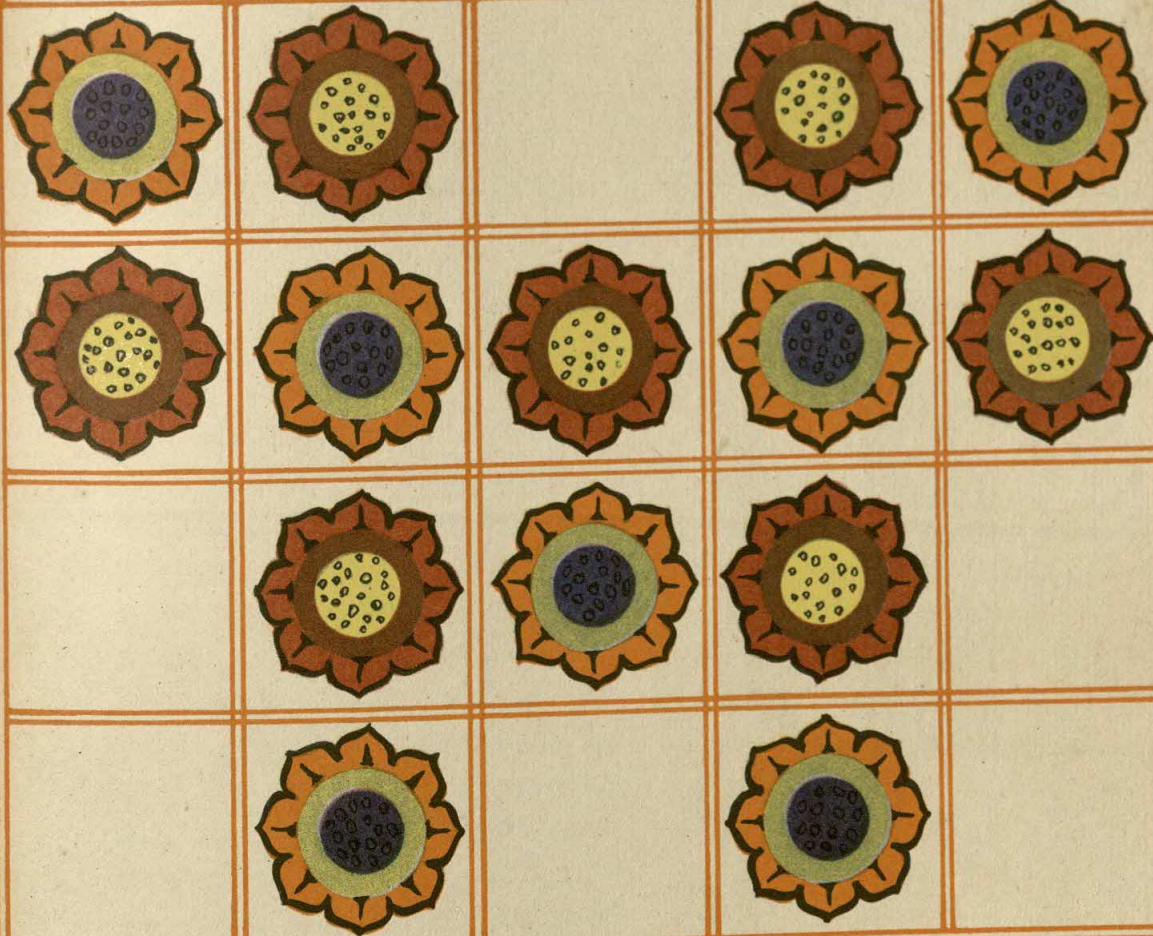
জমি ভাঙ্গিয়ে খাওয়া
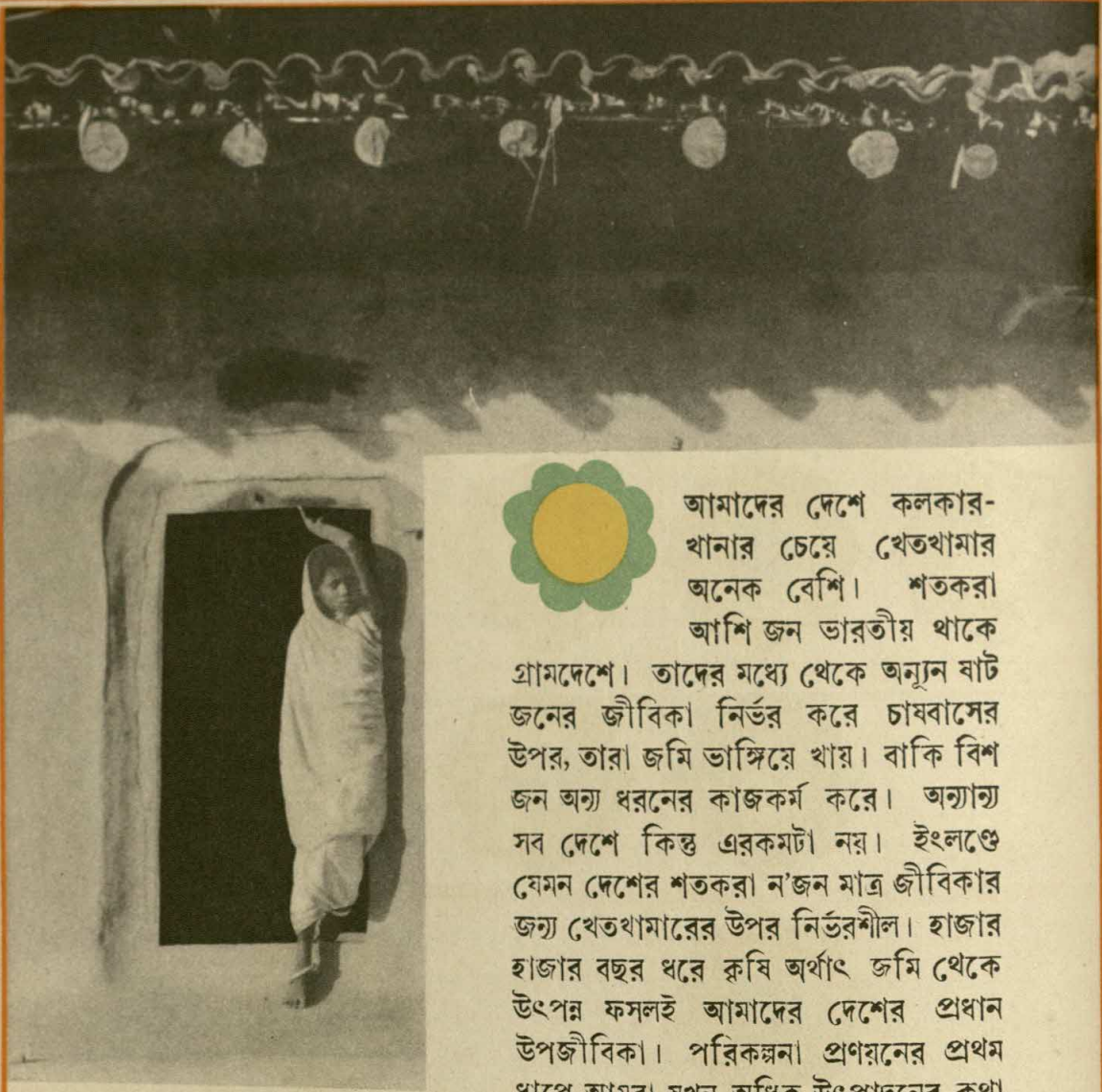
আমাদের দেশে কলকারখানার চেয়ে খেতখামার অনেক বেশি। শতকরা আশি জন ভারতীয় থাকে গ্রামদেশে। তাদের মধ্যে থেকে অন্যূন ষাট জনের জীবিকা নির্ভর করে চাষবাসের উপর, তারা জমি ভাঙ্গিয়ে খায়। বাকি বিশ জন অন্য ধরনের কাজকর্ম করে। অন্যান্য সব দেশে কিন্তু এরকমটা নয়। ইংলণ্ডে যেমন দেশের শতকরা ন'জন মাত্র জীবিকার জন্য খেতখামারের উপর নির্ভরশীল। হাজার হাজার বছর ধরে কৃষি অর্থাৎ জমি থেকে উৎপন্ন ফসলই আমাদের দেশের প্রধান উপজীবিকা। পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রথম ধাপে আমরা যখন অধিক উৎপাদনের কথা বলেছিলাম তার অর্থ ছিল অন্য কিছু উৎপাদন নয়—অধিক ফসল ফলানো। তাই প্রথম পঞ্চমবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য যে টাকা আমরা বরাদ্দ করেছিলাম তার মোটা ভাগটা গিয়েছিল কৃষির উন্নতির জন্য। একর প্রতি ফলন বৃদ্ধি পাবে, চাষী অধিক ফসল ফলাবে—এই ছিল আমাদের আশা।

১৯৪৭ সালে ভারত যখন স্বাধীন হল তখন এ দেশের লোকসংখ্যা ছিল
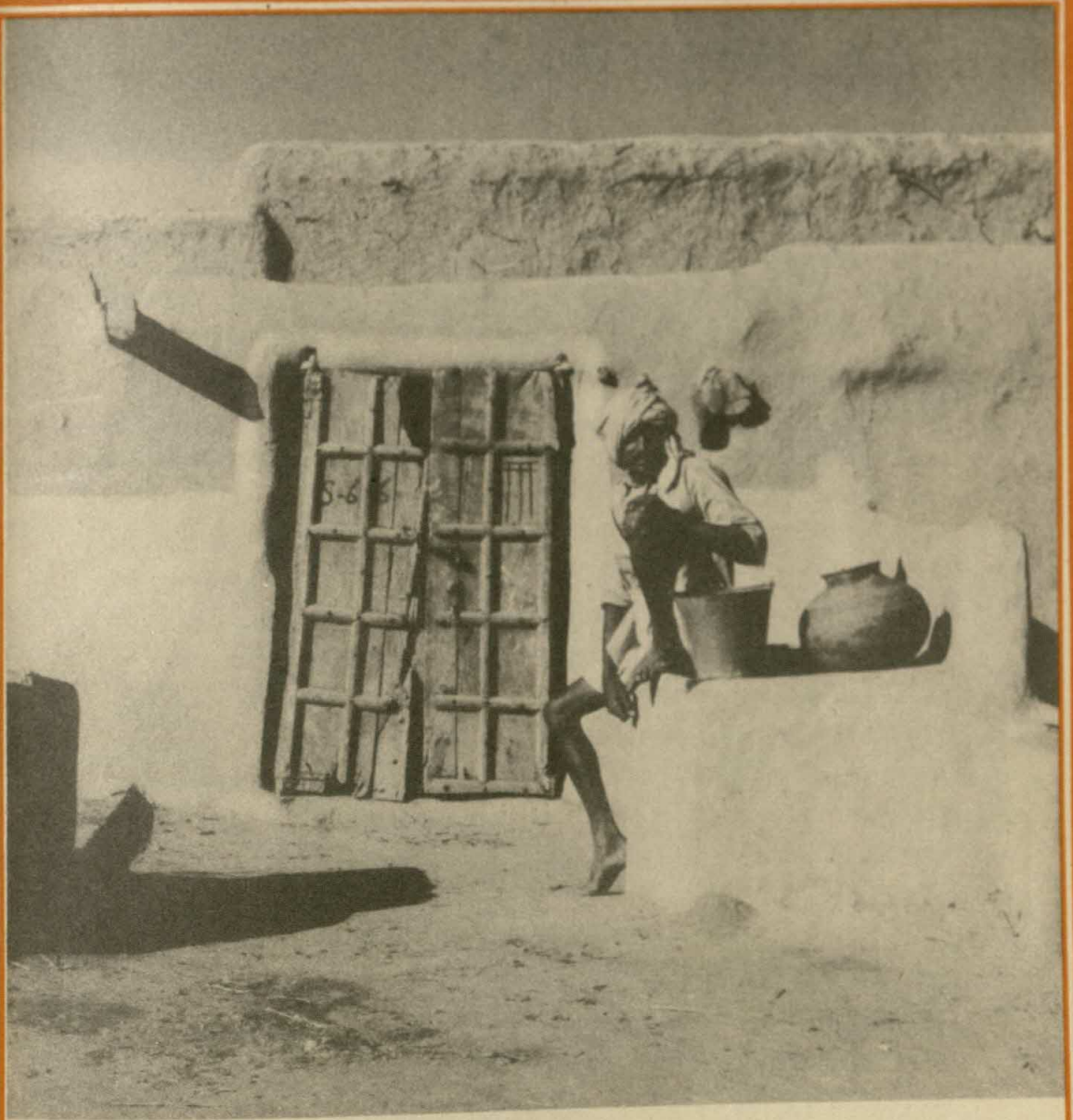
পঁয়ত্রিশ কোটি। আজ আরো বেড়ে হয়েছে সাতান্ন কোটি। পঁচিশ বছরে দেশের জনসংখ্যায় যোগ হয়েছে বাইশ কোটি লোক। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মতো বড় বড় দেশের লোকসংখ্যা হবে প্রায় বাইশ কোটি। হিসাব করলে দেখা যায় গড়ে প্রতি বছর বৃদ্ধি পেয়েছে নব্বুই লক্ষ করে। সারা সুইডেনের

লোকসংখ্যা নব্বুই লক্ষের কম। তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে দেখছ তো ? প্রতি বছর একটি সুইডেনের মতো দেশ আমাদের পুষতে হচ্ছে। অথচ লোকসংখ্যা কমবে এমন কোনো লক্ষণ নেই—বেড়ে চলেছে তো চলেছেই। তার অর্থ এই খাওয়া পরার লোক ক্রমাগত বেড়ে চলেছে, কিন্তু যে জমির ফসলের উপর আমাদের নির্ভর, সে জমি একটুও বাড়েনি। সুতরাং বেঁচে থাকতে হলে জমি থেকে অনেক বেশি খাদ্য আমাদের আদায় করে নিতে হবে। সেই জন্যই প্রথম পরিকল্পনায় কৃষির উন্নতি বিধানকে এমন প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল।

কৃষির জন্য সবচেয়ে বেশি দরকার জল—সে জল পরিমাণ মাফিক ও সময় মাফিক পাওয়া দরকার। সেই জন্যই আমাদের দেশের কৃষক চাতক পাখির মতো আকাশের দিকে চেয়ে থাকে—বৃষ্টির জল ছাড়া তার গতি ছিলনা। বর্ষায় যথেষ্ট বৃষ্টি যদি না হয় বৃষ্টি যদি যথাসময়ে না পড়ে তাহলে তার পরিশ্রম বৃথা যায়। কেবল তাই নয় তাহলে দেশময় দুর্ভিক্ষ লাগে—কেবল চাষী নয় আরো অনেককে অর্ধাহারে অনাহারে কাটাতে হয়। আবার যদি অতি বর্ষণ হয় তাহলে বন্যা সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায়—যায় খেতের ফসলও। বাড়িঘর গোরু ছাগল এবং তার নিজের বলতে যা কিছু—সমস্ত বন্যা এসে গ্রাস করে। আবার অনেক জমি নদী থেকে দূরে আছে বলে সেচের জল পায়না, অনাবৃষ্টি হলে সেসব জমি পতিত হয়ে পড়ে থাকে। এইভাবে প্রকৃতির খাম খেয়ালীর উপর নির্ভর করে থাকলে কৃষির উন্নতি কিছুতেই হতে পারেনা।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক যোজনার তাই লক্ষ্য ছিল কীভাবে নদীতে বাঁধ দিয়ে জল ধরে রাখা যায় এবং খরার সময় সেই জল সেচের কাজে লাগানো যায়। এইজন্যই প্রথম যোজনার প্রধান কাজ হয়েছিল নদীতে বাঁধ দেওয়া। প্রত্যেকটি কাজে একশো থেকে দুশো কোটি করে টাকা খরচ করতে হয়েছে এগুলির জন্য। অপেক্ষাকৃত কম খরচে কূপ ও পুকুর খুঁড়েও আমরা জমিতে সেচের ব্যবস্থা করেছি। কিন্তু সেগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকল্প—এরফলে মুষ্টিমেয় কিছু চাষী লাভবান হয়েছে সত্য, কিন্তু দেশের সমগ্র সমস্যার সমাধান হয়নি।
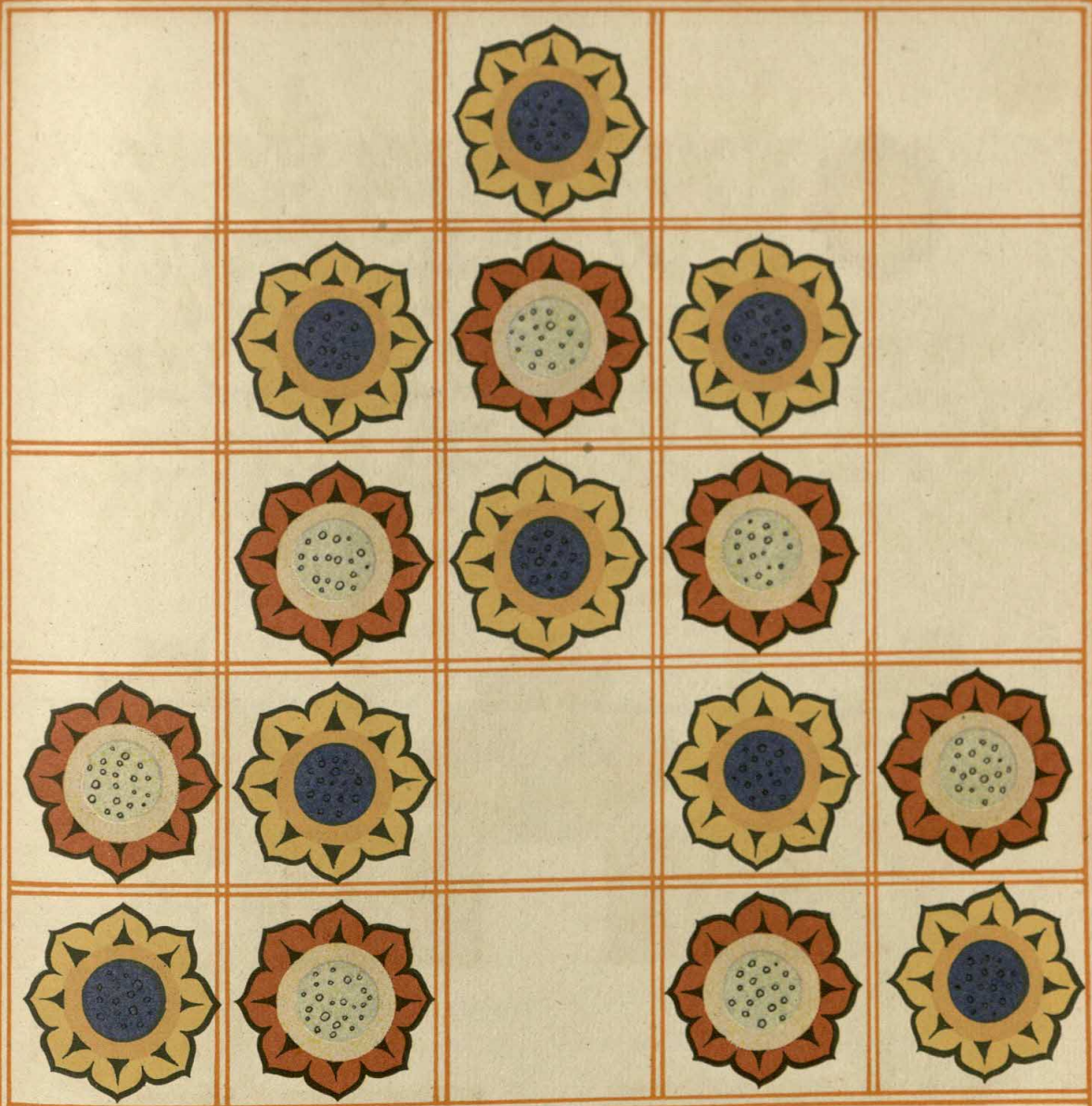
১৫

চাষের কাজে হাজারো ধান্দা
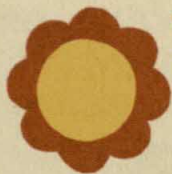
বেশি ফসল পেতে হলে কেবল যে জলের দরকার এমন নয়। কী কী দরকার হয় তার একটা ফিরিস্তি যদি দিই আশ্চর্য হয়ে যাবে। জমির উর্বরতা বাড়াবার জন্য সার দিতে হয়, যেসব পোকা ফসল খেয়ে নষ্ট করে তাদের ধ্বংস করার জন্য কীটনাশক গুঁড়ো বা তেল তৈরি করতে হয়—এবং আরো কত কি। যারা কৃষি বিজ্ঞান জানে তারাই রাসায়নিক পদ্ধতিতে এসব তৈরি করতে পারে। এইসব বিজ্ঞানীদের শিক্ষা দীক্ষার জন্য কলেজ দরকার, হাতে কলমে শিক্ষা দেবার জন্য ল্যাবরেটরি দরকার। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানে কারা শিক্ষা পাবার উপযুক্ত—সেটাও দেখতে হবে। যারা বিজ্ঞানে প্রাথমিক শিক্ষা পায়নি
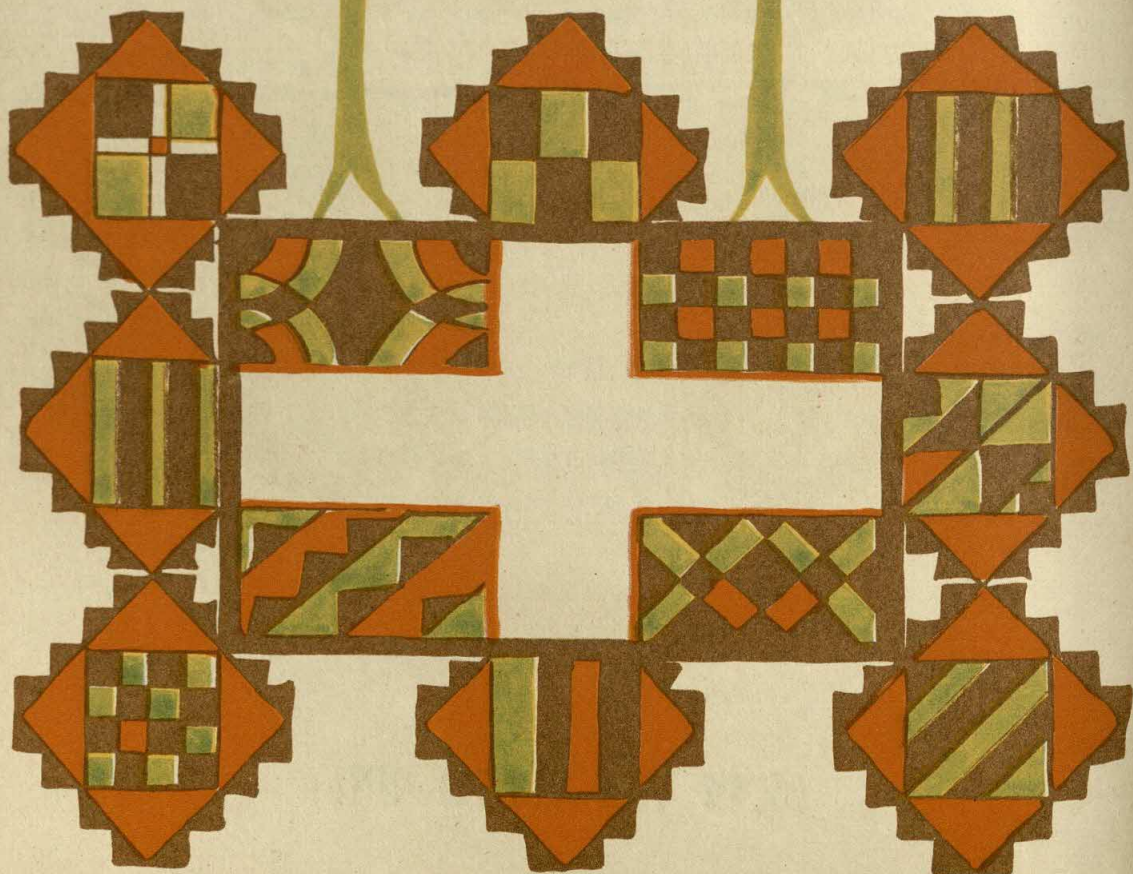
তাদেরকে দিয়ে তো চলবেনা, কারণ রাসায়নিক সার কিংবা কীটনাশক তৈরি করতে হলে রসায়ন না জানলে কিছু হতে পারেনা। তা হলেই দেখতে পাচ্ছ অধিক ফসল ফলানো যদি আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হয় তা হলেও শিক্ষার ব্যবস্থা আরো অনেক গুণে বাড়াতে হবে।

খেতে সেচের জল পৌছে দেওয়াটাও সহজ কথা নয়। বাঁধের নকশা তৈরি করবে কে, কে স্থির করবে কোন পথে খাল কেটে জল নিয়ে যেতে হবে, কোথায় কীভাবে কূপ খনন করতে হবে? এসব ব্যাপার জানে কেবল ইঞ্জিনীয়ররা। তাহলেই দেখছো আবার স্কুল কলেজের প্রসঙ্গ এসে পড়ছে।

জমি, বীজ ও ফসল সম্বন্ধেও আমাদের অনেক কিছু জানতে হয়, যদি অধিক ফসল ফলানো আমাদের লক্ষ্য হয়। এসব জ্ঞানও আসে কলেজ, ল্যাবরেটরি ও হাতেকলমে পরীক্ষা নিরীক্ষা থেকে। এ কাজে দক্ষ হতে হলে পড়তে হবে, জানতে হবে, অনুশীলন করতে হবে।

বাঁধ ও কূপ বানানোর জন্য ইট সিমেণ্ট যা আসে, জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য যে সার দরকার—এ সবই আসে কলকারখানা থেকে। তাহলেই দেখছ চাষীকে তার প্রাথমিক প্রয়োজনের জিনিসগুলি দিতে হলেও স্কুল কলেজ কল কারখানা না হলে চলে না।

আরো অনেক কিছু প্রয়োজন। গভীর কূপ থেকে কীভাবে জল জমিতে তোলা হবে? দড়ি বালতির সাহায্যে কিম্বা জলের চাকা ঘুরিয়ে যতটুকু জল পাওয়া যায়, সেচের পক্ষে তা যথেষ্ট না হতে পারে। তাতে যে সময় ও পরিশ্রম ব্যয় করতে হয় তার তুলনায় জল পাওয়া যায় যৎসামান্য। কিন্তু যদি ইলেকট্রিক মোটর বসিয়ে জল পাম্প করে তোলা যায়, তাহলে বেশ কাজ দেয়। সে জন্য দরকার বিদ্যুৎশক্তি—সেটাও কম জটিল ব্যাপার নয়। তারজন্য দরকার বিরাট বিরাট ঘূর্ণযন্ত্র অথবা টারবিন, বিদ্যুৎবাহী তার এবং আরো অনেক সরঞ্জাম। এসব সরঞ্জামও তৈরি করতে হয় কলকারখানায়, ইঞ্জিনীয়রের তত্ত্বাবধানে। ট্রাক্টর, কৃষির জন্য উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি — কল কারখানা ছাড়া অন্য কোথাও প্রস্তুত করা সম্ভব নয়।

ভালো একটা লাঙলের ফলা তৈরি করার জন্যও ইস্পাত লাগে। লোহা এবং কয়লা না থাকলে ইস্পাত তৈরি করা যায়না। আকর লোহা ও কয়লা আসে খনি থেকে। সুতরাং বেশি পরিমাণে এগুলি পেতে হলে খনির কাজেও উন্নতি করা দরকার—এ উন্নতিও নির্ভর করে বিদ্যুৎশক্তির উপর। তা হলেই দেখছ কেবল কৃষির উন্নতি সাধন করতে গেলে কত কী করতে হয়। বাস্তবপক্ষে আমাদের এই বিরাট দেশে উন্নতি বিধানের ব্যবস্থাগুলি এমনভাবে পরস্পরবদ্ধ যে কথাটা একটু অদ্ভুত শোনালেও বলা যায় : উন্নতি করতে গেলে উন্নত হতে হবে।

ব্যাপারটা আরেকটু তলিয়ে দেখা যাক। জমিতে কাজ করে যেসব চাষী তাদের কেউ স্কুল কলেজে শিক্ষার সুযোগ পায়নি—বেশির ভাগ লোকই নিরক্ষর। বেশি ফলনের বীজ, রাসায়নিক সার, উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি কিংবা নতুন কোনো চাষের পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার কথা কীভাবে নিরক্ষর চাষীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়? গ্রামসেবকেরা হয়তো বাড়ি বাড়ি গিয়ে সবাইকে সব কথা বুঝিয়ে বলতে পারেন। যদি রেডিয়ো যোগে এসব কথা বলা যায় তাহলে কাজটা অনেক সহজ হয়না কি? কিন্তু রেডিয়ো অথবা ট্র্যানজিস্টার বানাতে গেলেও এমন কুশলী লোক দরকার যে বিদ্যুৎ পরমাণুকে কীভাবে কাজে লাগাতে হয় ভালো করে জানে। উপরন্তু রেডিয়ো ও ট্র্যানজিস্টার-এর অন্যসব ভাগ বানাতে গেলে কলকারখানা বসাতে হয়। সবার শেষে প্রয়োজন হবে এমন সব লোকের যারা রেডিয়ো যোগে প্রচারকার্য সুদক্ষভাবে চালাতে পারে।

শরীর স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকলে লোকে যতখানি কাজ করতে পারে, অসুস্থ কিংবা পরিশ্রান্ত অবস্থায় ততখানি করতে পারেনা। কাজ করে সে সুখও পায়না। দশজন সুস্থ সবল লোক যতটা কাজ করতে পারে পঞ্চাশজন অসুস্থ মানুষ ততটা পারেনা। সুতরাং দুটি বিশেষ কারণে দেশের লোকের শরীর স্বাস্থ্যের উন্নতি দেশের পক্ষে বিশেষ কাম্য : প্রথম। শরীর স্বাস্থ্যের উন্নতি এমনিতেই কাম্য কারণ অসুস্থ শরীর অসুখী মনের বাসা, দ্বিতীয়। অনেক পরিশ্রমসাধ্য কাজ সুস্থ সবল কর্মীর জন্য অপেক্ষা করে আছে।

ধরাই যাক যে কৃষক পূর্বের তুলনায় অধিক ফসল ফলাতে পারল। তার পরেই উৎপন্ন ফসল বাজারে বিক্রয়ের প্রশ্ন আসে। শহরেই চাহিদা বেশি, সুতরাং গ্রাম থেকে শহরে ফসল পৌঁছে দেবার জন্য রাস্তাঘাট থাকা উচিত। দূরপাল্লার রাস্তা যদি না হয় তাহলে ট্রাক-এ করে নিয়ে যাওয়া যায়, আর গ্রাম থেকে শহর যদি দূর হয় তাহলে রেলযোগে নেবার সুবিধা থাকা দরকার। এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে পথ হবে দ্বিমুখী—এক রাস্তায় নতুন প্রযুক্তিবিদ্যা, উন্নত বীজ, সার ও যন্ত্রপাতি আসবে গ্রাম অভিমুখে, অন্য রাস্তায় গ্রাম থেকে গ্রামের প্রয়োজনাতিরিক্ত ফসল যাবে এমন সব জায়গায় যেখানে এই ফসলের চাহিদা আছে। তা না হলে পাকা ফসল জমিতে পড়ে থেকে নষ্ট হবে। রাস্তা ও রেলপথের সুবিধা যদি না থাকে তাহলে জমির ফসল বাড়িয়ে কোনো লাভ হবেনা।

যে কৃষক নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ফসল ফলাতে পারে সে পূর্বাপেক্ষা ধনী হয় কারণ সে বাজারে বাড়তি ফসল বিক্রয় করতে পারে। ফলন যত বেশি হবে ততই তার রোজগার বাড়ে। যদি অতিরিক্ত উপার্জন করে নিজের অবস্থার উন্নতি না করতে পারে, তাহলে বেশি টাকায় তার কী লাভ? স্বাধীনতা লাভের পর সাধারণ মানুষের জীবনের মান উন্নত হয় ভারত তো সেই লক্ষ্য ধরে এগোতে চায়—তাই হল তার প্রধান উদ্দেশ্য। বাড়তি টাকা দিয়ে কৃষক অনেক জিনিস কিনতে চায়—কাপড়চোপড়, জুতো, ব্যাটারি টর্চ, ট্র্যানজিস্টার, রেডিয়ো, সাইকেল, লণ্ঠন, আসবাবপত্র, খেলনা, ওষুধবিসুধ, মেঠাই, চা, বালতি এবং আরো কত কি জিনিস—যা না কি তার জীবনে সুখ ও আনন্দ এনে দিতে পারে। এইসব সুখ সুবিধার জিনিসের চাহিদা বাড়বে বাড়তি রোজগারের সঙ্গে সঙ্গে—তখন এসব সামগ্রী উৎপাদনের দিকে দেশকে নজর দিতে হবে। তার জন্য নতুন শিল্পসংস্থা গড়ে তুলতে হবে। শিল্পসংস্থা গড়তে হলে যন্ত্রপাতি দরকার—কারখানা ও কাঁচামালও দরকার। এ টাকা আসতে হবে প্রয়োজন মেটাবার পর যে টাকা উদ্বৃত্ত থাকে সেই সঞ্চয় তহবিল থেকে। তাহলে দেখা যাচ্ছে আয়ের সবটুকু ব্যয় করা উচিত নয়—কিছু টাকা জমানোও দরকার।

এবার দেখলে তো কৃষির উন্নতির মতো একটা সহজ ব্যাপার সম্পন্ন করতে গিয়ে কত কী করা দরকার—সবই যেন পরস্পর শৃঙ্খলাবদ্ধ – বিদ্যুৎশক্তি, যন্ত্রপাতি, লোহা, ইস্পাত, কয়লা, স্কুল, কলেজ, ল্যাবরেটরি, হাসপাতাল, রাস্তাঘাট, রেলপথ, কল কারখানা এবং আরো কত কি।

এসব কথা পড়ে তোমার হয়তো মনে পড়বে যে এভাবেই তো মানুষের শরীরটাও গড়ে ওঠে। যদি চাও তোমার পা দুটো লম্বা হয়, তাহলে অন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গকেও সেই সঙ্গে বেড়ে ওঠা দরকার। সারা শরীরটার বাড় যদি বাড়ে তাহলে প্রত্যেকটি অংশও বাড়তে বাধ্য। ভারতের বেলা এই স্বাভাবিক বৃদ্ধিটুকু বহুকাল ধরে থেমে গিয়েছিল, সেই জন্যই দরকার কোনো একটা ক্ষেত্রে বেড়ে ওঠার জন্য বিশেষ চেষ্টার।

১৬

ব্যূহ রচনা
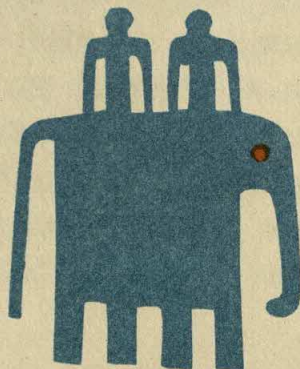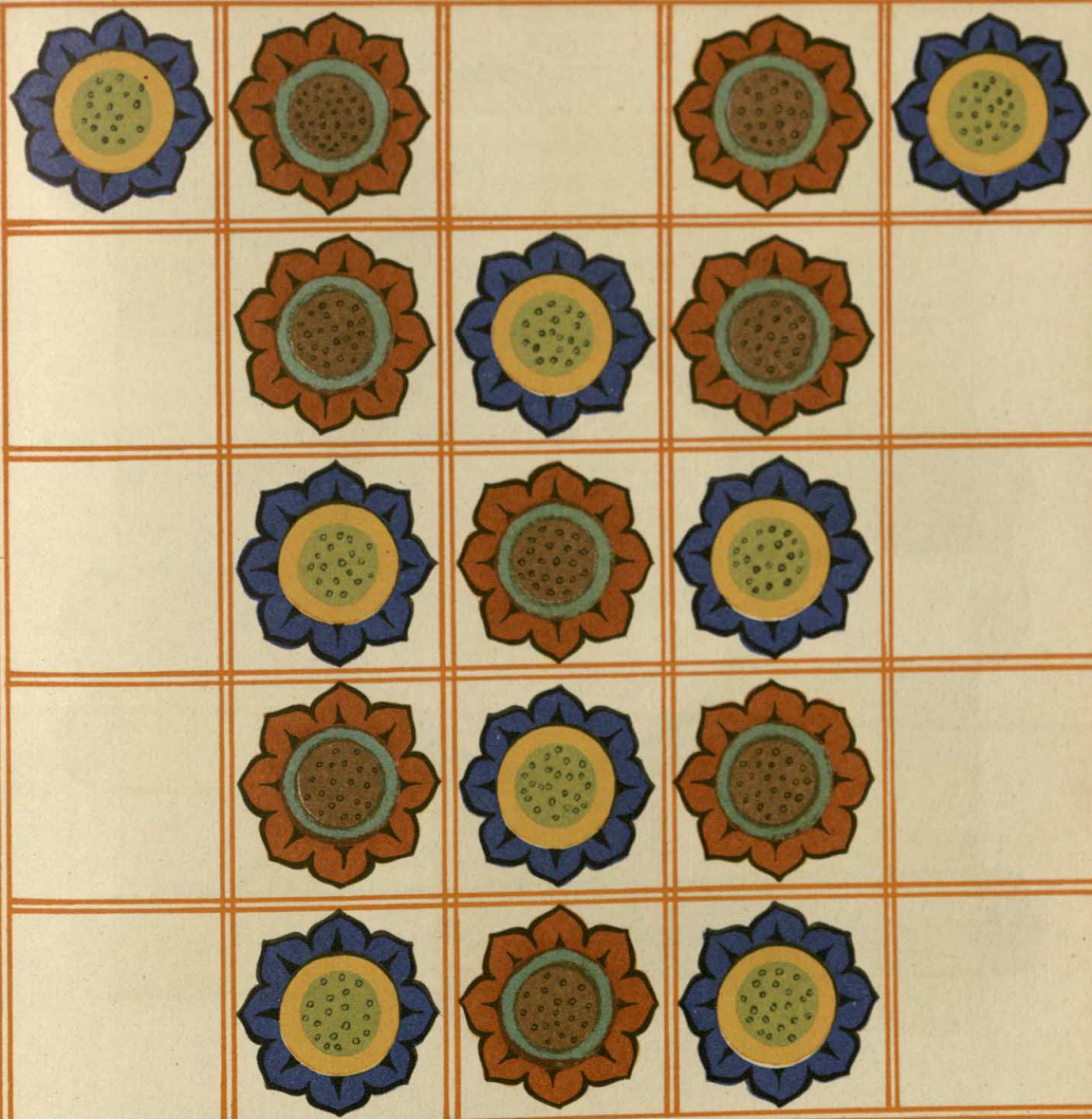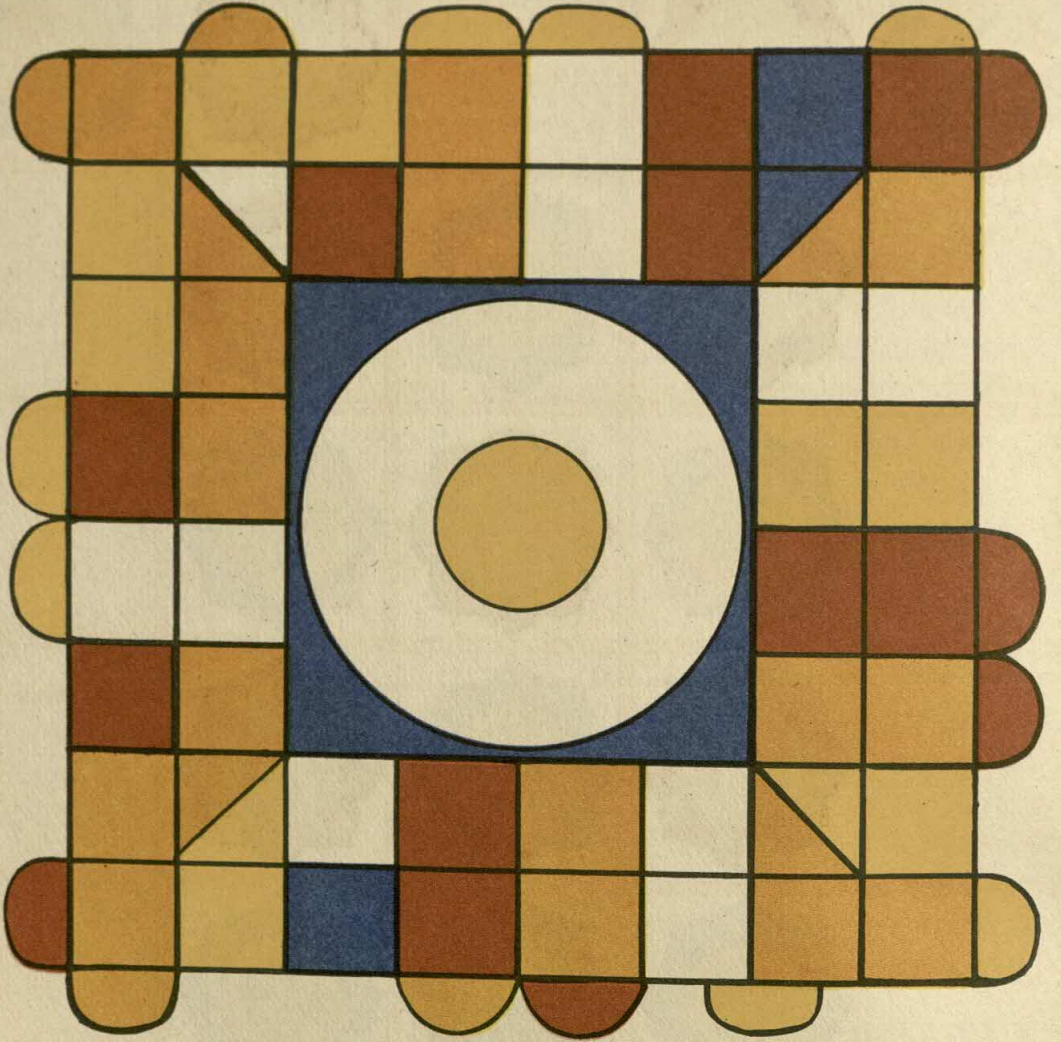
এবার তো বুঝলে বাঁধ, বিদ্যুৎশক্তি, কলকারখানা, খনি, যানবাহন; স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সঙ্গে কৃষির উন্নতির কত নিকট সম্বন্ধ। কিন্তু এসব ব্যয় নির্বাহের জন্য হাতে আমাদের যথেষ্ট টাকা ছিলনা, সুতরাং সব কিছুতে একই সঙ্গে হাত দেওয়া সম্ভবপর হয়নি। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী যোজনার জন্য আমরা বরাদ্দ করেছিলাম তেইশ শো আটাত্তর কোটি টাকা। দেখে মনে হয় যেন প্রচুর টাকা, কিন্তু

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের একমাত্র নিউ ইয়র্ক ষ্টেট-এ এর চেয়ে বেশি টাকা খরচ হয়—যদিচ সে জায়গার লোকসংখ্যা আমাদের তুলনায় অনেক অনেক কম। এরচেয়ে বেশি টাকা বরাদ্দ করার মতো আমাদের সংগতি ছিলনা। এই টাকার অর্ধেকটা আমরা ব্যয় করেছিলাম কৃষির উন্নতিকল্পে, বাকিটা ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল শ্রমশিল্প, খনি, যানবাহন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য।

প্রথম যোজনার শেষে আমরা খুব বেশি যে এগিয়ে যেতে পারিনি, তার কারণ আমাদের সময়, অর্থ ও পরিশ্রমের বেশ খানিকটুকু আমাদের ব্যয় করতে হয়েছিল একটা প্রাথমিক চিকিৎসার কাজে। যে দেশ আমাদের হাতে এল তার তখন জবর জখম অবস্থা। দেশের আর্থিক অবস্থা তখন সঙ্গীন। স্বাধীনতা লাভের কয়েক বছর আগে ইংরেজ আমাদের জোর করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাবিয়েছিল—যদিচ এই যুদ্ধের সঙ্গে ভারতের না ছিল কোনো সম্পর্ক, না ভারতের জমিতে ঘটেছিল এই যুদ্ধ। এদেশ থেকে ইংরেজ যতটা পারে টাকা শোষণ করে নিয়েছিল যুদ্ধ চালাবার জন্য।

যা কিছু এদেশের নিজের বলতে ছিল সব ঢেলে দেওয়া হয়েছিল যুদ্ধ চালাতে গিয়ে—ভারতের লোকের দিকে একটি বার না তাকিয়ে। যেসব জিনিস নইলে নয় তা পর্যন্ত তাদের হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, তাদের নিঃস্ব করে দিয়ে। বাংলায় হয়েছিল মন্বন্তর—একমুঠো ভাতের অভাবে ত্রিশ লক্ষ মানুষ মরেছিল বুট-এর তলায় পিঁপড়ের মতো।

সেই ঘোর কাটতে না কাটতে ১৯৪৭ সালে ভারতের অঙ্গ থেকে একটি বৃহৎ অংশ কেটে ছিঁড়ে নিয়ে পত্তন হল পাকিস্তান। দেশবিভাগের কী দারুণ দুর্গতি তার কথা তো ইতিপূর্বে তোমাদের বলেছি। দেশের সবচেয়ে উর্বর অনেকটা জমি আমাদের হাতছাড়া হয়ে গেল। কাপড়ের কল ও পাটের কলকারখানা রয়ে গেল এদেশে—অথচ যেসব জমিতে পাটের চাষ ও তুলোর চাষ হয় সেগুলি পড়ল পাকিস্তানের ভাগে। এতে লক্ষ লক্ষ লোকের জীবিকার উপায় বিপর্যস্ত হল। উপরন্ত পাকিস্তান থেকে আশি লক্ষ বাস্তুহারার পুর্নবাসন নিয়ে কীভাবে আমাদের হিমশিম খেতে হল, সে তো তোমরা জেনেছ। এইসব
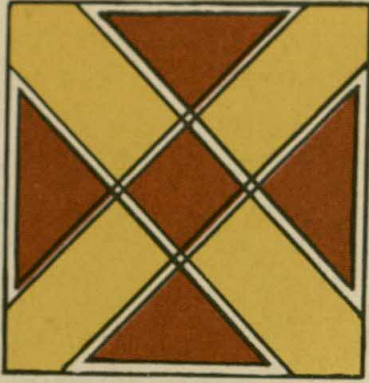
জখম সেরে না ওঠা পর্যন্ত স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করা কত শক্ত বুঝতেই পারো। সুতরাং ১৯৫১ সালে প্রথম যোজনার কাজ যখন শুরু হল তার অনেকখানি কাজ দাঁড়াল স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা।

দ্বিতীয় যোজনার সময় থেকে দেশের সমস্যার সঙ্গে সত্যকার মোকাবিলা শুরু হয়। সে সময় দেশ পুনর্গঠনের পরিকল্পনা নিয়ে দেশময় আলোচনার ঢেউ ওঠে—তেমনটা আগে কখনো দেখা যায়নি। দেশের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা গভীরভাবে চিন্তা করে দেখলেন কোন পথে গেলে ভারতের সত্য সত্য উন্নতি হয়। অন্যান্য দেশের অর্থশাস্ত্রী ও প্রযুক্তি বিশারদদের মধ্যে ভারতের বিশেষ বিশেষ সমস্যা বিষয়ে ওয়াকিবহাল পণ্ডিতদেরও পরামর্শ গ্রহণ করা হল। কিন্তু আমাদের শেষ লক্ষ্য যে আত্মনির্ভর হওয়া, এটা আমরা পরিষ্কার বুঝেছিলাম; বুঝেছিলাম দেশের বড় বড় প্রয়োজন মেটাবার ক্ষেত্রে পরমুখাপেক্ষী হলে চলবেনা।

আত্মশক্তিকে জাগিয়ে তোলাটাই হল আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু অন্য দেশের সহায়তার অপেক্ষা যদি আমরা না রাখি, তাহলে আমাদের
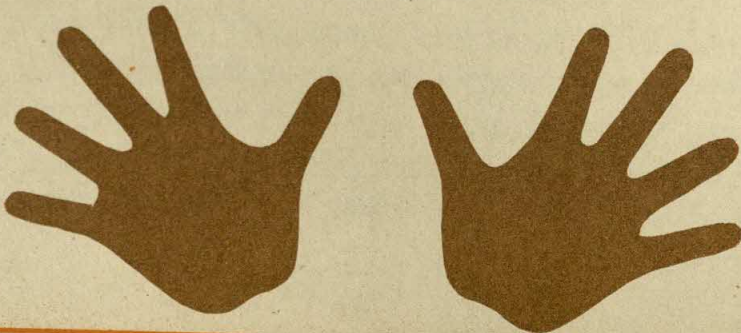
যাকিছু প্রয়োজন নিজেদেরই মেটাতে হয়—কেবল সামগ্রী নয়, যেসব যন্ত্রপাতির সাহায্যে সামগ্রী উৎপাদন করা হয় সেগুলিও নিজেদের চেষ্টায় নিজেদের দেশেই প্রস্তুত করতে হবে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার দেশ যখন স্বাধীন হয় এদেশে সাইকেলের টায়ার, স্টোভ, গ্যাস বাতির মতো অতি সাধারণ জিনিসও তৈরি হতনা। তাহলেই বুঝতে পারো কী দুরূহ কর্তব্য আমরা রেখেছিলাম আমাদের সামনে।

একটা গভীর কূপ থেকে জল তোলার প্রাথমিক কাজটাই সবচেয়ে শক্ত। কিন্তু একবার জল যদি জমি অবধি তোলা যায়, তাহলে জল আপনা থেকে সমস্ত খেতে ছড়িয়ে পড়ে। দেশের উন্নতি বিধানের প্রকল্পটিকে আমরা সেইভাবে দেখতে চেয়েছিলাম, ভেবেছিলাম শুরুতে যদি সবাই একসাথে 'হেঁইয়ো' বলে ঠেলা মারি, পাথর তাহলে আপনা থেকেই গড়াতে শুরু করবে। এই প্রথম ধাক্কাটাই তো সবচেয়ে শক্ত।

আমরা গরীব দেশ, আমাদের সম্বল যৎসামান্য। সেই জন্যই আমাদের উচিত এমন সব কাজে অর্থব্যয় করা যাতে না কি আমাদের দেশের অর্থসংগতি আপনা থেকেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। যতদিন তা না হয়, সুখসুবিধার পিছনে টাকা খরচ না করাই ভালো। ধরো, যদি আমরা অন্নবস্ত্র ও লোকের দৈনন্দিন প্রয়োজনের জিনিস বেশি পরিমাণে উৎপাদন করাটাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য বলে মনে করি, তাহলে কি সমস্যা মিটবে? মিটবে না, বাড়তি যাকিছু হবে, সে সব আমরা খেয়েদেয়ে শেষ করে বসব। দু'দিনে যেমনকার যেমন ছিলাম তেমনি অবস্থায় ফিরে যাব, তখন আবার সব শুরু করতে হত রামসে।

তা না করে আমরা স্থির করলাম, সবচেয়ে বিচক্ষণ ও দূরদর্শীর মতো কাজ হবে যদি আমাদের দেশের অর্থ বিনিয়োগ করি এমন সব যন্ত্রপাতিতে যা না কি অন্য যন্ত্রপাতি বানাতে কাজে লাগে। তাছাড়া বিদ্যুৎশক্তি, সিমেণ্ট, রাসায়নিক সারের মতো জিনিসেরও উৎপাদন বাড়াতে হবে। এসবই হল বৃহদাকার শ্রমশিল্পের অন্তর্গত। এগুলি স্থাপন করতে গেলে টাকা অনেক খরচ করতে হয় অথচ সদ্য সদ্য সুফল পাওয়া যায়না। ফল যা পাওয়া যায় তার উপযোগ দেখা দেয় অনেক পরে। যন্ত্রপাতি তো চিবিয়ে খাওয়া যায়না,

রাসায়নিক সারও নয়। এই শেষোক্তটির কথাটাই ধরো, জমিতে সার দেওয়া হল, বীজ বপন করা হল, ফসল পাকল তবে না প্রভূত অন্নের আকারে তা লোকের মুখে উঠল। অর্থাৎ কি না এইসব শ্রমশিল্পের সুফল বেশ দেরি করে দেখা দেয়, চট করে সুখসুবিধা বিধান করেনা। কিন্তু একবার যদি এরকম সংস্থা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে এর থেকে দেশের বিত্ত ক্রমশই বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমন একটা শুভ সম্ভাবনার জন্য প্রতীক্ষা করলে ক্ষতি কি?

শ্রমশিল্প পত্তন করতে অর্থ ব্যয় হয় প্রচুর। যেমন খুশি যেখানে খুশি পত্তন করার মতো সামর্থ্য আমাদের ছিলনা। সুতরাং কোন কোন শ্রমশিল্প দিয়ে শুরু করলে ভালো হয় এবং কোন জায়গায় স্থাপন করলে সবচেয়ে সুবিধা—এসব কথা আমাদের গভীরভাবে বিচার করে দেখতে হয়েছে। যুদ্ধ যখন হয় কুশলী সেনাপতি আক্রমণ বা প্রতিরক্ষার কথা ভেবে সুকৌশলে তার সৈন্য সাজিয়ে থাকে। সৈন্যসংখ্যা তার কম বলে তাকে দেখতে হয় কীভাবে সংস্থান করলে সবচেয়ে ভালো ফল পাওয়া যায়। আমাদেরও অনেকটা সেইরকমই করতে হয়েছে।

বৃহদায়তন শ্রমশিল্প নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও, কৃষি উন্নয়নের গতি যাতে শ্লথ না হয় সেদিকে আমরা দৃষ্টি রেখেছি। ভালো বাড়ি কিংবা ভালো চাকরীর জন্য অপেক্ষা করা যায়, কিন্তু ক্ষুধার অন্নের জন্য হাঁ করে বসে থাকা তো যায় না। কৃষির উন্নতি আমাদের অব্যবহিত প্রয়োজনের ব্যাপার, সুতরাং শ্রমশিল্প সংগঠনে যতই পরিশ্রম করতে হোক না কেন, কৃষির উন্নতির কথা আমরা উপেক্ষা করিনি।

১৭

'প্রত্যেক চোখ থেকে প্রতিটি অশ্রুবিন্দু মুছে দেওয়া'
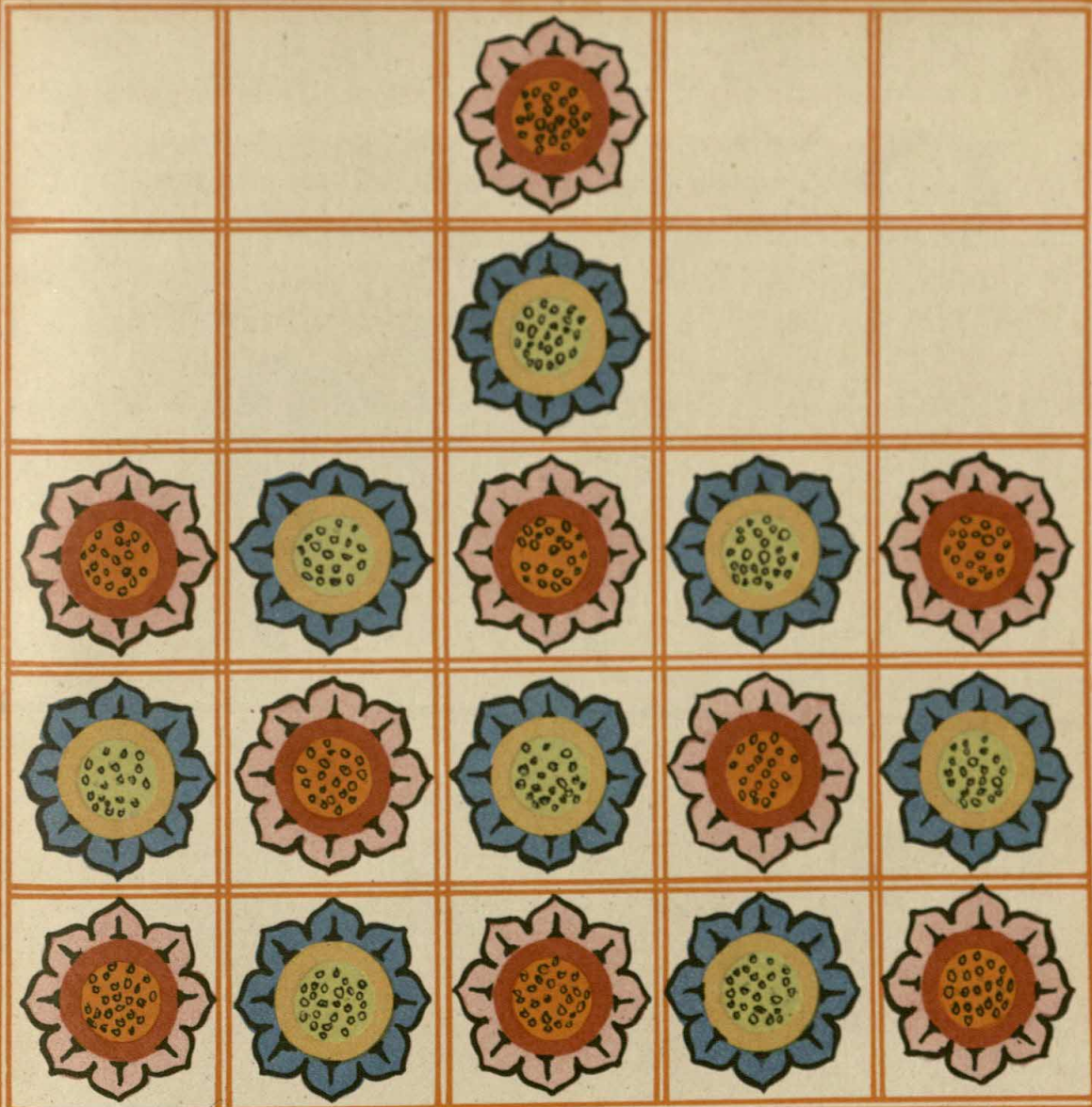
পঞ্চবার্ষিক যোজনার জন্য টাকা আমরা কোথা থেকে পেলাম?
বেশির ভাগ এসেছে আমাদের জাতীয় তহবিলের সঞ্চয় থেকে,
কিছুটা সরকার দেশের লোকের কাছ থেকে এবং বিদেশের

কাছ থেকে ধার নিয়েছেন। কয়েকটি ক্ষেত্রে আমরা হাতে টাকা না থাকা সত্ত্বেও দুঃসাহসে ভর দিয়ে কাজ হাতে তুলে নিয়েছি—এই আশায় যে সে প্রকল্প যখন সম্পূর্ণ হবে তখন তা থেকেই টাকা উঠে আসবে। একটা মোটা অঙ্কের টাকা এসেছে ধনী ব্যক্তিদের কাছ থেকে কর হিসাবে। একাধিক প্রকল্প কিংবা শ্রমশিল্প অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ও অনুন্নত অঞ্চলে সংস্থাপন করা হয়েছে, যাতে সে অঞ্চলের লোকেরা তা থেকে বেশি লাভবান হয়। নতুন যেসব কর ধার্য হয়েছে এবং সংস্থানের ব্যাপারে অঞ্চলবিশেষের প্রতি যেরকম পক্ষপাতিত্ব করা হয়েছে—তা অন্যদিক থেকেও রাষ্ট্রনীতির সহায়ক হয়েছে। তাতে করে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য হ্রাস পেয়েছে এবং সকল ভারতীয়দের মধ্যে সাম্যাবস্থা আনার আদর্শকে সত্য করে তোলার পথ দেখিয়েছে। এই জন্যই যোজনাকে তুলনা করা হয় সৈন্য সংস্থাপনের কৌশলের সঙ্গে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক যোজনা ছিল বৃহৎ ব্যাপার। এই যোজনার জন্য সরকার বরাদ্দ করেছিলেন এগারো হাজার ছশো কোটি টাকা। প্রথম দুই যোজনায় যুক্তভাবে যে খরচ হয়েছিল এ টাকা তার চেয়ে প্রায় পাঁচ হাজার কোটি টাকা বেশি। এই যোজনাতেও আমাদের সংস্থাপন কৌশল ছিল তার আগের যোজনার মতোই। কিন্তু এই পর্বে কতকগুলি গুরুতর সমস্যা দেখা দেয়। তৃতীয় যোজনার প্রথম বছরে আমাদের দেশকে চীন আক্রমণ করে এবং তিন বছর বাদে পাকিস্তান। যোজনার শেষ বছরে এবং তার পরের বছরেও অনাবৃষ্টির ফলে দেশময় অজন্মা দেখা দেয়। সর্বশক্তি প্রয়োগ করে এবং একাগ্রভাবে এই সংকটের সঙ্গে আমাদের মোকাবেলা করতে হয় বলে, যোজনায় পরিকল্পিত অনেক কাজে আমরা হাত লাগাতেও পারিনি।

১৯৬৫-৬৬ এই দু'বছরের অনাবৃষ্টির সময় বিহারে দুর্ভিক্ষ দেখা দেবার উপক্রম হয়েছিল। পঁচিশ বছর আগে এরকমটা ঘটলে লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মরত। রেলে ও রাস্তায় যানবাহনের সুবিধা থাকায় বিহারের লোক রক্ষা পায়। এসব সুবিধার উপযোগ আমরা করতে পেরেছিলাম এই জন্য যে আমাদের দেশের সরকার দেশের লোকের মঙ্গল চান। যেসব অঞ্চলে ফসল ভালো হয়েছিল, সেসব জায়গা থেকে চাল ও গম বিহারে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু সে তো যৎসামান্য, বেশির ভাগটা আনাতে হয়েছিল বিদেশ থেকে। যদিচ ভারত কৃষিপ্রধান দেশ এবং এ দেশের গরিষ্ঠ সংখ্যক মানুষ চাষবাস করে, তবু সঙ্কট কালে খাদ্যশস্য আমাদের বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়, এটা খুবই আশ্চর্যের কথা।

এ নিয়ে আমাদের খুবই দুর্ভাবনা হত। পরিষ্কার বুঝা গেল খাদ্যশস্যের মতো নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের জন্যও আমরা পরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। এই রকম অবস্থায় অধিক ফসল ফলাবার জন্য একটি নূতন উদ্যমের সূত্রপাত হল। বৃষ্টির পরিমাণ কম হোক বেশি হোক, খেতে সেচ দেবার জন্য জলের ব্যবস্থা করা যে অতি অবশ্য দরকার, সে তো জানা কথা। কিন্তু ব্যবস্থা করব বললেই তো ঝটপট ব্যবস্থা করা যায়না। সমস্ত ব্যাপারটাই সময় সাপেক্ষ, ব্যয়সাপেক্ষ। কিন্তু ইতিমধ্যে নিশ্চয় এমন কিছু করা যেতে পারে যা অপেক্ষাকৃত সহজে, কম খরচে ও কম সময়ের মধ্যে করা যায়। আমরা সেই দিকেই নজর দিলাম। আমাদের কৃষিবিজ্ঞানীরা দিবারাত্র পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর এমন সব খাদ্যশস্যের বীজ আবিষ্কার করলেন, যা থেকে কম সময়ের মধ্যে বেশি ফলন সম্ভবপর হয়। তাহলে জমি থেকে একাধিক ফসল মিলতে পারে। একই জমিতে ক্রমাগত একই রকমের খাদ্যশস্য ফলালে ফলন কমে যায়, জমির উর্বরতাও হ্রাস পায়। কৃষি বিজ্ঞানীরা দেখালেন কীভাবে একই জমিতে অদলবদল করে এক ধরনের শস্যের পর অন্য ধরনের শস্য উৎপন্ন করা যায়। অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হল, ফলও পাওয়া গেল হাতে হাতে। কৃষিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতের এই অগ্রগতিতে অন্য দেশের লোক অবাক হয়ে বলল যদি এভাবে কোনো দেশ এগিয়ে যেতে পারে, তাহলে খাদ্যশস্যের ব্যাপারে যুগান্তর ঘটে যেতে পারে। তারা ভারতের এই প্রচেষ্টার নাম দিল 'সবুজ' বিপ্লব। আগেকার দিনে জমি থেকে যে পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হত, আজকের দিনে হয় তার দু গুণ।

কৃষিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই যে অধিক ফসল ফলানোর প্রচেষ্টার সূত্রপাত হয়, এটি যোজনার অন্তর্গত না হলেও, কাজ খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিল সন্দেহ নেই। তৃতীয় যোজনার তালিকাভুক্ত অনেক কাজই হয় হাতে নেওয়া যায়নি কিংবা সময় মত শেষ করা সম্ভব হয়নি। তাই চতুর্থ যোজনা প্রস্তুত করার আগে,

আমরা একটু একটু করে অসমাপ্ত কাজগুলি শেষ করব বলে স্থির করেছিলাম। এ কাজে আমাদের তিন বছর সময় দিতে হয় – এই সময়ে আমরা প্রত্যেক বছরের জন্য একটা করে কার্যসূচি নির্দিষ্ট করে তদনুসারে কাজ শেষ করার চেষ্টা করেছি।

চতুর্থ যোজনায় হাত লাগানো হল মাত্র সেদিন –১৯৬৯ সালে। এখনো এই যোজনার কাজ চলছে। এই যোজনার রূপায়ণে সরকার পনেরো হাজার নশো দুই কোটি টাকা দিয়েছেন। জাতীয় তহবিল থেকে সরকার যেমন যোজনার কাজে কোটি কোটি টাকা খরচ করেন, তেমনি বহু বেসরকারী প্রতিষ্ঠান নিজেদের ব্যবসার খাতিরে অনেক এমন কাজে হাত দেন যাতে আখেরে দেশেরই উন্নতি হয়। একজন কাপড় কলের মালিক যদি অধিক উৎপাদন করতে পারেন, তার ব্যবসার মুনাফা নিশ্চয়ই বেশি হয়। সেই সঙ্গে দেশেরও সম্পদ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এসব বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কাজে বা ব্যবসায় আমরা সচরাচর হস্তক্ষেপ করিনা – যদি বুঝতে পারি তাদের কাজ দেশের কাজে লাগছে এবং তারা সরকারের নির্দিষ্ট পথে কাজ করে চলেছে।

সংখ্যা থেকে একটা জিনিস সহজে বোধগম্য হয়তো হয়না, তবু নিচে দেওয়া টাকার অঙ্ক থেকে তোমরা নিশ্চয় বুঝতে পারবে গত চার যোজনায় বেশি বেশি কাজ হাতে নেবার সঙ্গে সঙ্গে ধাপে ধাপে কেমন খরচও বৃদ্ধি পেয়েছে : তাহলে দেখতেই পাচ্ছ চতুর্থ

যোজনার জন্য যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তা প্রথম যোজনার ছয় গুণেরও বেশি।
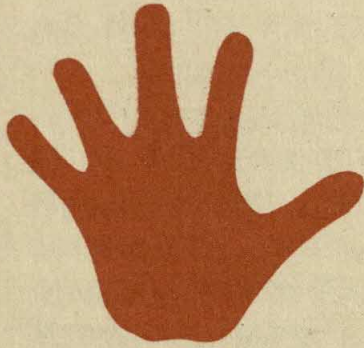
প্রথম যোজনা
(১৯৫১-৫৬)

১,৯৬০ কোটি টাকা

দ্বিতীয় যোজনা
(১৯৫৬-৬১)

৪,৬০০ কোটি টাকা

তৃতীয় যোজনা ৮,৫৭৬ কোটি টাকা
(১৯৬১-৬৬)

চতুর্থ যোজনা (১৯৬৯-৭৪) ১৫,৯০২ কোটি টাকা

চতুর্থ যোজনার পর আসবে পঞ্চম যোজনা। তারপর যথাক্রমে ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ইত্যাদি। আমাদের চরমলক্ষ্যে পৌঁছুতে গেলে আরো কত যে যোজনার মধ্যে দিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, তার কি কোনো ঠিক আছে!

আমাদের চরম লক্ষ্যটা যে কী, সে তো তোমরা জেনেছ। যাঁরা দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম করে গেছেন, দেশের মঙ্গলের জন্য গভীর ভাবে চিন্তা করে গেছেন, তাঁদের স্বপ্ন ছিল ভারতকে নূতন করে গড়ে তোলার। এই দুঃসাধ্য অভিযান ছিল তাঁদের জীবনের ব্রত। দেশ যখন স্বাধীন হল জওহরলাল নেহরু তো দেশের লোককে বলেননি যে প্রার্থিত ধন হাতে এসেছে বলে তারা যেন আনন্দে আত্মহারা হয়ে নৃত্যগীত করে। বরঞ্চ তিনি বলেছিলেন, "দেশের সেবা বলতে আমি বুঝি দেশের লক্ষ লক্ষ

দুর্গত সাধারণের সেবা। দেশের সেবা অর্থে আমি বুঝি অভাব, অজ্ঞান ও অস্বাস্থ্য দূর করে দেশের সর্বসাধারণের উন্নতির জন্য সমানভাবে সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা। বর্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ মানব গান্ধীজী বলে গেছেন যে তাঁর জীবনের পরম চরিতার্থতা তখন হবে যখন তিনি প্রতিটি চোখ থেকে প্রতিটি অশ্রুবিন্দু মুছে দিতে পারবেন। তা হয়তো আমাদের সাধ্যাতীত। কিন্তু যতদিন দুঃখদুর্দশা আছে চোখের জল আছে—আমাদের কাজ করে যেতেই হবে।"

জওহরলাল নেহরু বলেছিলেন, "তাই আমি বলি কি পরিশ্রম আমাদের করতে হবে, কাজ করে যেতে হবে তা সে যত কঠিন পরিশ্রমের কাজই হোক না কেন। তা না হলে আমাদের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে—সত্য হবে না।"

জওহরলাল নেহরু ও তাঁর সমসাময়িক বহু দেশব্রতীর কাছে স্বাধীনতা লাভের পরম চরিতার্থতা কী ছিল তা তাঁর ভাষাতেই বলি : 'স্বাধীনতার সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দিতে হবে দেশের সাধারণ মানুষদের কাছে—কৃষক ও শ্রমিকদের কাছে। দারিদ্র্য, অজ্ঞানতা ও অস্বাস্থ্যের বিরুদ্ধে ক্রমাগত লড়াই চালিয়ে তাদের পরাভূত করতে হবে। গড়ে তুলতে হবে প্রগতিশীল ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন একটি গণরাষ্ট্র। সামাজিক, অর্থনীতিক ও রাজনীতিক এমন সব প্রতিষ্ঠান পত্তন করতে হবে যার সহায়তায় ভারতের প্রত্যেকটি নরনারী পাবে ন্যায় বিচার ও জীবনের পূর্ণতা সাধনের সুযোগ।'

আরো বহু বছর ধরে এই মহৎ কাজে আমাদের নিযুক্ত থাকতে হবে।

১৮
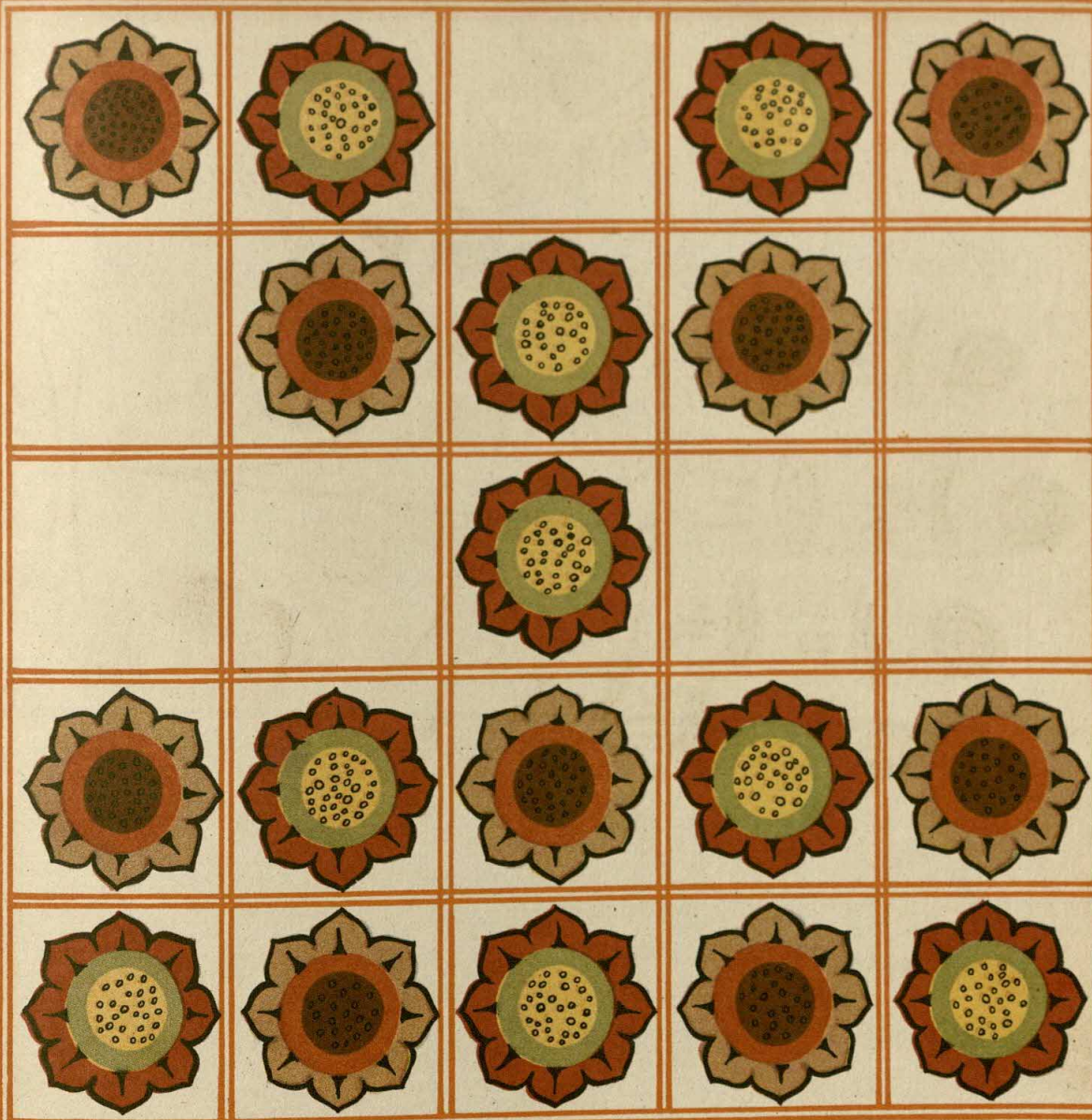
তখন আর এখন

এই যে কয়টি যোজনার কথা বললাম, এর ফলে ভারত কি সত্যিই এগিয়েছে? এগিয়েছে নিশ্চয়, কিন্তু কতখানি এগিয়েছে তা যদি জানতে চাও তাহলে যোজনার কাজ শুরু করার আগে কেমন অবস্থা ছিল তার সঙ্গে তুলনা করে দেখতে হয় কাজ করার ফলে কী অবস্থা এখন দাঁড়িয়েছে।

'তখন' কেমন ছিল আর 'এখন' কেমন হয়েছে, সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা হওয়া দরকার। 'তখন' বলতে বুঝতে হবে দেশে যে সময় প্রথম পঞ্চবার্ষিক যোজনার সূত্রপাত হল। আর 'এখন' মানে আজকালকার দিন অর্থাৎ 'তখন' থেকে প্রায় বিশ বছর পরে। আজকের 'এখন' আবার কালকের 'তখন' হয়ে যাবে, 'তখন' আবার 'এখন' উঠবে নূতন হয়ে। এই পালা বদলের পালা আমাদের দেশে চলবে বহুকাল ধরে, কারণ বেশ দূর পাল্লার পথ অতিক্রম

করে তবে আমরা আমাদের ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব। কিন্তু আমরা যে এগিয়ে চলেছি, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

আজ আমাদের জাতীয় তহবিলে আয়ের অঙ্ক প্রথম যোজনার শুরুতে যে অঙ্ক ছিল—তার তিনগুণ। জমির উৎপাদন বেড়েছে দ্বিগুণ আর

কলকারখানার তিন গুণেরও বেশী। আগে যতলোক লিখতে পড়তে জানত, আজ তাদের দ্বিগুণ লোক লিখতে পড়তে পারে। স্কুলের সংখ্যা দু-গুণ বেড়েছে, স্কুল পড়ুয়াদের সংখ্যা চারগুণ। তখন কলেজের সংখ্যা যত ছিল আজ তা বেড়ে হয়েছে পাঁচ গুণ। আগেকার সংখ্যার ছয় গুণ ছেলেমেয়ে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে। দেশে বিদেশে কোথায় কী ঘটছে, সে বিষয়ে দেশের অধিক সংখ্যক লোক এখন জানে। খবরের কাগজ ও পত্র পত্রিকার সংখ্যা তিন গুণ বেড়েছে, রেডিয়োর সংখ্যা প্রায় কুড়ি গুণ। ডাক চলাচলেরও প্রচুর উন্নতি হয়েছে। তখনকার তুলনায় এখন ডাকঘরের সংখ্যা বেড়েছে প্রায় তিন গুণ। হাসপাতালের সংখ্যাও দু'গুণ বেড়েছে। চিকিৎসা ব্যবস্থার এত উন্নতি হয়েছে যে ভারতীয়দের গড়পড়তা আয়ু প্রায় বিশ পঁচিশ বছর বেড়ে গেছে।

আজকাল আগেকার তুলনায় দ্বিগুণ যাত্রী রেলপথে চলাচল করে। যত মাইল রাস্তা ছিল, তা তিন গুণ বেড়েছে। ভারতের জাহাজ আজকাল যত যাত্রী ও পণ্য বহন করে তা আগেকার চেয়ে ছ'গুণ বেশী। যত লোক বিমানযোগে যাতায়াত করত, তার ছয় গুণ লোক আজকাল যাতায়াত করে। মোটরগাড়ির সংখ্যা বেড়েছে আগেকার তুলনায় ছয় গুণ।

তোমরা তো পড়েছ ইতিপূর্বে মাত্র চল্লিশ বছর আগে আমাদের দেশে শ্রমশিল্প বলতে বিশেষ কিছু ছিলনা বললেই হয়। সাবান, বিস্কুট, লেখবার কালির মতো অতি সাধারণ জিনিসও বিদেশ থেকে আমদানী করতে হত। ঘরে ঘরে যেসব দেয়ালপঞ্জী ঝুলত, তার বেশির ভাগ ছাপা হয়ে আসত জার্মেনী থেকে। ইংরেজরা দেশে রেলপথ পত্তন করেছিল সত্য, কিন্তু এক কাঠের স্লিপার ছাড়া রেল চালাবার জন্য যা কিছু দরকার হত – ইঞ্জিন, কামরা, মালগাড়ি এমন কি ফিশপ্লেটও আসত ইংল্যাণ্ড থেকে। দেশে কয়েকটি কাপড়ের কল ছিল বটে, কিন্তু সুতো কাটার টাকু ও তাঁত আসত বিলাত থেকে। কিছু খবরকাগজ ও বই এখানে ছাপা হত, তবে মুদ্রাযন্ত্র আমদানী না করলে চলতনা। দেশরক্ষার জন্য যেসব সরঞ্জাম দরকার তার একটিও দেশে তৈরি হতনা। জুতো, ঘোড়ার জিন এবং তাঁবু এখানে তৈরি হত অবশ্য, কিন্তু তাঁবুর জন্য ত্রিপল আনাতে হত বিদেশ থেকে।

আজকাল আমাদের দেশে সুপারসোনিক জেট প্লেন পর্যন্ত তৈরি হচ্ছে। তোমরা নিশ্চয় মিগ ২১, ন্যাট, অ্যাভ্রো যাত্রীবিমান ও এইচ.এফ-২৪-এর কথা জানো। এই সবকিছু আজকাল আমাদের দেশেই তৈরি হচ্ছে, দেশের লোকেরই হাতে। আমাদের বৈজয়ন্ত ট্যাঙ্ক যে কোনো আধুনিক ট্যাঙ্ক-এর সঙ্গে তুলনীয়। বন্দুক, রাইফেল, স্টেন-গান, ব্রেন-গান, গোলা গুলি ও কামান তো আমরা
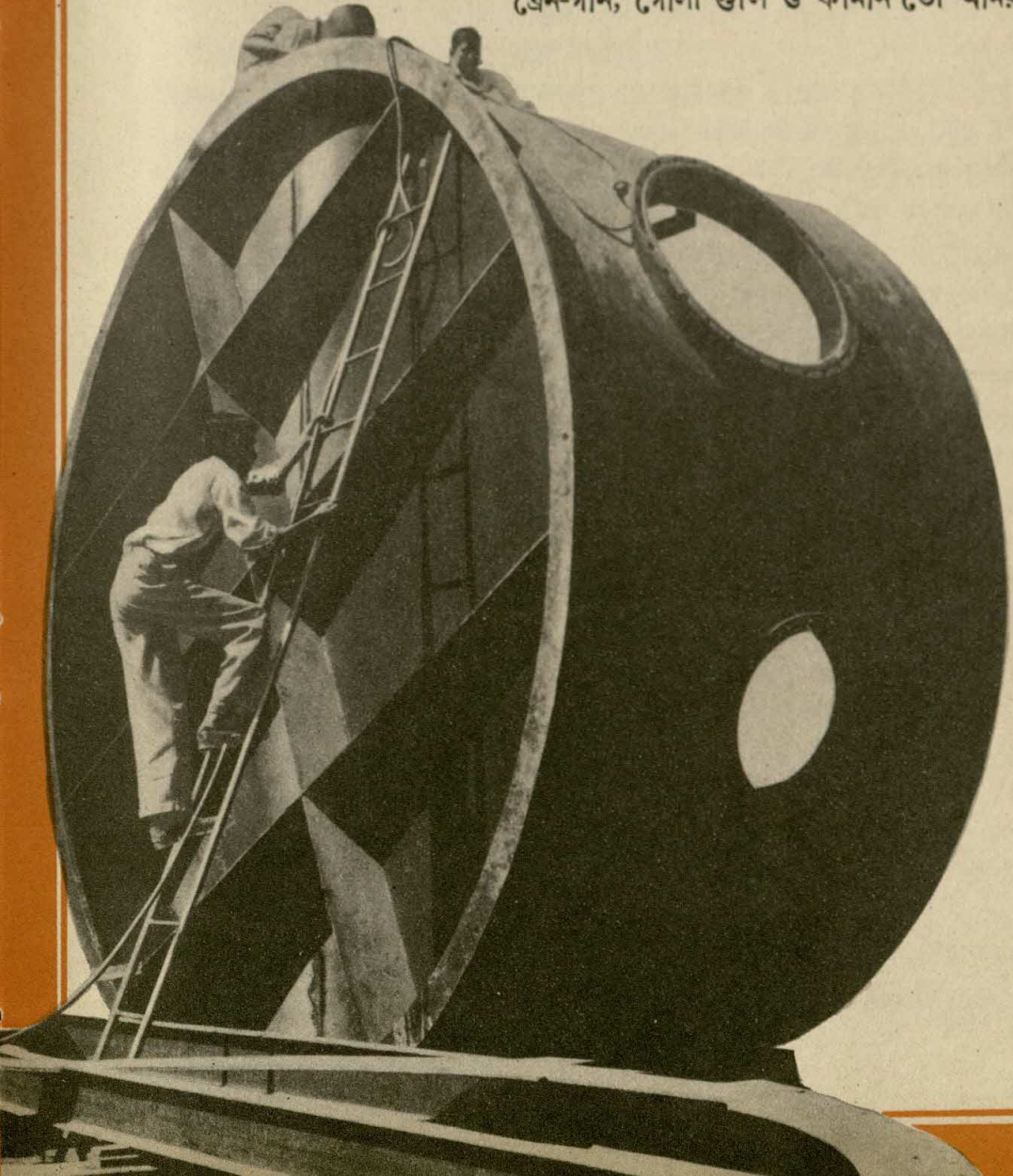
তৈরি করছি নানারকম। আমাদের নৌবাহিনীর জন্য আমরা 'নীলগিরি' নামে একটি আধুনিক রণতরী প্রস্তুত করেছি। 'হিমগিরি' নামে আরো একটি রণতরী প্রস্তুত হবার মুখে। আরো কিছু রণতরী তৈরি করা হবে বলে স্থির হয়েছে। এইসব এক একটি রণতরী তৈরি করতে খরচ পড়ে প্রায় বিশ কোটি টাকা, সুতরাং বুঝতেই পারো এগুলির যন্ত্রপাতি কত জটিল এবং কুশলী কারিগর না হলে এসব তৈরি করা কত শক্ত।

দেশের যেখানেই তোমার বাস হোক না কেন, দু'পা এগিয়ে গেলেই বেশ বুঝতে পারবে 'তখন'-কার দিনের থেকে 'এখন'-কার দিনে পৌঁছতে গিয়ে আমাদের এক প্রকার যেন সমুদ্র লঙ্ঘন করতে হয়েছে। এই অগ্রগতির প্রমাণ তো দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে—ভাকরা, হীরাকুদ ও নাগার্জুনসাগরের বাঁধগুলিতে; সিন্দ্রি ও নাংগালের রাসায়নিক সার উৎপাদনের কেন্দ্রে; ভিলাই, রাউরকেলা ও দুর্গাপুরের ইস্পাত কারখানায়; বাঙ্গালোর, নাসিক ও কানপুরে বিমান কারখানায়; চিত্তরঞ্জন ও বারাণসীর রেল কারখানায়; ট্রম্বের পারমাণবিক কেন্দ্রে এবং থুম্বার রকেট নিক্ষেপণ কেন্দ্রে। এমন কি দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র মিসাইল এবং স্যাটালাইট-এর মতো উপগ্রহ তৈরি করার জন্যও আমরা এখন প্রায় প্রস্তুত। এইসব কারণে সারা দেশ না হলেও, ভারতের বিশেষ বিশেষ অঞ্চল এখন শ্রমশিল্পে প্রগতিশীল অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনীয়। এখন আমাদের কর্তব্য এই যে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে যেসব সুযোগ সুবিধা স্থানবিশেষে সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে, তা একটু একটু করে দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে– এমন কি দূরতম গ্রাম দেশেও।

যারা টারবাইন্-এর মতো বিরাট ঘূর্ণযন্ত্র, বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্র ও বৈদ্যুতিক গণনযন্ত্র অর্থাৎ ইলেকট্রনিক কমপিউটার-এর মতো অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রও প্রস্তুত করতে পারে, তাদের কাছে বিদ্যুৎ-পাখা, রেডিয়ো, সেলাই কল এবং বাই-সাইকেল বানানো কত সহজ! ভারতের মত পৃথিবীর খুব কম দেশেই এত বেশী সংখ্যায় সাইকেল তৈরি হয়।

ইঞ্জিনীয়র ও ডাক্তারের সংখ্যাও ভারতে অন্য দেশের তুলনায় কিছু কম নয়। শিক্ষার্থীর সংখ্যা দেশে ক্রমেই বেড়ে চলেছে। বিজ্ঞানে চিকিৎসা-

বিদ্যায় ও প্রযুক্তি বিদ্যায় প্রতিদিন নূতন নূতন আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষণীয় বিষয়ও দিন দিন বাড়ছে। আজকের দিনের স্কুলে বিদ্যার্থীর সংখ্যা আট কোটি এবং কলেজে ত্রিশ লক্ষ। এমন কি হাজার হাজার বছর ধরে কেবল মাটি চষে ফসল ফলিয়ে যারা জীবনটা কাটিয়ে দিত, সেইসব চাষী পরিবারও আজকাল ট্রাক্টার চালানো শিখতে চায়, বৈদ্যুতিক পাম্প-এর সাহায্যে ক্ষেতে সেচ দিতে চায়; বীজ ছড়ানো, ফসলকাটা ও মাটি চষার মিতশ্রমিক যন্ত্র ও রাসায়নিক সার সম্বন্ধে জানতে চায়। রেডিয়ো ও ট্র্যানজিস্টার কীভাবে ব্যবহার করা যায়, কীভাবে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার নিয়ে ক্ষেতখামারের উন্নতি সাধন করা যায় – এসবেও এখন তাদের আগ্রহ কিছু কম নয়।

শিক্ষণীয় বিষয়েও আজকাল নানারকম বৈচিত্র্য দেখা যাচ্ছে। শিক্ষার্থী এখন নিজের পছন্দমতো কোনো বিষয় বেছে নেবার সুযোগ বেশি করে পাচ্ছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় আজকের দিনে ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যা কেবল রাস্তা কিম্বা সেতু বানানোর মধ্যে আবদ্ধ নেই। শিক্ষার্থী এখন তার পছন্দ অনুসারে ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যার যে কোনো একটি শাখা নিয়ে বিশেষভাবে শিক্ষা নিতে পারে, এবং পাঠক্রম শেষ করে বিমান ইঞ্জিনীয়র, ইলেকট্রিক ইঞ্জিনীয়র, নৌবিদ্যার ইঞ্জিনীয়র, রাসায়নিক-ইঞ্জিনীয়র, শিল্পবিদ্যার ইঞ্জিনীয়র প্রভৃতি হতে পারে।

দেশের শিল্পসংস্থা যত বৃদ্ধি পাবে ততই চাহিদা বাড়বে উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের। তাই দেখা যাচ্ছে ক্রমেই দেশের লোক অন্ন, বস্ত্র, প্রভৃতি মৌলিক প্রয়োজন মেটাবার ক্ষুধা থেকে উন্নীত হচ্ছে নূতন নূতন বিষয় জানা বা শেখার ক্ষুধায়।

গ্রামে গ্রামে যেসব লক্ষ লক্ষ দেশবাসী আছেন, তাঁরা তো কলেজে সামিল হয়ে তাদের নিজ নিজ কাজের উন্নততর পদ্ধতি শেখার সুযোগ পান না। তাই সমাজ উন্নয়ন কার্যসূচি অনুসারে, সেই সব রীতিপদ্ধতি বিষয়ক শিক্ষা গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দেবার আয়োজন করা হয়েছে। এই প্রকল্পের নাম কম্যুনিটি ডেভলপমেণ্ট। কেবল উন্নততর রীতিপদ্ধতি শেখানো নয়, সেই সঙ্গে

গ্রামে গ্রামে সেচের জল, রাসায়নিক সার, উন্নততর বীজ ও যন্ত্রপাতিরও প্রচলন করা হয়েছে। এইভাবে ভারতের পাঁচ লক্ষ গ্রামে পল্লী উন্নয়নের আদর্শ প্রচার এবং বাস্তবে তার রূপ দেবার কাজটাকে বলা যেতে পারে দেশ পুনর্গঠনের সবচেয়ে বড়ো ও সবচেয়ে কঠিন কাজ।

তখন থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত অন্য একটি যে বিরাট কাজে আমরা হাত লাগিয়েছি, তাহল গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎশক্তি পৌঁছে দেওয়া। আজকের জগতে ক্ষেত খামারেই হোক কিংবা কলকারখানাতেই হোক, বিদ্যুৎ
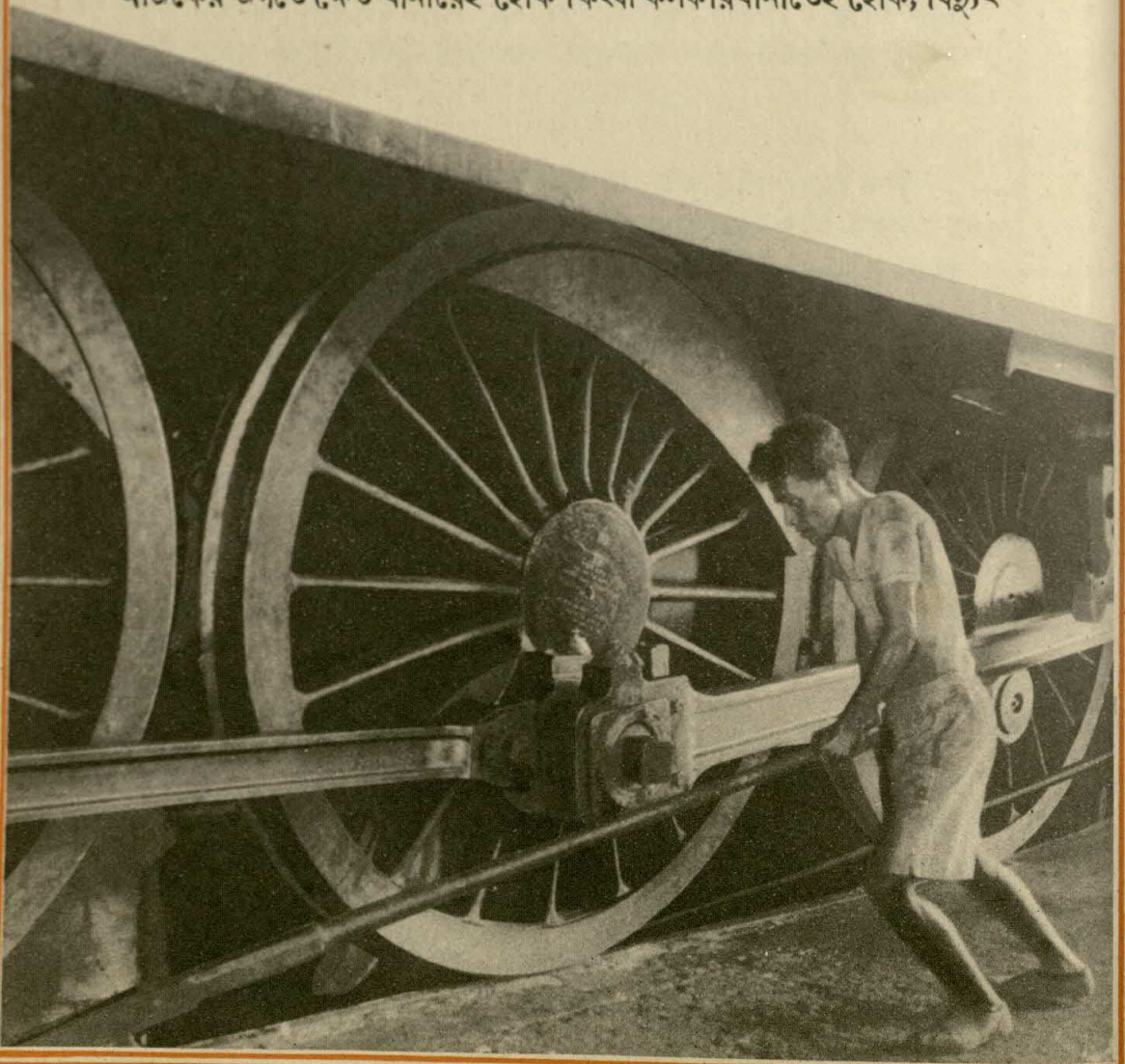
শক্তি ছাড়া বেশি কিছু করা একপ্রকার অসম্ভব। তুমি শুনে অবাক হবে, বিদ্যুৎশক্তির একটি ইউনিট ঘণ্টাখানেকের যেটুকু কাজ করতে পারে, একজন মানুষ দশঘণ্টা পরিশ্রম করেও তা করতে পারবে কি না সন্দেহ। সুতরাং বিদ্যুৎশক্তি কেবল যে ঘরবাড়ি পথঘাট আলো করে এমন নয়, বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যে কম সময়ে কম খরচে আমরা একাই দশজনের মতো কাজ করতে পারি। আজকের দিনে কোন দেশ কতটা সমৃদ্ধ কতখানি শক্তিশালী ও কত আধুনিক—তার মাপকাঠি হল তার বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের কমবেশি অনুসারে। ১৯৪৭ সালে আমরা যে পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করতে পারতাম, আজ করতে পারছি তার বারো গুণ। প্রতি বছর যে হারে এই উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে তার পরিমাণ ইংরেজ শাসিত ভারতের পঞ্চাশ বছরের সমান। দেশ যখন স্বাধীন হল আমাদের পাঁচ লক্ষ গ্রামের বড় জোর চার হাজার গ্রামে বিদ্যুৎশক্তি পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা ছিল, আজ সে জায়গায় এক লাখেরও বেশি গ্রামে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করা হচ্ছে।

দেশময় বিদ্যুৎশক্তি পৌঁছে দেওয়া সহজ কথা নয় — এজন্য প্রচুর অর্থ ও সময় ব্যয় করতে হয়। গোড়ায় স্থাপন করতে হয় বিদ্যুৎশক্তির প্রকল্প বা কেন্দ্র তারপর সেই শক্তি উৎপাদন করতে হয় জল, কয়লা, ডিজেল তেল কিংবা থোরিয়ম বা ইউরেনিয়ম-এর মতো পারমাণবিক উপাদানের সাহায্যে। অতঃপর উৎপাদনের কেন্দ্র থেকে তারের লাইন পেতে বিদ্যুৎশক্তি পৌঁছে দিতে হয় যথাস্থানে। এত সব প্রতিবন্ধক থাকা সত্ত্বেও বিদ্যুৎশক্তির উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে বিস্ময়কর ভাবে দ্রুত হারে। এই বৃদ্ধি থেকেই প্রমাণ হয়, অন্য ক্ষেত্রেও উৎপাদন তাল রেখে বেড়ে চলেছে, কারণ শক্তি ও সমৃদ্ধি হাতধরা-ধরি করে চলে।

এইসব কথা পড়ে হয়তো মনে হবে যে, গত পঁচিশ বছরে দেশ ও দশের জন্য আমরা অনেক কিছু করতে পেরেছি। কিন্তু সর্বদা মনে রাখা উচিত যতটুকু করা হয়েছে, তা কোনো ক্রমেই যথেষ্ট বলা চলেনা। অন্য অনেক দেশ আমাদের চেয়ে অনেক দ্রুত হারে উন্নতি করতে পেরেছে। সত্য বলতে কি, আমাদের অগ্রগতি অন্যদের তুলনায় খুবই কম — আমরা বেশ খানিকটা পিছিয়ে আছি। এমনটা হবার অন্যতম কারণ এই যে এ দেশের

জনসংখ্যাও দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। সেই যে বলেছি না, একখানা কলা এখনো ভাগ করে দিতে হচ্ছে পাঁচ জনের জন্য। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবার একটা কারণ হল যোজনা পর্বে স্বাস্থ্যের উন্নতি-বিধায়ক প্রকল্পগুলির সাফল্য। দেশের লোকের গড়পড়তা আয়ু বেড়ে গেছে। প্লেগ, কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়ার মতন মহামারী আগে লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটাত, আজকাল তেমন পারে না। শিশু মৃত্যুর হারও কমেছে। চিকিৎসা ব্যবস্থা পূর্বের তুলনায় সহজতর হয়েছে। লোকে আজকাল ভালো খেতে পাচ্ছে বলে সহজে রোগাক্রান্তও হয়না।

দেশের লোকসংখ্যা খুব বেশি দ্রুত হারে যাতে বৃদ্ধি না পায়, সেদিকে দৃষ্টি না দিলেই নয়। পরিবার নিয়ন্ত্রণ যদি আমরা করতে না পারি, তাহলে আমাদের এতকালের স্বরাজ সাধনা, এত দিনের কষ্টস্বীকার, দেশের উন্নতিকল্পে এই যে কোটি কোটি টাকা খরচ, দেশের দীনদরিদ্র সাধারণকে এত কাল আমরা যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, সুসময়ের জন্য এই যে আমাদের দীর্ঘকাল-ব্যাপী প্রতীক্ষা—এ সমস্তই ব্যর্থ হতে বাধ্য।

১৯
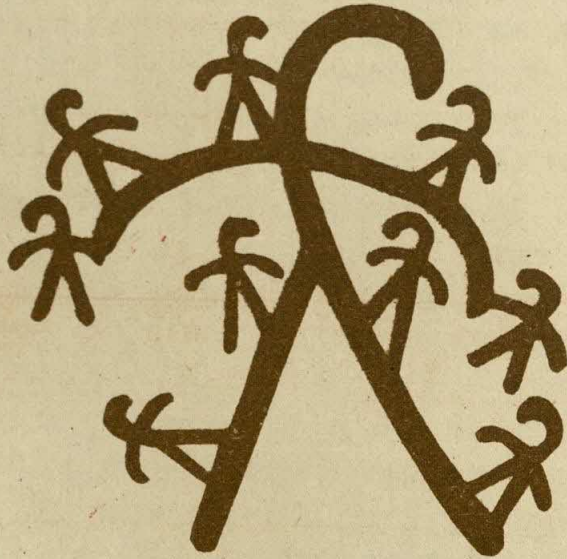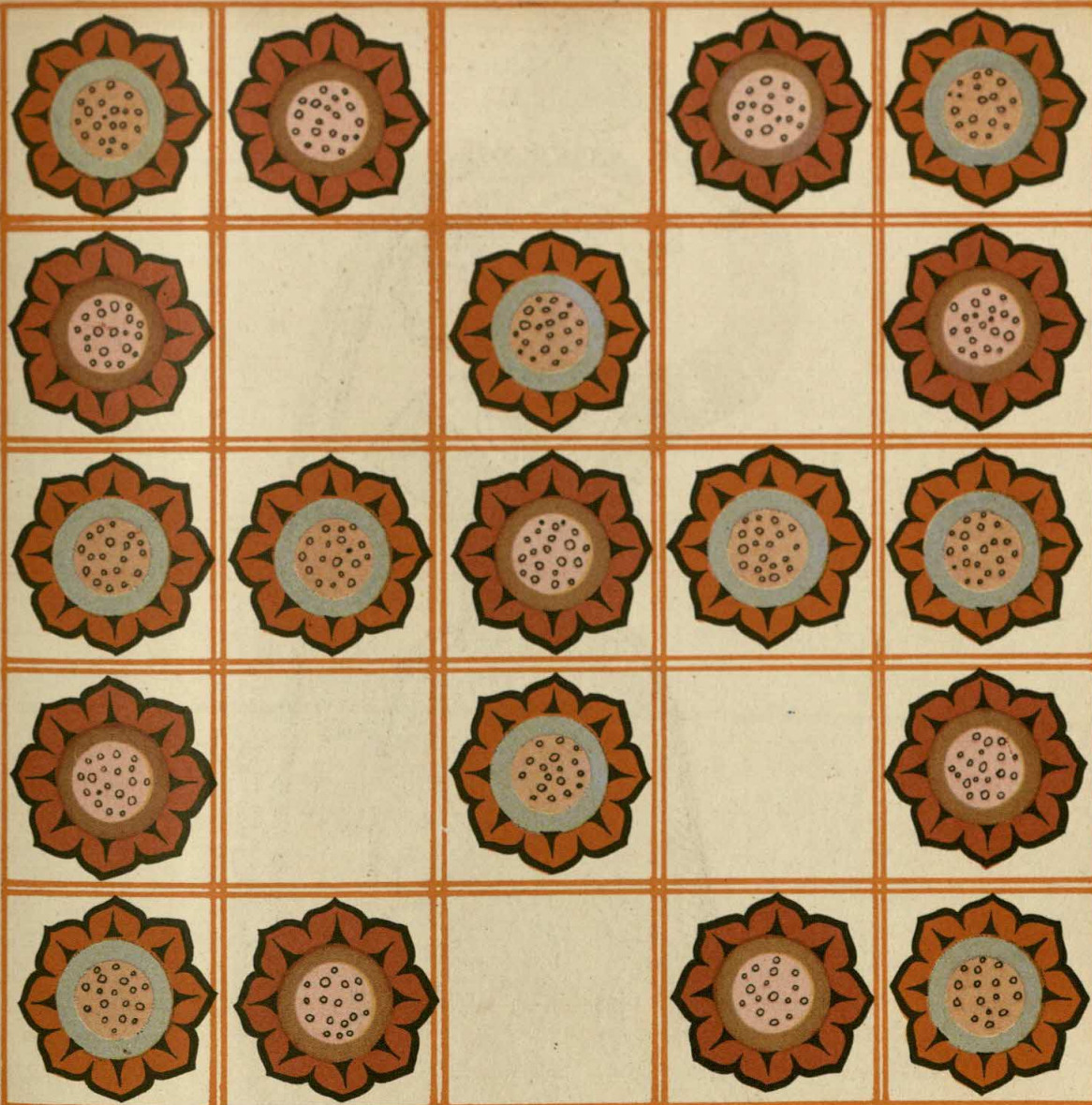
যে গ্রাম প্রথম হল

কোনো মানুষের শরীর স্বাস্থ্যের ঠিক অবস্থাটুকু যদি জানতে চাও – তাহলে তার মুখের চেহারা কিংবা হাত পা দেখে বিশেষ কিছু বুঝতে পারবেনা। মানুষের হৃৎপিণ্ড যদি ঠিক থাকে তাহলে শরীরটাও ঠিক আছে বলতে পারি। ভারতের

গ্রামাঞ্চল হল সারা দেশের হৃৎপিণ্ড। দেশের পাঁচ লক্ষ গ্রামের হৃৎস্পন্দন যদি শুনতে পাও তাহলে দেশের ঠিক অবস্থা কেমন বুঝতে পারবে। এই পাঁচ লাখ গ্রামের প্রত্যেকটির অবস্থা তো একই প্রকার হতে পারেনা। কোনো গ্রামের হৃৎস্পন্দনের শব্দ বেশ জোর কোনোটির বা বেশ দুর্বল—কিন্তু স্পন্দন হচ্ছে একই ছন্দে, কারণ প্রত্যেকটি গ্রামই তো একই সমাজদেহের অঙ্গীভূত। যতই এই দেহে শক্তিসঞ্চার হতে থাকবে ততই হৃৎস্পন্দনও জোরদার হয়ে উঠবে।
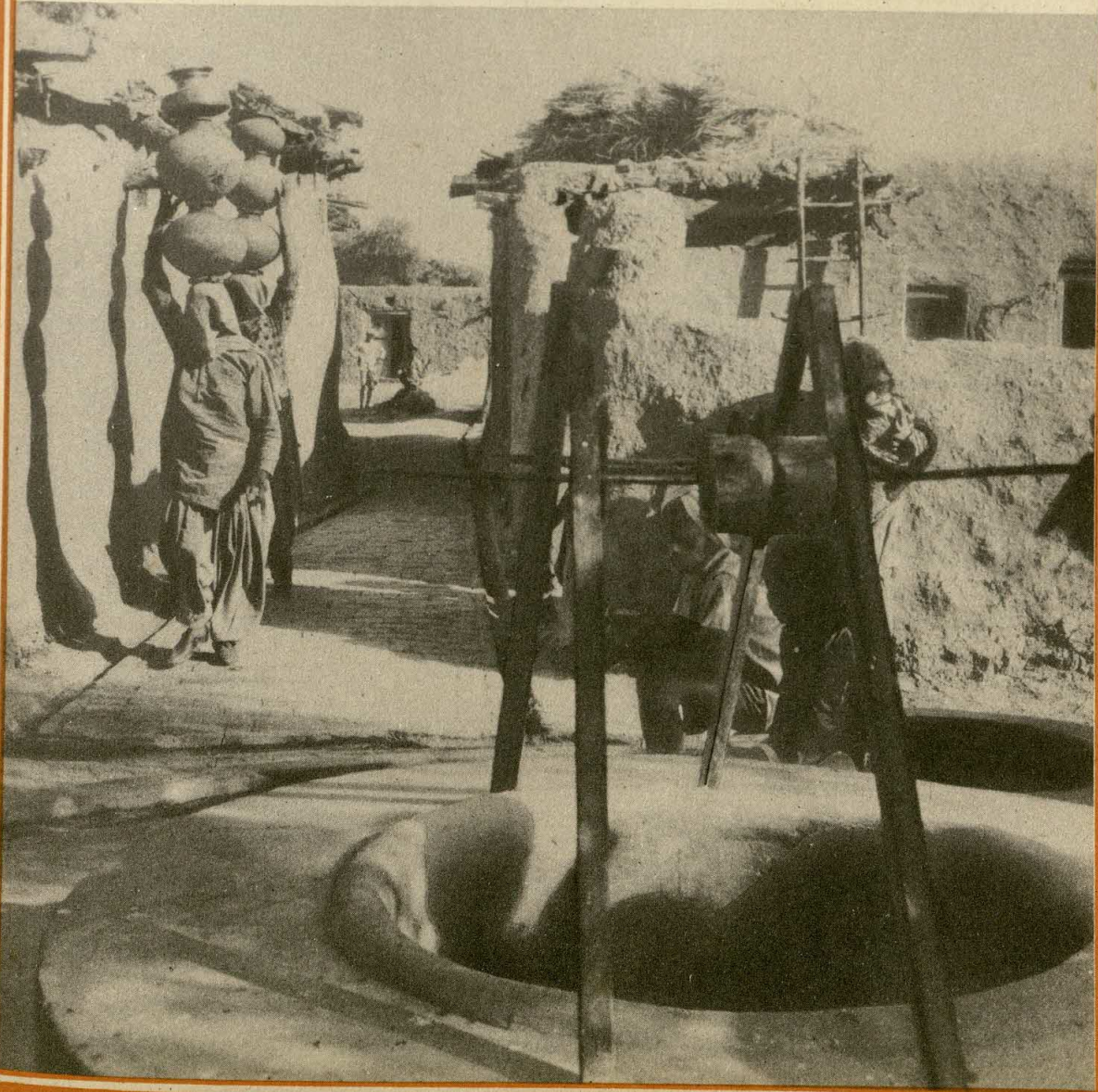
শত শত বৎসর ধরে আমাদের গ্রামাঞ্চলের অবস্থায় বিশেষ কোনো তারতম্য দেখা দেয়নি। গ্রামের চাষা একই ধরনের ফসল ফলিয়েছে বছর বছর, কাজে কাজেই গ্রামের লোকের খাদ্য যেমন ছিল প্রায় তেমনই আছে। পল্লীবধূরা বহুকাল ধরে কলের জল কাকে বলে জানত না, তারা তাদের কলসী কাঁখে কিংবা মাথায় নিয়ে, নিকটবর্তী কুয়ো কিংবা নদী থেকে জল তুলে আনত। 'নিকটবর্তী' অর্থে অনেক সময় বুঝতে হবে অনেক দূরের কোনো কূপ, পুষ্করিণী কিংবা নদীর ধারা। গ্রামের ধারে কাছে ছেলেমেয়েদের স্কুল প্রায়ই থাকতনা। সামান্য যে কয়জন পাঠশালায় ভরতি হত তাদের অনেক সময় দশ বারো মাইল খালি পায়ে হেঁটে স্কুল যেতে হত। ওষুধের দোকান কিংবা হাসপাতাল যেতে হলে তো আরো অনেক দূর পাল্লার রাস্তায় পাড়ি দিতে হত। রুগ্নীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়াটাও কম শক্ত ছিলনা, কারণ গোরুর গাড়ি চলার মতো রাস্তাও সব সময় ধারে কাছে মিলত কম। পাঁচ মাইল যেতে অনেক ক্ষেত্রে বনবাদাড় নদীনালা পেরিয়ে পৌঁছতে গিয়ে পাঁচ সাত ঘণ্টা সময় লেগে যেত। রাস্তাঘাট সেতু সাঁকো না থাকলে ঘণ্টায় মাইলটাক রাস্তা পেরোনোও খুব শক্ত হয়।

ফসল ভালো হত বৃষ্টি ভালো হলে। তা না হলে গ্রামের লোক থাকত অনাহারে, অর্ধাহারে। মানুষের কাছে এর প্রতিকার মিলত না বলে, লোকেরা আক্ষেপ জানাত ভগবানের কাছে। গ্রামে এক চাষবাস ছাড়া পেশা বলতে ছিল কামার কুমোরের কাজ, আর থাকত মুচি ও মেঠাইওয়ালা। শত শত বৎসর ধরে গ্রাম চলেছিল একই রাস্তায় — কীসে দু পয়সা আসে, উন্নতি হয়, গ্রামবাসীরা এসব কথা চিন্তাও করতে পারেনি। গ্রামের বাইরে বড়জোর বিশ মাইল দূর এলাকার মধ্যে দু চার বার পা দিয়েছে, নইলে গ্রাম থেকে বার হয়েছে খুব কমই মানুষ। অবশ্য কখনো কখনো দূরের কোনো মন্দিরে বা তীর্থে, কোনো হাটেবাজারে বা মেলায় কিংবা কোনো বিবাহ উপলক্ষে বাইরে গ্রামান্তরে যাওয়া যে একেবারে ঘটতনা — এমন নয়। বিজলীবাতি, রেলগাড়ি, রেডিয়ো কিংবা খবর কাগজ, অনেকে চোখেও দেখতে পেতনা। অনেক সময় সারা গাঁয়ে একটি মাত্র লোক হয়তো পড়তে লিখতে পারত। গ্রাম থেকে বড় একটা কিছু বেরোতনা, ঢুকতও না। গ্রামগুলি ছিল যেন আগাছায় ঢাকা বদ্ধ ডোবার মতো, বৃহত্তর দেশের সঙ্গে তাদের একপ্রকার সম্পর্কই থাকতনা।
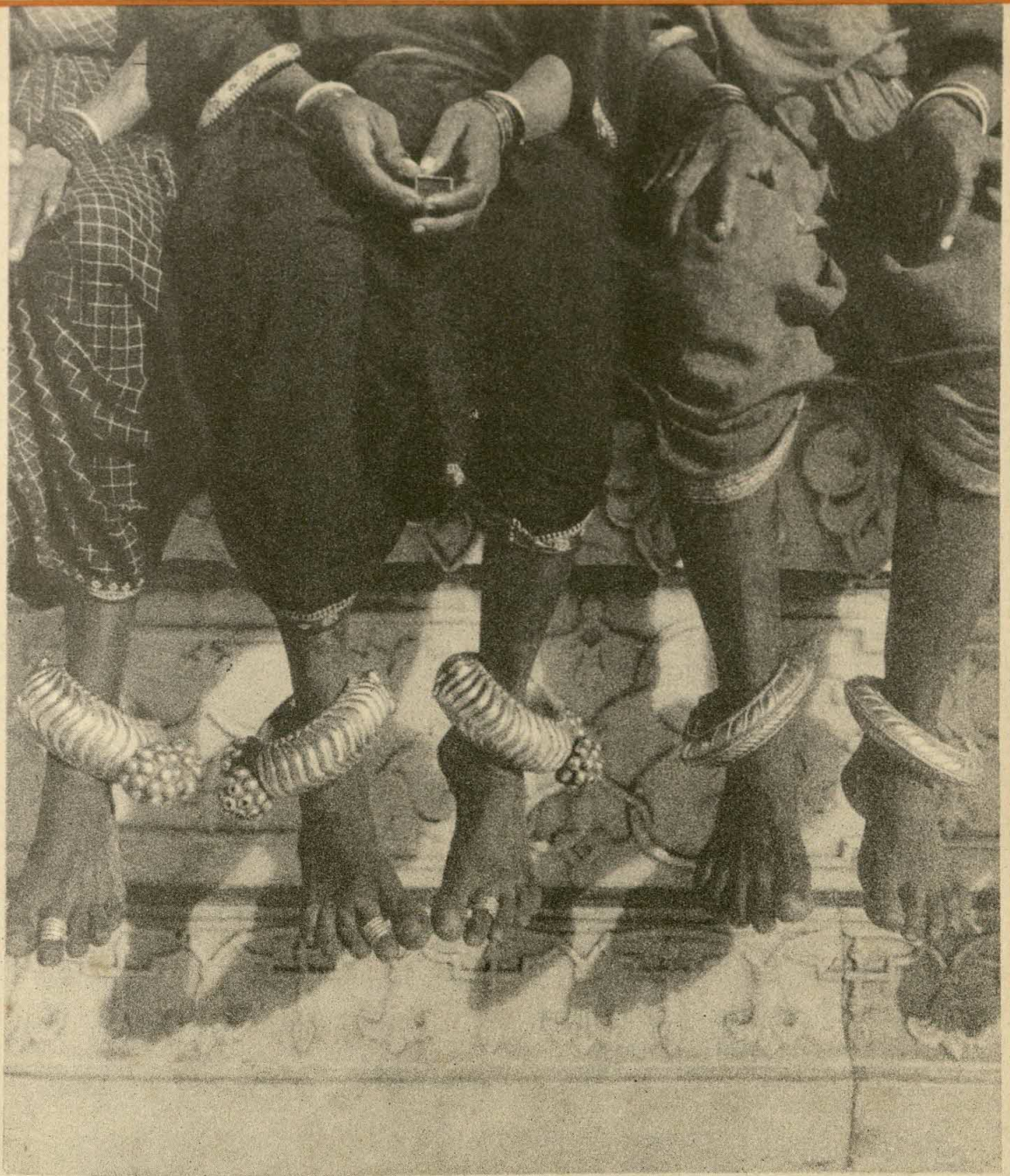
শহরের ও গাঁয়ের মধ্যে এমন দুস্তর ব্যবধান ঘটেছিল যে সাজপোশাক, জুতো
জামা, টুপি পাগড়ি, কথাবার্তা, আহারবিহারের পার্থক্য দেখেই চেনা যেত,

কে গ্রামের লোক কে বা শহরের লোক।

গত বিশ বছরে দেশের উন্নয়নের জন্য সরকার প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করেছেন। এই তো একটু আগেই বৃহৎ সেচ প্রকল্প, চাষের উন্নতি, নব নব শিল্পায়ন, খনিজ বস্তু উত্তোলন, যানবাহন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে অগ্রগতির বিষয়ে কত কি শুনলে। এইসব উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টার ছিটেফোঁটা সুফল কি গ্রামদেশে পৌঁছতে পেরেছে?

এই প্রশ্নের জবাবে বলা যায় কোনো কোনো গ্রামে কিছু কিছু সুফল প্রবেশ করেছে, কোনো কোনো গ্রামে এখনো করেনি। এগিয়ে যাবার দৌড়ে যে গ্রাম প্রথম এসেছে তার প্রতি একটা নজর দেওয়া যাক। এ গ্রামের এতরকম অদলবদল হয়েছে যে, এর মুখ দেখে চট করে চিনে নেওয়া শক্ত। এ গ্রাম নানা রকম ফসল ফলায় এবং প্রত্যেক ফসলের ফলনও হয় বেশি। এখানকার চাষাদের বেশ বর্দ্ধিষ্ণু অবস্থা। গ্রামেই এখন স্কুল বসে এবং স্কুলে যাবার বয়সী অধিকাংশ ছেলেমেয়ে এখন এই গ্রামের স্কুলেই পড়তে চায়। স্কুলের পাঠ শেষ হলে পর পড়ুয়াদের কেউ কেউ কলেজে ভর্তি হবে—এ আর এমন আশ্চর্য কী! কলেজ তো আজকাল আর সুদূরের স্বপ্ন মাত্র নয়, গ্রাম থেকে অনতিদূরেই তো একটি কলেজ হয়েছে। আজকাল সেই তখনকার দিনের পিকচার পোস্টকার্ড-এর ধরনে গ্রামের মেয়েরা কলসী মাথায় জল আনতে আর যায়না কারণ গ্রামেই আজকাল জলের কল বসেছে। বিদ্যুৎশক্তি এসে গ্রামকে যেন নূতন শক্তিতে শক্তিমান করে তুলেছে। আজকাল গ্রামে কান পাতলেই শোনা যায়, ইলেকট্রিক পাম্প—কোথাও যেন স্নান ও পানের জল তোলায় ব্যস্ত, কোথাও ড্রিল চালিয়ে কী যেন ফুটো করা হচ্ছে, কোথাও আবার তাঁত চলছে বিদ্যুৎশক্তিতে। আর জীপ ও মোটর তো হরদম হুসহাস যাওয়া আসা করে। বাঁধানো রাস্তার একপাশে আকাশের গায়ে সোজা টানা বিজলী তারের লাইন, রাস্তার দুধারে নূতন নূতন বাড়িঘর, একটু দূরে ক্ষেতের গা ঘেঁষে চলে গেছে সেচের জলের খাল, এখানে ওখানে পেট্রোল পাম্প বসিয়ে জল তুলে ছাড়া হচ্ছে ক্ষেতে। আর সন্ধ্যাবেলায় তো গ্রামের মেন রাস্তা বিজলী বাতির আলোয় ঝলমল করে। এমনটা তখনকার দিনে দেখা যেতনা। এখন গ্রামের অবস্থা এমন হয়েছে যে গ্রামে কেউ আর অসহায় বোধ করেনা।

গ্রামের লোক এখন পুষ্টিকর খাদ্য খায়। কেবল ভাত আর রুটিতে আজকাল পোষায়না। ডাল থাকে, তরিতরকারী থাকে, ঘিও থাকে। মাঝে মাঝে আজকাল চা পানও চলে। লোকের সাজপোষাকও এখন ভালো। গ্রামের ছেলের গায়ে যে শার্ট দেখা যায় অবিকল শহুরে ছেলের গায়ের শার্ট-এর মতন। পায়ে আজকাল জুতো চড়ে, কব্জিতে রিস্টওয়াচ। কোনো কোনো বাড়িতে নূতন আসবাব—এমন কি একখানা ট্র্যানজিস্টরও—দেখা যায়। নাইলন যে কাকে বলে, এ গ্রামের লোক ঠিকই জানে। গ্রামের দোকানে আজকাল হামেশা দেখা যায় যে পলিথিনের প্যাকেটে করে চানাচুর ও খোসাছাড়া ভাজা বাদাম বিক্রি হচ্ছে। আজকাল কোথাও যেতে হলে লোকে সাইকেল টেনে বের করে। দূর পাল্লার জায়গায় যাবার দরকার হলে হাতের কাছেই তো বাস সারভিস্। কালে ভদ্রে দু'চারটা ফিল্মও যে গ্রামের লোকে না দেখে, এমন নয়। কারো যদি ব্যারাম হয় চিকিৎসার মোটামুটি কোনো ব্যবস্থা করে ফেলাটা শক্ত হয়না। আগেকার দিনের দেশীয় গাছ-গাছড়ার তুকতাক কিংবা ওঝা ডেকে ভূত ছাড়ানো, অথবা কেবল ভগবানের দোহাই দিয়ে চুপচাপ বসে থাকার ব্যাপার, এখন পুরনো হয়ে গেছে।

গ্রামে আজকাল হামেশা বিজলী মিস্ত্রি কিংবা মোটর মিস্ত্রি দেখা যায়। কিছু ছোটখাটো কারখানারও পত্তন হয়েছে। দিন দিন নূতন নূতন কাজের সুযোগ উপস্থিত হচ্ছে। গ্রামে একটা আধুনিক দুগ্ধ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে। আগে যেমন দুধ নষ্ট হত, আজকাল আর তেমনটা নেই। বিদ্যুৎশক্তির কল্যাণে এখন হিমঘরে দুধ, মাখন, পনীর সবকিছু রাখা যায় ও দরকার মতো বাজারে বিক্রির জন্য ছাড়া যায়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সবজি ও ফল আজকাল টিনে বা বোতলে পুরে, বাজারে বিক্রি করা যায়। এসব কাজ ছাড়া আরো শতেক কাজে, আজকাল গ্রামের মানুষ হাত লাগাতে পারে।

গ্রামের যে কোনো একটি আদর্শ পরিবারের চেহারাটাও আগেকার তুলনায় অনেকখানি বদলে গেছে। আগেকার কালে পরিবারের ছেলে হোক বুড়ো হোক প্রত্যেকটি মানুষ চাষবাসের কাজ করত। আজকের কৃষক চায়না যে বাড়ির চারটি জোয়ান ছেলেই চাষের কাজে নিযুক্ত থাকে। যে পরিবারের কথা বলছিলাম তার এক ছেলে একশো মাইলেরও বেশি দূরে একটি ইঞ্জি-

নীয়ারিং কলেজে পড়াশুনা করছে, একজন শহরের একটা কোন আপিসে চাকরী করে, তৃতীয়জন একটি কারখানার ম্যানেজার হবার জন্য তালিম নিচ্ছে। কেবল একটি ছেলেই এখন চাষবাসের কাজ দেখে। চার ভাই যখন গ্রামের বাড়িতে একত্র হয় বেশ বুঝতে পারে যে গ্রামে বসে তারা যে পৃথিবীটাকে জানত, গ্রামের বাইরে পা দেবার ফলে তার পরিধি বহু বিস্তৃত হয়েছে বহুবিচিত্রও হয়েছে। বাড়ির মেয়েরাও এখন ছেলেদের কাছ থেকে এমন সব নূতন নূতন জিনিসের কথা শুনতে পায়, যেসব বিষয়ে আগে তারা কিছুই জানতনা। সমস্ত দেশটাকেই এখন যেন তারা তাদের গ্রামের বাড়ির চার দেয়ালের মধ্যে দেখতে পায়, কারণ ছেলেদের কথাবার্তা থেকে তারা বুঝতে পারে, সারা দেশের সুযোগ সুবিধা সমস্তই এখন তাদের নাগালের মধ্যে এসে পড়েছে।

বিদ্যুৎশক্তি গ্রামে আসার ফলে জীবনযাত্রা যেন আনন্দে উজ্জ্বল হয়েছে, সেই সঙ্গে আরাম ও সুবিধাও বেড়েছে অনেক। সূর্যাস্তের পরেও সবকিছু বিজলীর আলোয় পরিষ্কার নজরে পড়ে—এ কী কম কথা। এখন দিনের শেষে মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে আড্ডা দেওয়া যায়, কথা বলা যায়, পড়াশোনা করা যায়, কাজ করা যায়, আবার ইচ্ছা হলে গা এলিয়ে বিশ্রাম করাও যায়। আজকাল চিত্ত-বিনোদনের যেমন সুবিধা হয়েছে, তেমনটা আগে কখনো ছিলনা। সিনেমা রেডিয়ো প্রভৃতি বিনোদনের নানা উপায় বিদ্যুৎ হাতের কাছে এনে দিয়েছে। বাড়িঘর রাস্তাঘাটে বিজলী আলো থাকায় লোকের নিরাপত্তাবোধও বৃদ্ধি পেয়েছে। কোনো কোনো বাড়িতে আজকাল বিজলী পাখা ও সেলাই কলও দেখা যায়। আগে প্লাস্টিকের বালতি, সুতী কাপড়, সাবান, মাথার তেল, কাটা পোশাক শহরে ছাড়া পাওয়া যেতনা, আজকাল গ্রামের দোকানেও সহজে মেলে। গ্রামের জীবনযাত্রার আরাম প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে, আজকাল বেশি লোক শহরমুখো হতে চায়না। দু'জন ডাক্তার, একজন ইঞ্জিনীয়র, একটি যন্ত্রবিশারদ এখন গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেছেন। আমরা যত গ্রাম দেখেছি, উৎকর্ষের দিক থেকে উপরে বর্ণিত গ্রামটি তাদের মধ্যে প্রথম বলা চলে।

কিন্তু এমনও তো গ্রাম আছে যা অগ্রগতির দৌড়ে পিছিয়ে আছে, প্রথম কিংবা দ্বিতীয় সারির ধারে কাছে যার স্থান নেই, যা হয়তো নেহাতই তৃতীয় ধাপের গ্রাম। এমন একটি গ্রামের দিকে এক নজর তাকানো যাক। এ গ্রামে

বিজলীবাতি নেই, কিন্তু গ্রামের লোক এখন আর কুপী বা প্রদীপ ব্যবহার করেনা, হ্যারিকেন লণ্ঠন ব্যবহার করে। পাকা রাস্তা এখনো নেই, কিন্তু কাঁচা রাস্তার সংখ্যা আগের তুলনায় বেড়েছে। গ্রামে ইলেকট্রিক পাম্প এর সাহায্যে স্নান পানের জল তোলা হয়না সত্য, কিন্তু লোকে হাতের পাম্প চালিয়ে টিউবওয়েল থেকে জল তোলে। বড় কোনো স্কুলবাড়ি এখনো তৈরি হয়নি যদিচ, গ্রামের লোকে খুঁটি বসিয়ে চালা ঘরে একটা স্কুল পত্তন করেছে। লোকে হাতের কাছে যা পায়, তাই দিয়ে কাজ চালিয়ে নেয়, এটা নেই সেটা নেই করে বসে থাকেনা।

এ থেকে প্রমাণ হয় যে একটি বৃহৎ পরীক্ষায় প্রথম ও দ্বিতীয় সারির গ্রামের মতো, এই গ্রামও সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছে। অগ্রগতির দিকে এরাও পা বাড়িয়েছে। তা না হলে বহু জিনিসের অভাব সত্ত্বেও তারা এতটা আত্মনির্ভর হতে পারতনা। আরো একটি কথা : এরা বুঝতে পেরেছে যে জীবনযাত্রার মান এরাও উন্নত করতে পারে, যে সুদিন আগতপ্রায় তাকে এগিয়ে আনার জন্য এরা কাজ করতে যেমন প্রস্তুত, তেমনি প্রস্তুত তার জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে।

এই গ্রামের চেয়ে উন্নত গ্রাম যেমন আছে, অনুন্নত গ্রামও তেমনি আছে। বড় কথা এই যে, সকল গ্রামই এখন এগিয়ে চলার জন্য পা বাড়িয়ে আছে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জের টেনে বলা যায়, এইসব গ্রামই এক ধাপ উঁচু ক্লাশে প্রোমোশন পেয়ে গেছে। লোকে আগেকার দিনে অন্য উপায় না থাকায় ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, হালবলদ নিয়ে চাষ করতে বেরোত। আজকাল লোকে চাষবাসে হাত লাগায় অধিক উপার্জনের আশায়। অনেক শিক্ষিত লোকও এখন কৃষির দিকে ঝুঁকেছেন।

জাত ও ধর্ম নিয়ে আগে খুবই কড়াকড়ি ছিল। কে কী করবে না করবে, কার সঙ্গে এক পংক্তিতে বসে খাবে কি খাবেনা—এইসব অনুশাসন এখন আস্তে আস্তে চলে যাবার মুখে। এখন লোকে নিজেদের বিচার বিবেক মেনে চলতে চায়, শাসন বারণে আগেকার মতো আর ভয় পায়না। উচ্চবর্ণের কোনো লোক চলতি বাস-এ যদি কোনো অচ্ছুৎ হরিজনের পাশে বসেন তাহলে তিনি বাস থামিয়ে স্নান করে শুদ্ধ হবার জন্য আর ব্যস্ত হননা।
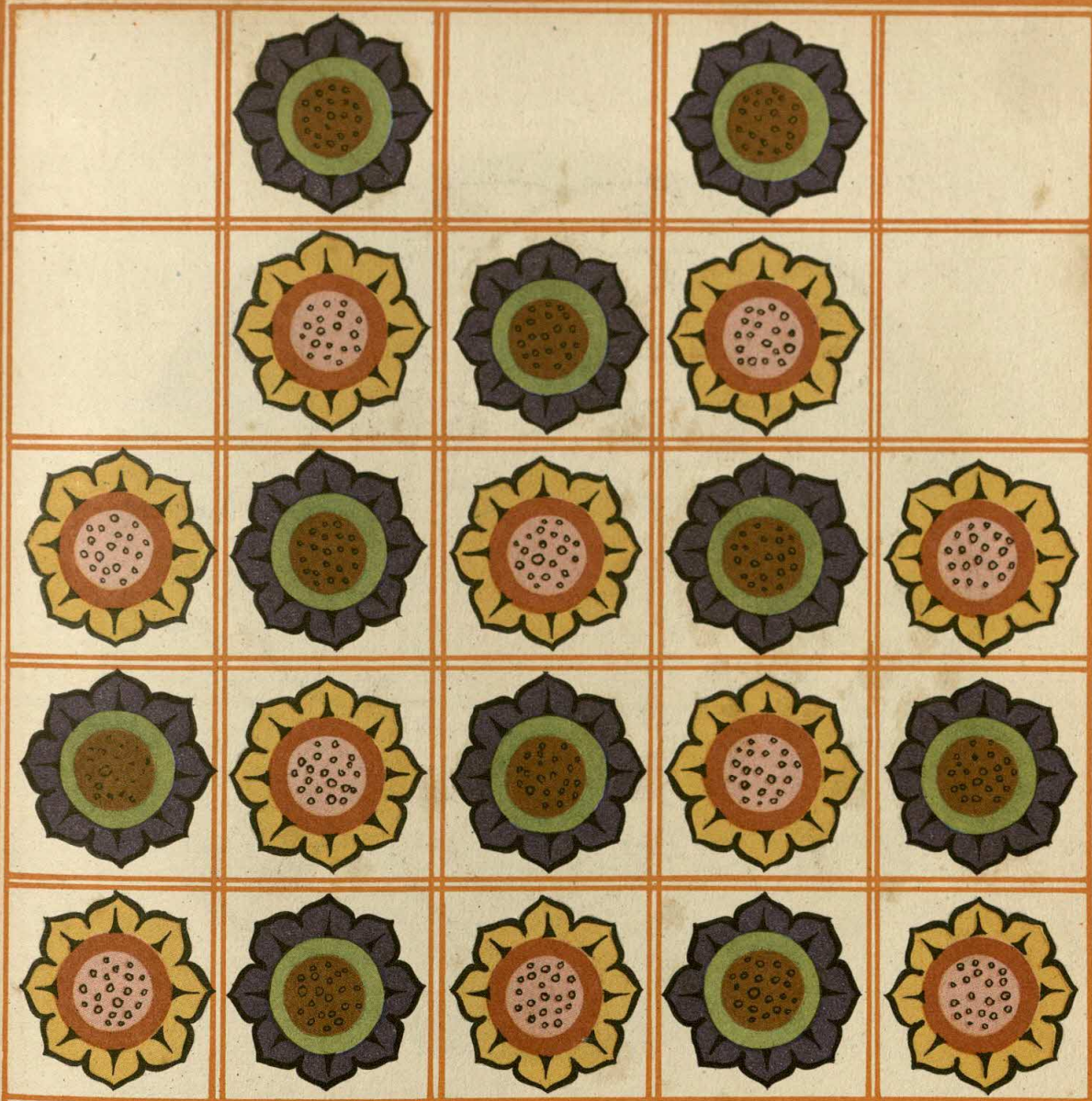
পরিবর্তন হচ্ছে কী?
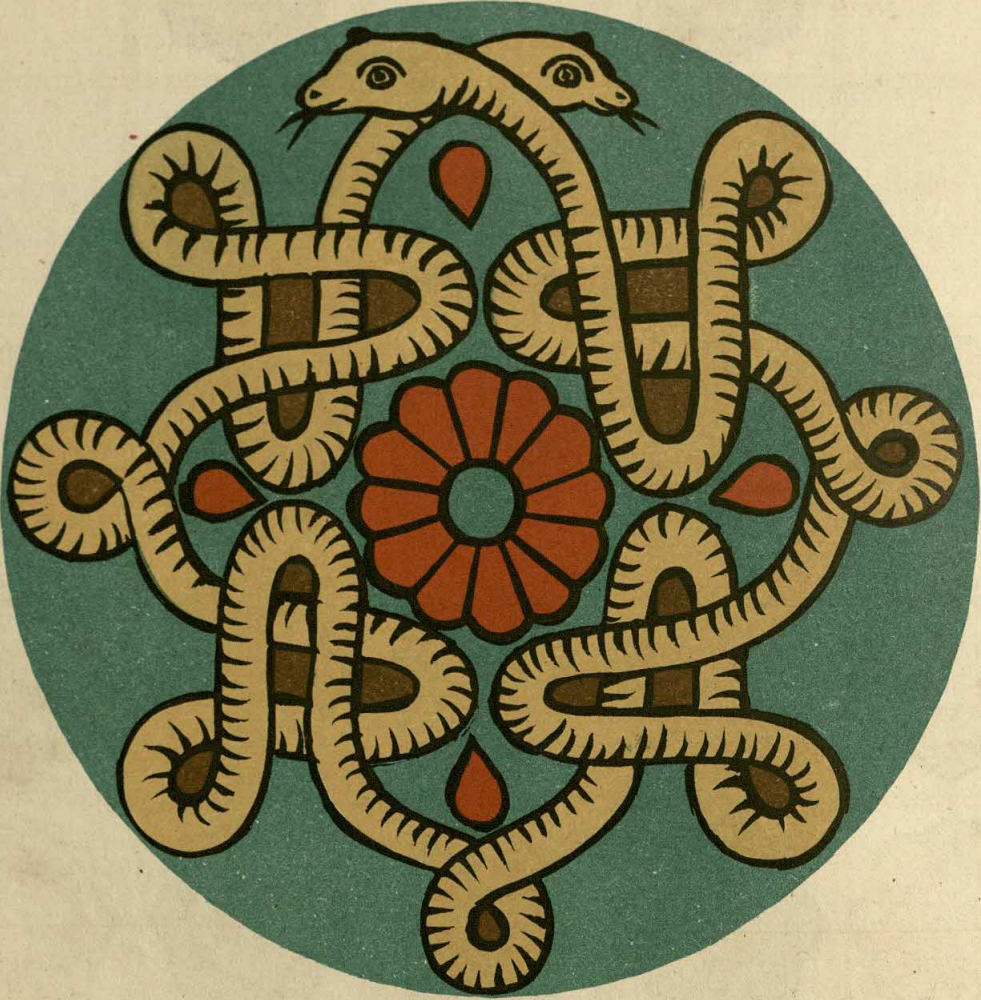
বৃদ্ধির লক্ষণ হল পরিবর্তন। ছোট জিনিস আকারে বড় হলেও জিনিস একই থাকে। সেরকম বড় হওয়াটাকে ঠিক পরিবর্তন বলা চলেনা। গাছ বাড়ে মানুষ মোটা হয়; কিন্তু গাছ গাছই থাকে, মানুষ মানুষই। কিন্তু বীজ থেকে যখন গাছ হয়, গুটিপোকা যখন প্রজাপতিতে পরিণত হয়, কিংবা ডিম ফেটে যখন বাচ্চা বের

হয়, তখন যে পরিবর্তন ঘটে তাকেই আসলে পরিবর্তন বলা চলে। বীজ ও গাছের আকারে এত তফাৎ যে দুয়ের মধ্যে কোনো যোগ আছে বলে মনে হয়না। গুটিপোকা ও প্রজাপতি সম্বন্ধে একই কথা বলা যায়। যেহেতু তুমি জানো যে গুটিপোকা থেকে প্রজাপতি বের হয় তাই কথাটা তুমি বিশ্বাস করতে পারো। একটা ডিম দেখে কি বলা যায় তার ভিতর কি আছে?

'ভারতে পরিবর্তন ঘটছে'। 'ভারতে কোনো পরিবর্তন ঘটছেনা।' 'ভারতে দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে।' 'ভারতে পরিবর্তন ঘটেছে শ্লথ গতিতে।' 'ভারতে কখনো পরিবর্তন ঘটেনি, ভারত চিরকাল একইরকম থাকবে'। আমাদের দেশের সম্বন্ধে এই ধরনের কথা বলে থাকেন দেশের লোকেরা, বিদেশের লোকেরাও। এইসব উক্তির কোনটি সত্য? মুশকিল হয়েছে এই যে প্রতিটি উক্তিই কিছু পরিমাণে সত্য, সুতরাং কোনোটিকেই একেবারেই ভুল বলা চলেনা। কোনো-টাই আবার পুরোপুরি সত্য নয়। ভারত এমন বিরাট ও বিচিত্র যে, এদেশ সম্বন্ধে লোকে যত কিছু বলুকনা কেন, তার কোনো কোনোটা দেশের কোনো কোনো জায়গা সম্বন্ধে, কোনো ভাবে প্রযোজ্য হতে পারে। যদি বলা হয় যে, 'ভারতে প্রচুর আপেল উৎপন্ন হয়'—সেকথা হিমাচল প্রদেশ কিংবা কাশ্মীর সম্বন্ধে সত্য হলেও, কেরল ও অন্ধ্র প্রদেশের ক্ষেত্রে খাটবেনা। কিন্তু মোটামুটি ভাবে বলা চলে যে 'ভারতে কিছু কিছু আপেল উৎপন্ন হয়।' তেমনি যদি বলা হয় 'ভারতে কৃষির ব্যাপারে আধুনিকতম প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ দেখা যায়', তাহলে পাঞ্জাব সম্বন্ধে সেকথাটা অনেকখানি প্রযোজ্য হলেও, উত্তর প্রদেশ সম্বন্ধে হয়তো হবেনা। এক্ষেত্রেও সাধারণভাবে বলা যায় যে ভারতে কৃষির উন্নতি হয়েছে। তেমনিভাবে বলা যেতে পারে, পঁচিশ বছর আগে স্বাধীনতা লাভের সময় ভারতের যে অবস্থা ছিল, সে অবস্থার প্রচুর পরিবর্তন ঘটেছে এবং পরিবর্তনের হার দ্রুত বেড়ে চলেছে।

ইতিপূর্বেই বলেছি, দেশের তহবিলে উপার্জিত ধনের অঙ্ক এখন আগের তুলনায় অনেক বেশি। আগের চেয়ে উৎপাদনও হচ্ছে অনেক বেশি। কেবল যে ধান, গম, কার্পাস বেশি করে উৎপন্ন হচ্ছে এমন নয়, কারখানা ও শিল্পজাত বহু জিনিসেরও উৎপাদন খুব বেশি বেড়েছে। আগেকার তুলনায় প্রত্যেক ভারতীয়ের আরামে থাকার উপকরণ বেড়েছে, জীবিকার সুযোগ সুবিধা

বেড়েছে, মুশকিল আসানের ব্যবস্থাও বেড়ে গেছে। এগুলি যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন, সে কথা সকলেই স্বীকার করবেন। এইসব পরিবর্তনের ফলে দেশের লোকে অন্তত দু মুঠো খেতে পাচ্ছে।

এইসব পরিবর্তনের বেশির ভাগ গাছের বেড়ে ওঠার সঙ্গে তুলনীয়। শরীরের বাড় বলতে যা বোঝায়, এ যেন তেমনি। কিন্তু ডিম ফেটে বাচ্চা বেরুনো কিংবা গুটি থেকে প্রজাপতি হওয়ার মতো, রূপান্তরও যে না ঘটছে এমন নয়। কখনো কখনো দেখা যায় মানুষের অদলবদল এতটা ঘটেছে যে তাকে চিনে নেওয়াই শক্ত। কেবল হাবভাবে নয় অন্তরে অন্তরেও লোকে কেমন যেন আমূল পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ কি না তার ব্যক্তিত্বই যায় বদলে। পোশাক পরিচ্ছদ কিংবা খানাপিনার উপর এই পরিবর্তন নির্ভর করেনা। সুতরাং ভারতের লোকেরা কেমন কাপড়চোপড় পরে, কীরকম খায়দায়, তা নিয়ে মাথা আরো বেশি না ঘামিয়ে একবার দেখা যাক ভারতে বড় রকমের পরিবর্তন কী ঘটেছে? এই যে ব্যক্তিবিশেষের ব্যক্তিত্বের মধ্যেই পরিবর্তনের কথা এইমাত্র বললাম, দেশের ব্যক্তিত্বেও কি সেইরকম কোনো পরিবর্তন ঘটেছে? এই প্রশ্নটি বিচার হয়ে গেলে পর, তুমি নিজেই হয়তো বলতে পারবে, পরিবর্তনের ফলে কি সুফল ফলেছে? মত নেবার বেলা হয়তো দেখবে, এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। সেটাও কিন্তু তখনকার দিনের তুলনায় একটি মস্ত পরিবর্তন।

২১

নূতন দেশের নূতন মানুষ
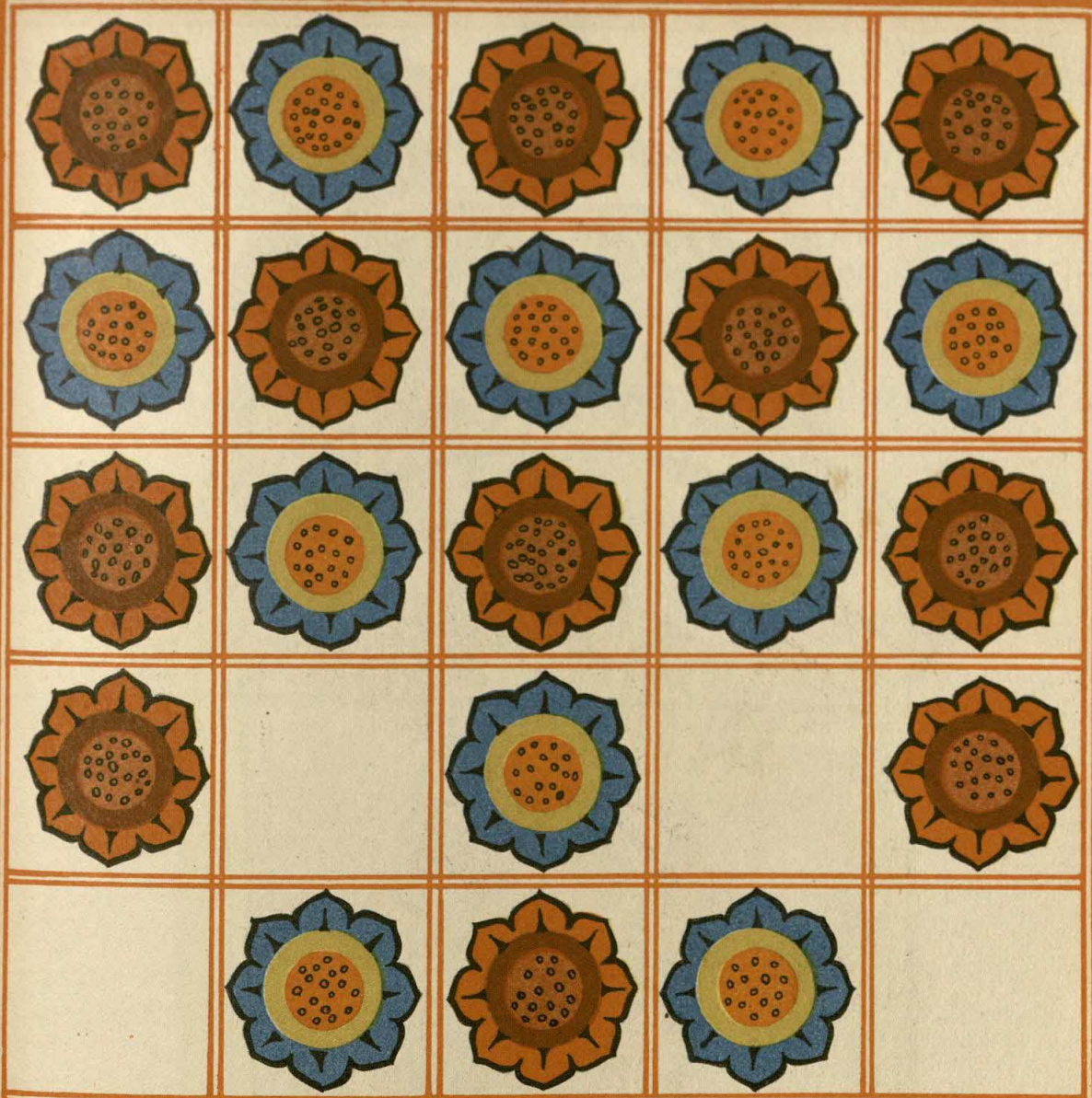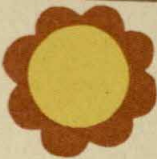
গরীব কোনো চাষী বা কাঠুরে দেবদেবীর কাছে কিংবা রাজাবাদশার কাছে ধনদৌলত ভিক্ষা করে হঠাৎ বড়লোক হয়ে গেল—এরকম বহু গল্প বা উপকথা তুমি নিশ্চয় পড়ে থাকবে। ধনদৌলতের আকাঙ্খা থেকেই এসব কাহিনীর

উৎপত্তি। ভারতে বেশির ভাগ লোকের বিশ্বাস দুঃখ দারিদ্র্য রোগতাপ—সবই বিধির বিধান। কপালে যদি এসব লেখা থাকে তাহলে মানুষের সাধ্য কি খণ্ডাবে? মানুষ তাই বিনা বাক্যব্যয়ে এ সবকে অদৃষ্টের ফের বলে মেনে নেয়। আজকের দিনে কিন্তু দেশের লোক বুঝে নিয়েছে, দারিদ্র্য বিধির বিধান নয়, মানুষেরই সৃষ্টি। তারা এটাও বুঝেছে যে, চেষ্টা করলে দারিদ্র্যের কবল থেকে মুক্তিলাভ করা সম্ভব। এই নূতন বোধটুকু মানুষের চিন্তাধারায় একটা বিরাট পরিবর্তন এনে দিয়েছে। ভারতের নূতন ব্যক্তিত্ব বলতে আমি তো এই বুঝি।

'জী হুজুর', 'মা-বাপ', 'সরকার', 'সাহেব', 'স্বামী', 'প্রভু', 'দোহাই'—এইসব কথা কি কখনো শুনেছ? তোমাদের বাবা মাকে জিজ্ঞাসা করে দেখবে এককালে তাঁরা এইসব কথা শুনতে অভ্যস্ত ছিলেন। উপরওয়ালা কিংবা ক্ষমতাশালী পদস্থ লোকেদের এক কালে এইভাবে সম্বোধন করার রেওয়াজ ছিল। চাষী মজুররা মাথা তুলে কথা বলতে পারতনা, হেঁট মাথায়, চোখ নিচে নাবিয়ে, হাতজোড় করে তারা জমিদার কিংবা মালিকের সঙ্গে কথা কইত। সরকারী অপিসে মোটা মাইনেতে যারা উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিল, গরীব কেরাণী অথবা পিওনদের কাছে তারা ছিল যেন দেবতা। উপরওয়ালারা অধস্তন কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলত যেন ধমক দিয়ে। একজন ভদ্রলোক আরেকজন ভদ্রলোকের সঙ্গে যেভাবে কথা বলে থাকেন, সেভাবে তারা কথা বলতইনা, তারা জানত কেবল হুকুম জারি করতে। 'এটা করুন, সেটা করুন', 'আরে মশাই এত দেরি করছেন কেন? চট করে কাজটা শেষ করে আনতে কি হয়?'—এইরকম ছিল তাদের কথা বলার ধরন। এরকম আচরণ যে সাধারণ-ভাবেও ভদ্রতাসংগত নয়, এ ধারণা না ছিল উপরওয়ালার না নীচুওয়ালার। মানুষ মানুষকে হেয় জ্ঞান করে পার পেয়ে যেত। কেউ আপত্তি করতনা। রাগ করা তো দূরের কথা। যদি কোনো বড়লোক বা প্রতিপত্তিশীল লোক এমন আচরণ না করে, গরীবদুঃখীদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করতেন, তাহলে লোকে তাঁকে এমনি আশ্চর্যভাবে অসাধারণ মনে করত যে, তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে তাঁর নামে প্রশস্তি রচনা করত।

বহুশত বৎসর ধরে এই অবস্থা ছিল দেশের। এখন মস্ত একটা অদল বদল

ঘটেছে। আজকাল গরীব হোক ধনী হোক, ক্ষমতা থাক বা না থাক, প্রত্যেক ভারতীয় মনে করে, সে কারো চেয়ে কম নয়। এ এক বিরাট পরিবর্তন। সকল মানুষই সমান—এই বোধ জাগবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বুঝতে পারে, তারও নিজস্ব কিছু অধিকার আছে। তখন তারা আগে যেসব জিনিষ চাইবার কথা ভাবতেও পারতনা, সেইসব জিনিসের জন্য দাবী জানায়, কারণ তারা জানে সেসব জিনিষে তাদের ন্যায্য অধিকার আছে। দাবী যদি সহজে না মেটে, তারা তা আদায় করার জন্য আজকাল লড়াই আন্দোলন করতেও প্রস্তুত। যেহেতু সরকার স্বয়ং চান যে, লোকের ন্যায্য দাবী মেনে নিতে হবে, সরকার সচরাচর আন্দোলনকারীদের পক্ষেই থাকেন। সুতরাং লড়াই করা সহজ হয়। আজকাল পথেঘাটে বেরোলেই দেখা যায় ধর্মঘট, আন্দোলন, ঘেরাও, ধরনা, প্রতিবাদ জানাবার জন্য মিছিল কিংবা জমায়েত। এসব থেকে বহু গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয় সত্য, কিন্তু মানুষ যে তার ন্যায্য প্রাপ্য আদায় করে নিতে আর ভয় পায়না—এটা তার প্রমাণ।

প্রবীণ লোকেরা অনেক সময় 'পুরানা জমানা' নিয়ে উচ্ছ্বাস করে থাকেন। বলেন তখন নাকি খাবার জিনিসে ভেজাল থাকত না, সব কিছুর দাম সস্তা ছিল, ছেলেমেয়েরা বড়দের হুকুম মেনে চলত, মানুষের স্বভাব চরিত্র ভালো ছিল—অর্থাৎ কি না সব দিক থেকেই দিন কাল ভালো ছিল। জানোই তো বুড়োরা একটু গঞ্জনা করতে ভালোবাসেন—এ তাঁদের স্বভাব। তার একটা কারণ অবশ্য এই যে, তরুণ বয়সে অনেক কিছু সহজেই ভালো লাগে। সেই তরুণেরা যখন বৃদ্ধ হয়, তারা মনে করে সেকালের অর্থাৎ তাদের তরুণ বয়সের, সবকিছুই ছিল ভালো। এটা বাস্তবিক সত্য কিনা—সে তোমাদেরই বিচার করে দেখতে হবে।

সে যাই হোক না কেন, তার নিজের কাছে সাধারণ মানুষের মূল্য অনেকখানি বেড়ে গেছে। যে সরকার রাজ্য শাসন করে, সে তো তারই ভোটের জোরে। সরকার যেসব সিদ্ধান্ত নেন—সেতো তারই মত নিয়ে। তার গাঁয়ের রাস্তা মেরামতীতে দেরি হয় কিংবা অন্য কিছু ভুলচুক কিংবা অসুবিধা ঘটলে, সে মাঝে মাঝে অনুযোগ করতে পারে, কিন্তু মোটামুটিভাবে বলা চলে, আগের জমানার সাধারণ মানুষের তুলনায় এখনকার সমাজে তার স্থান বেশ উঁচু, সে এখন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে। ইংরেজ আমলে যেসব ঘটনা ঘটত, তার মধ্যে তার কোনো হাত থাকত না, নানারকম ব্যবস্থা উপরওয়ালারা তার উপর চাপিয়ে দিত।

এখন সে নিজেই অনেক কিছু করছে, অনেক বিষয়ে তার মতামত দিতে পারছে। সেসব মতামত যে খেলনা নয়, তার যে দাম আছে – সে কথা সে খুব ভালো করেই জানে।

মাত্র পঁচিশ বছর আগেও যন্ত্রপাতি কিংবা প্রযুক্তির যে কোনো ব্যাপারে, আমরা পশ্চিমের মুখাপেক্ষী ছিলাম। লোকে তখন ধরেই নিত যে, আমরা দেশ হিসাবে অনুন্নত, সুতরাং কোনো গুরুতর সমস্যা সমাধানে অপারগ। বিদেশ থেকে যা কিছু রপ্তানী হয়ে আসত, বলা হত দিশি জিনিস তার ধারেকাছে লাগেনা। বিদেশ থেকে যেসব বিশেষজ্ঞ ও উপদেষ্টা গোড়ায় আমাদের সহায়তা করার জন্য আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন, কারখানা, ল্যাবরেটরি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কাজে--তাঁরা একে একে চলে গেছেন। আমরা এখন নিজের পায়ে কেবল যে দাঁড়াতে শিখেছি এমন নয়, অন্য যেসব দেশ পিছিয়ে পড়ে আছে তাদেরকেও এগিয়ে যাবার তালিম দিতে পারি। দিচ্ছিও। আজকের দিনে এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক দেশে, আমাদের দেশ থেকে যেমন বিশেষজ্ঞরা যাচ্ছেন, তেমনি যাচ্ছে ভারতে প্রস্তুত নানা জিনিস। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় এসব দেশে ভারতীয় ট্রাক-এর প্রচুর চাহিদা। রাষ্ট্রসংঘ বেশকিছু ভারতীয়কে অন্যান্য দেশে বিশেষজ্ঞ রূপে নিয়োগ করেছেন। এমন কি পশ্চিমের কোনো কোনো শিল্পোন্নত দেশেও, ভারতীয়েরা নিজেদের মূলধনে কলকারখানা পত্তন করেছে।

ভারতীয়েরা ইতিপূর্বে কখনো বিদেশে কাজকর্ম যে করেনি—এমন নয়। ব্রিটিশ রাজত্বকালেও তারা দলে দলে বিদেশ গেছে—কিন্তু কুলি হয়ে। তোমরা হয়তো জানোনা, সেকালে ভারতীয় কুলিদের পরিশ্রমে ইংরেজরা পূর্ব আফ্রিকায় একটি রেল-লাইন পেতেছিল। আজকের দিনেও আমরা কোনো কোনো দেশে রেলপথে চলাচলের ব্যবস্থা করে থাকি—কিন্তু কুলি হিসাবে আর কাজ করিনা, কাজকরি বিশেষজ্ঞ অথবা প্রযুক্তি বিশারদ হিসাবে। এ কাজে প্রয়োজনীয় যাবতীয় যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম—রেল লাইন থেকে শুরু করে ইঞ্জিন পর্যন্ত আজকাল ভারতে তৈরি হয়ে বিদেশে যায়। এমনটা যে হতে পেরেছে এতে যদি সাধারণ ভারতীয়ের বুক গর্বে ফুলে ওঠে, তাহলে আর বিচিত্র কি !

ইংরেজরা যখন এদেশের প্রভু ছিল, সামরিক কিংবা অসামরিক বিভাগের সর্বোচ্চ পদে কোনো ভারতীয়কে নিযুক্ত করা হতনা। আজ এ সমস্ত পদে কেবল ভারতীয়েরাই অধিষ্ঠিত আছেন এবং প্রতিদিন প্রমাণ করছেন, এসব কাজে তাঁরা কারো চেয়ে কম নন। ভারতের সেনাবাহিনী সংখ্যায় পৃথিবীর বৃহত্তম চারটির অন্যতম। যুদ্ধকুশলতায় তারা কারো চাইতে খাটো নয়।

এই সমস্ত ব্যাপার থেকে ভারতীয়দের আত্মবিশ্বাস অনেকখানি বেড়ে গিয়েছে। তাদের এই আত্মপ্রত্যয়ের ভিত্তি হল নানা ক্ষেত্রে তাদের কৃতিত্ব। আজ তাই জগৎসভায় ভারত তার নিজস্ব আসন নিতে পেরেছে। ভারতের কণ্ঠ আর নীরব নয়, তার কথায় পৃথিবীর লোক এখন শ্রদ্ধাভরে কান দেয়। আমরা গরীব হতে পারি, কিন্তু মাথা গুণতিতে আমাদের সংখ্যা এত বেশি যে, আর্থিক দিক থেকেও ভারত আজ পৃথিবীর সর্বাগ্রবর্তী আটটি দেশের মধ্যে স্থান নিয়েছে।

ভারতের শহরে নগরে গ্রামে, দেশের লোকের মনে আরো একটি বিরাট পরিবর্তন দেখা দিয়েছে—জাত ধর্ম নিয়ে এককালে যে গোঁড়ামি ছিল তা আজকাল ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। সেকালে উচ্চবর্ণের হিন্দু নিম্নবর্ণের হিন্দু কিংবা বিধর্মীর সঙ্গে, কোনো সম্পর্ক রাখতে চাইতনা। দেশের একটা গরিষ্ঠ সংখ্যক গোষ্ঠিকে অস্পৃশ্য বলে অবজ্ঞা করা হত। সংবিধানে ঘোষণা করা হয়েছে যে, অস্পৃশ্যতা বে-আইনী। এখন বহুলোক মেনে নিয়েছে, কোনো মানুষকে অচ্ছুৎ জ্ঞান করা অন্যায় এবং এ প্রথা যত তাড়াতাড়ি বিলুপ্ত হয় ততই ভালো। তবে এখনো কিছু কিছু ছুঁৎমার্গী স্পর্শদোষ এড়িয়ে চলতে চায়। সুখের বিষয় এই ধরনের বিকারগ্রস্ত লোকের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। তাহলেই বুঝতে পারছ, আমাদের সংবিধান কেবল কথার কথা নয়—এমন কথা যা কার্যে পরিণত হয়। জাত ধর্ম নিয়ে মনের সংকীর্ণতা অন্য নানা কারণে লোপ পেতে চলেছে। বাস-এ কিংবা ট্রেনে-এ আজকাল বহু যাত্রীকে যাতায়াত করতে হয়, সুতরাং কে কার পাশে বসল তাই নিয়ে বেশি মাথা ঘামালে আর চলেনা। স্কুল কলেজেও পড়ুয়াদের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। সেখানে তরুণবয়সী ছাত্রছাত্রীরা সর্বদা শিক্ষা পায় যে, মানুষকে হেয়জ্ঞান করা পাপ এবং সাম্য, সততা ও সুবিচারের

উপরেই সভ্য সমাজের প্রতিষ্ঠা। কেবল তাই নয়, তারা আসে ভিন্ন ভিন্ন পরিবার থেকে। তাদের জাতি ধর্ম আলাদা হলে কি হবে, তারা একই ক্লাশে পড়ে, একই মাঠে পরস্পরের বন্ধু হয়ে খেলাধুলো করে।

কেউ তাদের এই মেলামেশায় বাধা দিতে পারেনা, বুড়োরা তো নয়ই। কলকারখানায় জাতিধর্ম নির্বিশেষে, হাতে হাত লাগিয়ে, মজুরদের কাজ না করলেই নয়। পাশের লোকটির জাত কি, ধর্ম কি—এ নিয়ে তারা মাথা ঘামাতে পারেনা।

তাছাড়া নিজেদের বাসভূমি ফেলে, আজকাল বহুলোককে নানা কাজে অন্যত্র যেতে হয়, তাতে চোখও খোলে, মনও খোলে। ক্রিকেট খেলা কিংবা সিনেমা দেখতে গিয়ে, চায়ের দোকানে এক কাপ চা খেতে গিয়ে কত লোকের সংস্পর্শে তাদের আসতে হয়। তখন কি কেউ ভাবতে বসে কে ব্রাহ্মণ, কে হরিজন, কে মুসলমান কেই বা হিন্দু।

২২
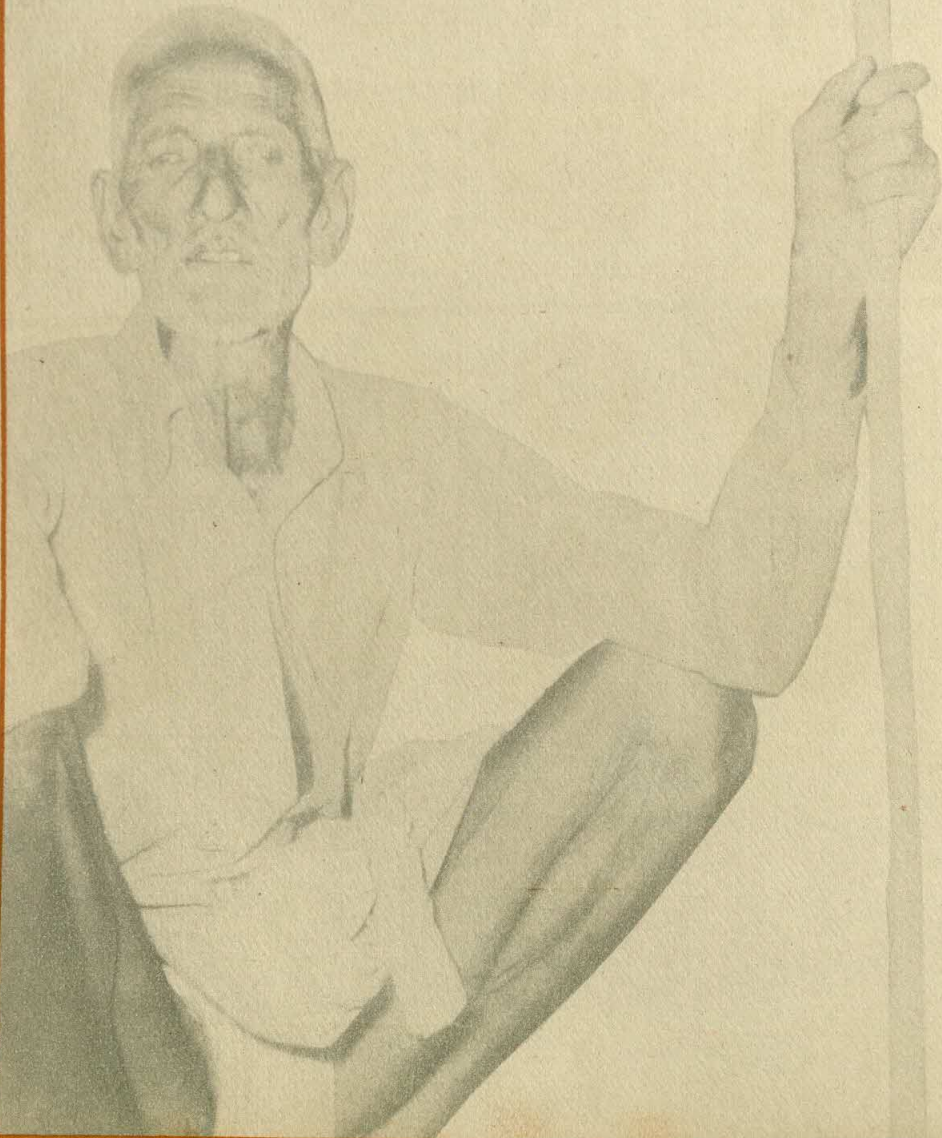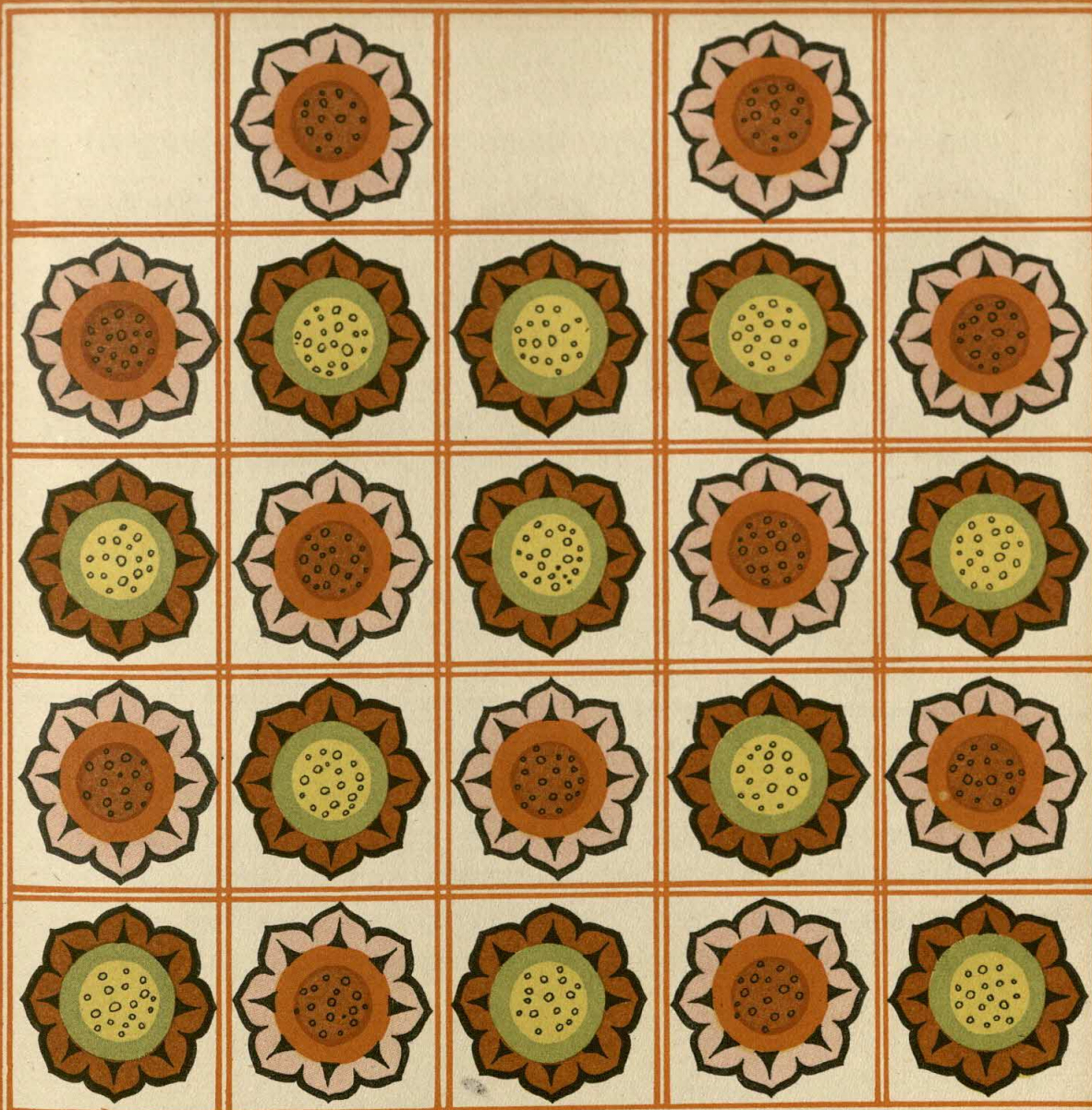
আমাদের গল্প

2+2=3

কেউ যদি ভাবে যে, আধুনিক ভারতের ইতিহাস কেবল বীরত্বের ইতিহাস কিংবা কৃতিত্বের ইতিহাস—তাহলে ভুল হবে। আমাদের সবকিছু আশ্চর্য বা অতুলনীয় নয়, আমরা যা কিছু করেছি সবই যে নিখুঁত তাও নয়। বয়সে আমরা বড় হই বা ছোট হই—সকলেই আমরা জানি ভুল ত্রুটি আমরা অনেক করেছি। অনেক কাজে আমরা হাত লাগিয়েছি, কিন্তু শেষ করতে পারিনি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে যথোচিত চেষ্টাও করিনি। বড়দের অনেকে নানা বিষয় নিয়ে গজগজ করেন, বলেন দিন দিন জিনিসের দাম চড়ছে, বাস-এ ভীষণ ভিড়, ঘেরাও ধর্মঘট লেগেই আছে, ট্রেন সময়মতো আসেনা, ঠেসাঠেসি লোকের ভিড়ে রাস্তায় চলাফেরা দায়, ধুলো ও আবর্জনা চতুর্দিকে, সততা বলতে কিছু নেই, ইত্যাদি ইত্যাদি। একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে থাকবে নিশ্চয়, যারা এরকম

অনুযোগ করে, সব সময় তারা দোষটা অপরের ঘাড়ে চাপায়। অন্যদের উপর যেসব দোষ আরোপ করা হয়, সেসব দোষ যে নিজেরও থাকতে পারে— সে কথাটা তারা বেশ চেপে যায়।

দুধের পুকুরের গল্প নিশ্চয় শুনে থাকবে। এক রাজার শখ হয়েছিল পরদিন সকালে দুধের পুকুরে স্নান করতে। প্রজাদের বলে দেওয়া হল, রাতে তারা যেন রাজার পুকুরে একঘটি করে দুধ ফেলে আসে। তাহলে সকাল হলে দেখা যাবে পুকুর দুধে থৈ থৈ করছে। সকালবেলা দেখা গেল পুকুর কানায় কানায় ভরে গেছে ঠিকই—কিন্তু দুধে নয়, জলে! প্রজাদের প্রত্যেকে ভেবেছিল, সবাই যদি ঘটি ঘটি দুধ ঢালে তাহলে রাতের অন্ধকারে সে যদি দুধের বদলে একঘটি জল ঢালে, কেউ বুঝতেও পারবেনা। তাছাড়া আরো একটি কথা তোমরা শুনেছ, অন্ধকারে বসে তাকে শাপান্ত করার চেয়ে একটা ছোট প্রদীপ জ্বালানো ঢের ভাল।

এই গল্পের তাৎপর্য হল এই যে, কোনো জিনিসই সামান্য নয়, অনেকগুলি সামান্য জিনিস একত্রযুক্ত হয়ে অসামান্য হয়ে উঠতে পারে। আকারে বা পরিমাণে বৃহৎ হলেই, সে জিনিস সব সময় বড় নাও হতে পারে। শহীদ যিনি, দেশের জন্য যিনি প্রাণ উৎসর্গ করেন, তিনি নিঃসন্দেহে মহামানব, কিন্তু একজন মহামানবকে নিয়ে তো একটা মহাদেশ গড়ে উঠতে পারেনা।

আজকের জগতে দেশকে যদি এগিয়ে যেতে হয় তাহলে দেশের

গরিষ্ঠ সংখ্যক লোককে নিয়মনিষ্ঠ হতে হয়, পরিশ্রমী হতে হয়, সংঘবদ্ধ হতে হয়, পরস্পরের ন্যায্য অধিকার মেনে নিয়ে চলতে হয়। এই সব দিক থেকে আমাদের কিছু কিছু ত্রুটি থেকে গেছে।

আমাদের প্রচুর জনবলকে আমরা ঠিক মতো কাজে লাগাতে পারিনি। লোকে এখনো স্বার্থপরের মতো নিজের ও পরিবার পরিজনের দিকটুকুই দেখে। অনেক গরবিনী গৃহকর্ত্রীকে দেখা যায় নিজেদের ঘর পরিপাটি করে ঝাঁটপাট দিয়ে, আবর্জনাটুকু হয় রাস্তার ধারে কিংবা প্রতিবেশীর ঘরের সামনে অম্লান বদনে ফেলে দেন। ভারতের লোকেরা অতিথিবৎসল, গুরুজন কিংবা বয়োজ্যেষ্ঠদের তারা মান্য করে, তারা ধৈর্যশীল ও শান্তিপ্রিয় এসব আশ্চর্য সদগুণের সঙ্গে, পূর্ববর্ণিত কুঅভ্যাসও যে ভারতের চরিত্রগত, একথা অস্বীকার করে লাভ নেই। নিজেদের দোষত্রুটি আমরা যদি নজর না করি, তাহলে সেগুলি শোধরানো যাবে কী উপায়ে? ব্যাধি কোথায় এবং কি রকম সেটুকু বুঝে নিয়ে নিজেদের চিকিৎসা আমাদের নিজেদেরই করতে হবে।

ভুলত্রুটি সবারই হয়। একেবারে নিখুঁৎ হওয়াটাই অস্বাভাবিক। কাজ যতই হাতে নেবে, ভুলের সম্ভাবনাও তত বেশি বাড়বে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভুল হলেও, কোথাও কোথাও ঠিক তো হতেও পারে।

ধরো, পরীক্ষায় তুমি তত ভালো ফল দেখাতে পারলেনা কিংবা পড়ে গিয়ে তোমার হাঁটু ছড়ে গেল অথবা মায়ের কথা অমান্য করার জন্য

তাঁর কাছে তুমি বকুনি খেলে—তার তো মানে এই নয় যে, তুমি বড় হয়ে উঠছ না। আর তোমার বন্ধুটি সুশীল সুবোধ বালক হলেও যে মাথায় তোমাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে এমনও তো হয়না। আমাদের দেশ সম্বন্ধেও ওই একই কথা বলা চলে। যা নিয়ে লোকে অনুযোগ করে তা নিশ্চয় সত্য। তৎসত্ত্বেও ভারতের উন্নতি কিংবা অগ্রগতি থেমে নেই। তাও বলি কেবল বেড়ে ওঠাটাই সবকিছু নয়। ছেলেমানুষ হয়ে থাকাটাও এমন কিছু কম মজার নয়। স্বাধীন ভারতের এই শৈশব পর্বও খুবই একটা রোমাঞ্চকর ব্যাপার — এই পর্বে কত কী যে ঘটছে, কত কী যে আছে করবার মতো!

ভারতের সব ভালো যেমন যথার্থ নয়, ভারতের সবকিছু খারাপ সেটাও তেমন যথার্থ নয়। দুটোই ভুল। কেউ কেউ খুব জোর দিয়ে বলেন যে, ভারতে যা কিছু হবে, সব ভারতীয় হওয়া উচিত। অন্য দেশের জিনিস কিংবা চিন্তাভাবনা আমাদের পক্ষে ভালো হলেও, তাঁরা সেসব নিতে নারাজ। তেমনি অন্য দেশের সমস্যা নিয়েও তাঁরা মাথা ঘামাতে চাননা। বিদেশীর প্রতি রূঢ় আচরণ করে কিংবা বিদেশের সঙ্গে লেনদেন হলে খুব রাগমাগ করে তাঁরা প্রমাণ করতে চান যে তাঁদের দেশপ্রেম কত গভীর।

আবার কেউ কেউ আছেন, যাঁদের ধারণায় ভারতের সবই নিকৃষ্ট এবং ভালো যা কিছু আছে, সবই বিদেশের। এমনকি তাঁদের দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিসও বিদেশ থেকে আমদানী করতে পারলে তাঁরা খুশি হন। ঠিক সেইরকম জিনিসই আজকাল যে ভারতে তৈরী হচ্ছে এ তাঁরা জানতে নারাজ।
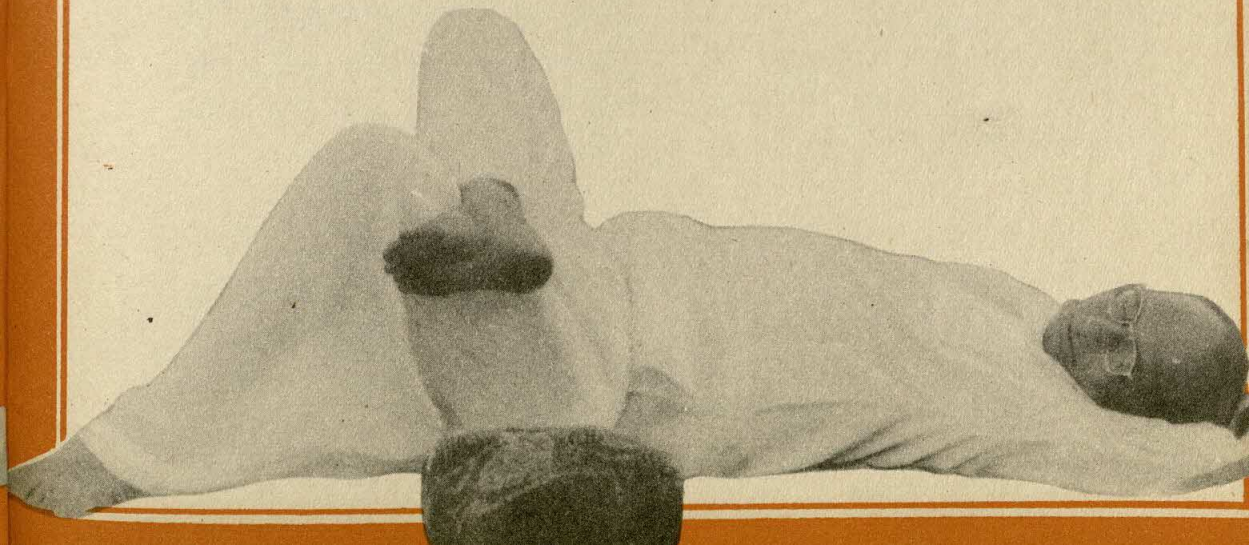
দোকানে যাও, দেখতে পাবে বিদেশের মার্কামারা পাউডার, মাথার তেল, ওষুধবিসুধ এমন কি শীতল পানীয়ও বিক্রি হচ্ছে। কিনছে এমন লোক, যাদের ধারণা বিদেশী মার্কা মানে সবার চেয়ে সরেশ জিনিস। বিদেশজাত সম্ভারের প্রতি এই উৎকট প্রীতির জন্য আমাদের খুব কম দাম দিতে হচ্ছেনা – কিন্তু মতিগতি না বদলানো পর্যন্ত আমরা তো আমদানী রদ করতে পারিনা।

আমাদের বুঝা উচিত এই দুই প্রকার মনোভাবই বিকৃত ও আতিশয্য-দুষ্ট। দেশের বহু গলদের মধ্যে এটা একটা বড় গলদ। এই দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী পথটাই হল আমাদের পক্ষে ঠিক পথ।

যোজনা রূপায়ণে আমাদের যেসব ভুলত্রুটি হয়েছে, তার বেশির ভাগই হল নির্ধারিত সময়পঞ্জী ঠিক ঠিক অনুসরণ করতে না পারা। অনেক কিছু আমরা সময় মতো করে উঠতে পারিনি, কারণ কার্যকালে দেখা গেছে আমাদের সংগতির তুলনায় কাজ ছিল অনেক বড় অথবা কাজ করতে গিয়ে এমন সব সমস্যা এসে গেছে, যা নিরসন করার উপায় আমরা পূর্ব থেকে ভেবে রেখে প্রস্তুত হতে পারিনি। একটা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছবার আগে কিংবা তাকে কার্যে পরিণত করতে গিয়ে, আমরা যতটা সময় নিয়েছি ততটা সময় নষ্ট করা হয়তো উচিত হয়নি। এই কারণে আমরা যত তাড়াতাড়ি শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করে, দেশের লোকেদের কার্যসংস্থান করতে পারব ভেবেছিলাম, তা করতে পারিনি। আমাদের জাতীয় তহবিলে আয়ের অঙ্ক যত সত্বর বাড়াতে পারব বলে ভেবেছিলাম, ততটা পারিনি। কিন্তু এসমস্ত ভুলত্রুটিই কালে শোধরানো যাবে কারণ ব্যাপারটা আর কিছু নয় যতটা কাজ করা হয়েছে তার চেয়ে বেশি কাজ করতে হবে, অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে। তৎপর হতে হবে আবার কাজটা ভালো করেও করতে হবে। আশার কথা এই যে, ঠিক পথটা চিনে নিতে আমরা ভুল করিনি, চলতে চলতে ভুল পথে মোড়ও নিইনি।

আবার সেই জগদ্দল পাথরটার কথা এসে পড়ছে – সেই যে পাথরটা বহু শতাব্দী ধরে আমাদের উন্নতির পথে অনড় অটল হয়ে পড়ে আছে এবং যেটা হটাবার জন্য বেশ কয়েকজন জোয়ানকে একযোগে ঠেলতে হবে, 'হেঁইয়ো' বলে। এসব জোয়ান মরদদের মিলিত শক্তি বেশ কিছুকাল কাজ

না করলে প্রকাণ্ড পাথরটাকে কিছুতেই সরানো নড়ানো যাবেনা। নড়বার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত মনে হয় নড়াচড়ার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছেনা। কিন্তু এতক্ষণ ধরে এতগুলো বলিষ্ঠ হাতের ঠেলা খেয়েছে যে, যে কোনো মুহূর্তে পাথরটাকে

গড়িয়ে পড়তেই হবে। আমাদের দেশের পরিস্থিতিটুকু অনেকটা দেশের বুক থেকে বিপুল বাধার বিরাট পাথরটাকে ঠেলে সরিয়ে দেবার চেষ্টার মতন। পাথরটা এখনো পথ জুড়ে রয়েছে। মনে হয় কোনো দিন বুঝি সরবে নড়বেনা। কিন্তু গত পচিশ বছর ধরে এক নাগাড়ে যে প্রচণ্ড ঠেলাঠেলি হয়েছে, তা তো বৃথা যেতে পারেনা। আর কিছু দিনের মধ্যেই পাথরটা ঠাঁইনড়া হয়ে প্রচণ্ড শব্দে ও প্রচণ্ড গতিতে উৎরাই পথে গড়িয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে।

ইতিপূর্বে বলেছি কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদের বিফলতার কথা,—যেমন ধরো, আমরা দেশের সকল বেকারদের জন্য কর্মসংস্থান করতে পারিনি। এই ব্যাপারটা একটু যদি তলিয়ে দেখা যায়, তাহলে দেশের সমস্যার প্রকৃত চেহারাটুকু বুঝতে পারবে।

২৩
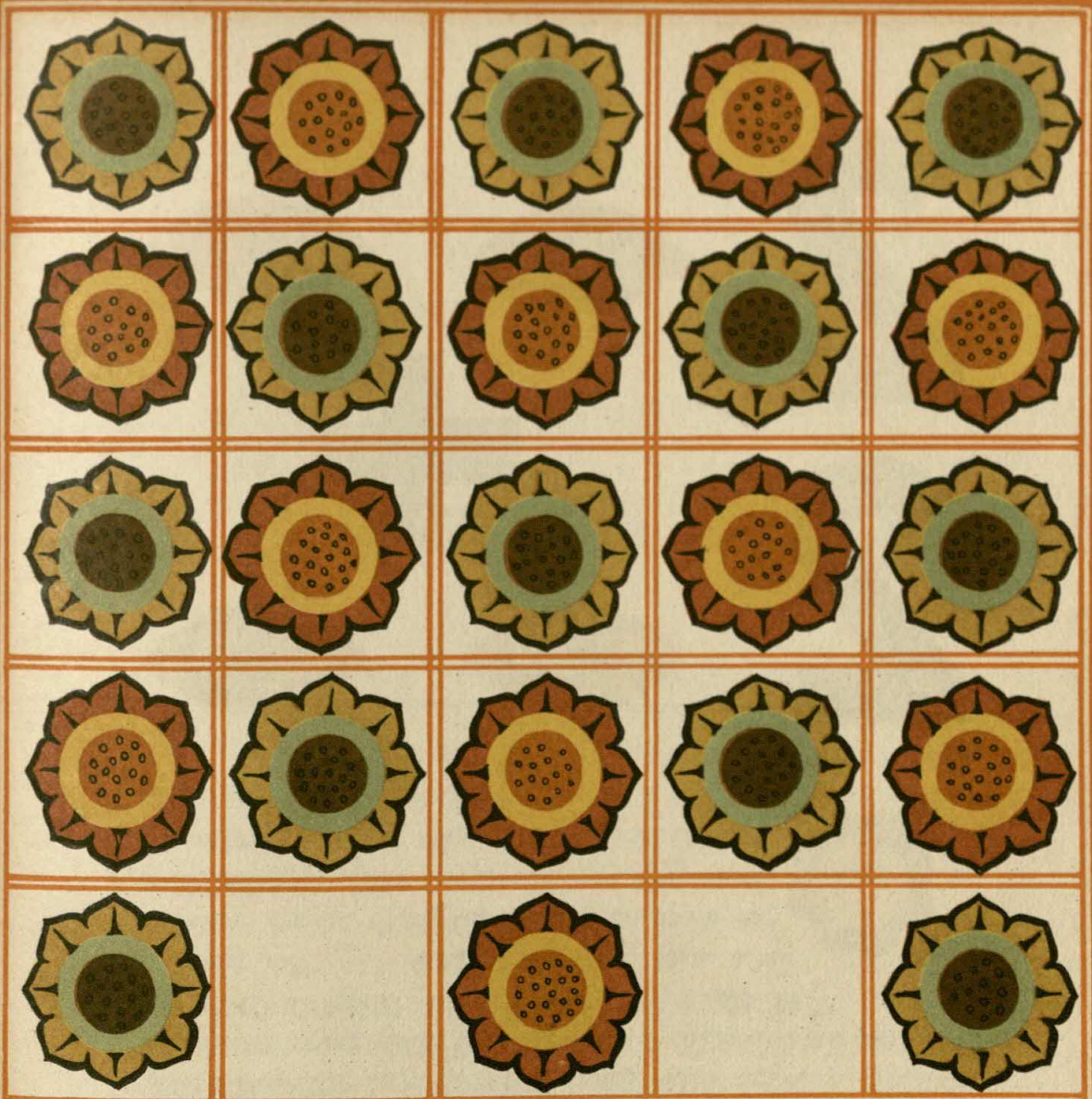
সমস্যার রূপ

ভারতের সমস্যা অনেক। বয়স্ক লোকেরা সারাক্ষণ এইসব সমস্যা নিয়ে এমনভাবে আলাপ আলোচনা করেন যে, মনে হয় বড় না হওয়া পর্যন্ত সমস্যা ঠিক যে কী বুঝতে পারবে না। বুঝতে পারা নিশ্চয় শক্ত। কিন্তু একটা চাল টিপলে ভাত সেদ্ধ হয়েছে কিনা যেমন বুঝা যায়, তেমনি যে কোনো একটা সমস্যা যদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখতে চেষ্টা করো, তাহলে হয়তো অন্যান্য সমস্যার মোটামুটি চেহারাটুকু ধরতে পারবে। তবে একটা কথা, বাইরে থেকে ভারতের সমস্যাগুলি সহজ মনে হলেও, আসলে সেগুলি বেশ জটিল।

বেকার সমস্যার কথাটাই ধরা যাক। তোমরা তো চোখের সামনেই দেখতে পাও ভারতের বহুলোক কাজের ধান্দায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। কাজ তারা চায়, কিন্তু সব সময় পায়না। অথচ বারবার দেশের লোককে বলা হয় 'আরাম হারাম হয়' — দেশের প্রত্যেকটি লোককে কাজে হাত লাগাতে হবে, সবাই

যদি যথাসাধ্য ভালো করে কাজ না করে তাহলে দেশ এগোবে কেমন করে? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাচ্ছ বেকারের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে; কাজ চাইলেও লোকে কাজ পাচ্ছেনা — এমনকি নিজেদের পেশার ক্ষেত্রে বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ররাও হাত গুটিয়ে বসে থাকছেন, বাধ্য হয়ে। এ তো ভারি অদ্ভুত — এক মুখে বলা হচ্ছে 'কাজ করো' 'কাজ করো', আর অন্য মুখ থেকে শোনা যাচ্ছে 'কাজ নেই', 'কাজ নেই'। ব্যাপারটা ঠিকমত বুঝতে গেলে জানতে হবে কার্যসংস্থান কিভাবে হয়।

ধরো, তোমাদের স্কুল থেকে একটি অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নাটকের কুশীলব মাত্র দশ জন, অথচ স্কুলের মোট ছাত্রসংখ্যা পাঁচ শো। পাঁচশো জনের প্রত্যেকে তো সে নাটকে নাবতে পারেনা। সবাইকে যদি এক একটা পার্ট দিতে হয়, তাহলে তো স্কুল থেকে পঞ্চাশটা অভিনয়ের ব্যবস্থা করতে হয়। তা যদি সম্ভবপর হয়, সারা স্কুলের দিক থেকে বেশ একটা মজা হয়। কিন্তু মুশকিলটা কোথায় জানো? আপাতত স্কুলের তহবিলে এমন পয়সা নেই যে, একটার বেশি অভিনয়ের ব্যবস্থা করতে পারে। দেশের সমস্ত বেকারদের কর্ম সংস্থান করতে গিয়েও দেশের একই অবস্থা। এত কাজ দেবার সংগতি আজ ভারতের নেই।
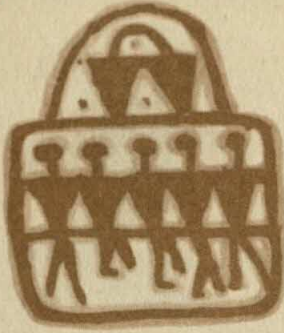
একটা যে কোনো পরিবারের কথা ধরা যাক — বাপ খুড়ো ভাই ভাইপো মিলে মাথাগুণতিতে পরিবারের মোট সংখ্যা কুড়ি। ধরো, এরা চাষবাস করে, পঞ্চাশ একর পরিমাণ জমি নিয়ে এদের খেতখামার, সুতরাং সমস্ত পরিবারের ভরণপোষণ নিয়ে কোনো অসুবিধা নেই। অসুবিধাটা হল এই যে, খেতখামারে কাজ করার জন্য চার জনের বেশি লোক লাগেনা — বাকিরা সবাই খেয়ালখুশি মতো বাড়ির ফাইফরমাশ খাটে। তাদের জন্য কোনো নির্দিষ্ট কাজ নেই। তারা থাকলেও যে পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হয়, না থাকলেও সেই পরিমাণ উৎপন্ন হত। তার অর্থ এই যে, পঞ্চাশ একর একটা খেতখামারে চাষবাস করতে হলে মাত্র চারজনের পুরোপুরি কর্মসংস্থান হয়, তার বেশি হয়না। অর্থাৎ, পরিবারের বাকি ষোলো জন সত্যিই বেকার — তারা কাজ করে এমন কিছু উপার্জন করছে না, যা তাদের নিজেদের কিংবা দেশের পকেটে যাচ্ছে বা উপকারে লাগছে। এখানে 'কাজ' বলতে আমরা বুঝি এমন কোনো কাজ যা নাকি দেশের জন্য কিছু না কিছু ধন উপার্জন করে। কেবল সময় কাটানোর জন্য যে ধরনের কাজ — সেরকম কাজ আমাদের হিসাবে ধরছি না। ধরো ষোলো জন বেকারকে ডেকে বলা হল মাটি খুঁড়ে গর্ত করে আবার সেই গর্ত বুজিয়ে দিতে। তাহলে তাদের এই কাজ থেকে কেউ লাভবান হতনা — যদিচ তাদের খাটুনি কিছু কম হতনা। তেমন হলে বলা যেতনা যে, পরিবারের প্রত্যেকটি লোকই উৎপাদন-মূলক কাজে নিযুক্ত — যদিচ কাজ তারা সবাই করছে। সেই ষোলো জন যদি সেই খেতখামার ছেড়ে অপর কোনো জমিতে চাষবাসে লাগত — তবে বলা যেত তারা কাজের মতো কাজ একটা করছে বটে।

কিন্তু মুশকিল হয়েছে এই যে ভারতে লোক এত বেশি যে, সবাইকে

দেবার মতো এমন প্রচুর জমি এদেশে নেই। তাহলে সেই পরিবারের লোকেরা কাজ পাবে কোথায়? দেশে যদি নানারকম উদ্যোগ বা প্রকল্প গড়ে তোলা যেত, তাদের কেউ কেউ হয়তো রাস্তা বানাবার কাজ করত, কেউ কলকারখানার মজুর হত — কেউ বা স্কুলের শিক্ষক হত। তাহলে কি প্রত্যেকের কর্মসংস্থান করা যেত? সেটা নির্ভর করছে বিশেষ কোনো একটা সময়ে কত উদ্যোগ বা প্রকল্প চালু করা যায় তার উপর। সেটাও কিন্তু দেশের অর্থসামর্থ্যের উপর নির্ভরশীল। বুঝতেই তো পারো, কলকারখানা চালু করা, স্কুল পত্তন করা কিংবা রাস্তা বানানো — প্রত্যেকটি উদ্যোগই ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার। দেশের যদি অগুণতি টাকা থাকত, তাহলে দেশের কাজে লাগে এরকম বহু প্রকল্প গড়ে প্রত্যেক লোকের কর্মসংস্থান করা যেতে পারত কিন্তু আমাদের তো তেমন অর্থসামর্থ্য নেই যে, একই সঙ্গে অনেকগুলি প্রকল্প চালু করি।

দেশের অবস্থার উন্নতি যতদিন না হয় ততদিন যথেষ্ট পরিমাণে কর্ম-সংস্থানও করা সম্ভবপর হবেনা। একটা প্রাচীনপন্থী গ্রামের দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। এ গ্রামে যানবাহন বলতে গোরুর গাড়ি। হেঁটে পথ চলার চেয়ে গোরুর গাড়ি চড়ে যাতায়াত করাটা, এক ধরনের উন্নতি নিশ্চয়। এখন দেখা যাক এই উন্নতির ফলে ক'জন লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। গোড়াতেই আছে ছুতোর মিস্ত্রি — কারণ সে-ই আসলে গাড়ি ও গাড়ির চাকা বানায়। তারপর আছেন গোরুর ডাক্তার, গাড়ির বলদের রোগ হলে তাঁর কাছে যেতে হয় চিকিৎসার জন্য। কামার বলদের খুরের জন্য নাল বানায়, চাকার জন্য লোহার বেড় তৈরি করে। মুদি আছে বলদের খোরাক জোগায়, চাকার ক্যাঁচকোঁচ সারাবার জন্য তেল বেচে। খাটুলি বানাবার জন্য আছে দড়ি পাকিয়ে। তাহলে দেখতে পাচ্ছ,

গোরুর গাড়ির ব্যাপারে পাঁচজন লোকের কার্যসংস্থান হল — কিন্তু নিতান্তই অংশত, অর্থাৎ এমন কাজ তারা পেল যা নিয়ে দিনের সারাক্ষণ কাটাবার দরকার হলনা। এ কাজ থেকে সপরিবারে দিনগুজরানের মতো পয়সারও আমদানী হবেনা। মোটর গাড়ি কিংবা জীপ যদি গোরুর গাড়িকে হটিয়ে দিয়ে গ্রামে আসে, তাহলে কর্মসংস্থানের চেহারাটা কেমন দাঁড়ায় একবার দেখা যাক। যে পাঁচজনের কথা এইমাত্র বললাম — তাদের অবশ্য তাহলে কাজ যাবে, কিন্তু পাঁচটা কাজের জায়গায় কতগুলি কাজের সৃষ্টি হবে, তার একবার হিসাব নেওয়া যাক।

গোরুর গাড়ির মেঠোরাস্তায় তো মোটর চলবেনা, সুতরাং গ্রামে পাকা রাস্তা তৈরির জন্য বেশ কিছু মজুর লাগাতে হবে। গ্রামে পেট্রোল ষ্টেশন বসাতে হবে, মেরামতি কাজের কারখানা খুলতে হবে, মোটর গাড়ির প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের দোকানও একটা চালু করতে হবে। এসব জায়গায় বেশ কিছু লোকের কর্মসংস্থান হবে। তাদের কাউকে কাউকে গাড়ির ইঞ্জিন কিম্বা বিদ্যুৎ যোগাযোগের কিছু কিছু ব্যাপার না জানলে চলবেনা। জানতে হবে কোনো বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনীয়র কিংবা মেকনিক্-এর কাছ থেকে, কোনো প্রতিষ্ঠানে। এই ট্রেনিং স্কুলও তো আগেভাগে তৈরি করে, সবকিছু গোছগাছ করে রাখা দরকার, তা না হলে লোকে তালিম নেবে কোথায়? এইভাবে একটার পর একটা সূত্র ধরে যদি যেতে পারো, তবে দেখবে একটি মোটর ও একটা জীপ পাঁচখানা কাজের জায়গায় বহুগুণ কর্মসংস্থানের কারণ হতে পারে।

পশ্চিমে প্রথম যখন মোটর গাড়ি চালু হল, ঘোড়াগাড়ির মালিকদের সে কী রাগ! তারা বলল নিশ্চয় এবার তাদের মুখের রুটিটুকু কেড়ে নেওয়া হবে। প্রথম প্রথম ঘোরতর আন্দোলন ও প্রতিবাদ হল, পরে দেখা গেল যত লোকের মুখে ঘোড়াগাড়ি রুটি জোগাত, তার চেয়ে অনেক বেশি কর্মসংস্থান হল মোটর গাড়ির কল্যাণে।

বেকার সমস্যা আমাদের একমাত্র সমস্যা নিশ্চয়ই নয়। এই সমস্যার কথাটা তুললাম এই জন্য, যাতে তোমরা বুঝতে পারো একটি বিশেষ সমস্যার সমাধান করতে হলে কত শত কথা ভাবতে হয়।
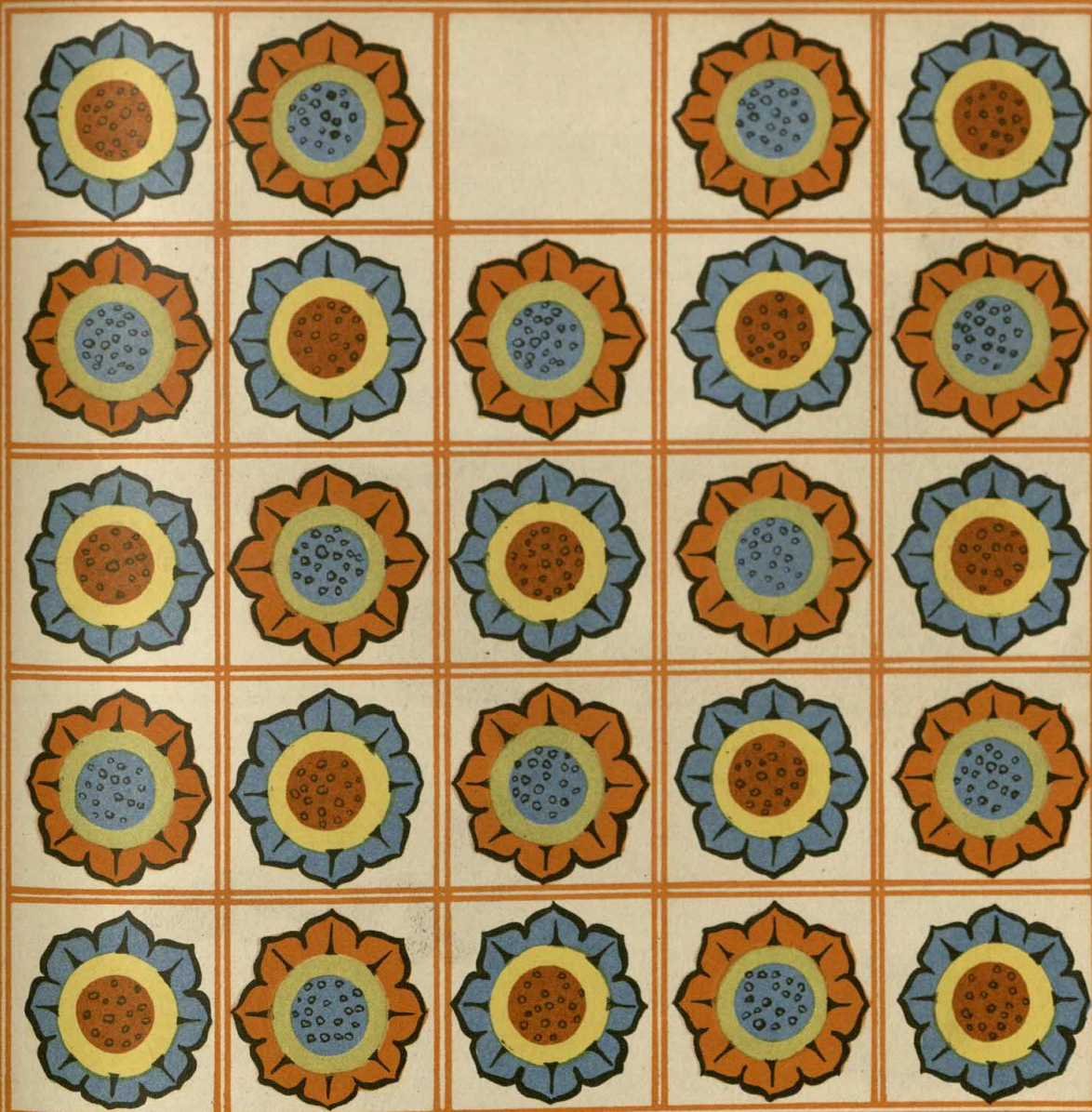
২৪

আশ্চর্য দেশের ছবি

হাতে তোমার তুলি দিয়ে একটি বিরাট চিত্রপটের সামনে তোমায় যেন দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল। বলা হল তুলিতে জাদু আছে, এই তুলি দিয়ে তুমি যা আঁকবে সে হবে এক অতি আশ্চর্য দেশের ছবি। তোমার সঙ্গে সঙ্গে দেশের আরও লক্ষ লক্ষ ছেলে ওই একই চিত্রপটের বিশেষ বিশেষ জায়গায় ছবি আঁকবে। তাদের হাতেও জাদুর তুলি। তুমি এই ছবি আঁকার খেলায় যোগ দেবে তো? না কি বিরাট চিত্রপটটা শূন্য দেখে, তুলি ফেলে দিয়ে আগের থেকে আঁকা অন্যদের কোনো ছবি দেখতে চলে যাবে? অন্যের আঁকা ছবিটা হয়তো সুন্দর দেখতে, যিনি এঁকেছেন তাঁর হয়তো পাকা হাত। তা বলে নিজের

হাতে আঁকতে পারার কত মজা — ছবি নাই বা হল অন্যের আঁকা ছবির মতো নিখুঁত। এবার তুমি যদি তুলিটা আবার হাতে তুলে নাও, তবে বলব বাহাদুর ছেলে। কারণ ওই বিরাট ও শূন্য চিত্রপটেই আগামী দিনের ভারতের ছবি আঁকা হবে। তোমার মতো আর সব ভারতীয়ের হাতে জাদুর তুলি কারণ ছবিটা ভারতীয়দেরই আঁকতে হবে।

এই যে চিত্রপট—এর উপর ভারতীয়দের আঁকা ছবিই সবচেয়ে খুলবে ভালো। অন্যেরা হাত লাগাতে যদি চায়ও—তাদের তুলির রঙ তোমার জাদুর তুলির রঙের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠবেনা। গোড়ায় তোমায় যে ভারতীয়ত্বের কথা বলেছি, সেই ভারতীয়ত্বই হল তোমার হাতের জাদুর তুলি। দেশ-জোড়া চিত্রপটে যখন এই তুলির মুখ থেকে রঙ লাগে, তখন রঙের জলুস যেন আপনা থেকে বেড়ে যায়।

তোমার মধ্যে ভালো যা কিছু আছে, যা কিছু তুমি বিশ্বকে দিতে চাও—সে তোমায় এই দেশের মাটিতে দাঁড়িয়েই দিতে হবে, কারণ দেশ তোমার ও তুমি দেশের। নিজের দেশ নিজের ঘরবাড়ির মতো—নিজের দেশে যেমন নিজের মতো করে থাকতে পারো, পরের দেশে তেমনটা কখনো সম্ভব হয়না। শুরুতেই তো তোমায় বলেছি নিজের ঘর এত আপন হয় এইজন্য যে সে ঘরে আপনজনেরা থাকে। তুমি তাদের চেনো, ওরা তোমায় চেনে। মুখের কথা না খসাতেই তারা বুঝতে পারে তুমি কি বলতে চাও। একটু নিস্‌পিস্‌ করতেই তারা জানে কী কাজে তোমার হাত দেবার ইচ্ছা। পাশ করা নার্স হয়তো ভালো জানে শিশুকে কিভাবে স্নান দিতে হয়, কিন্তু শিশু মার হাতেই স্নান করতে ভালোবাসে। তেমনি তুমি ভারতীয় বলে, তোমার হাতের সেবা পেলেই দেশ বেশি খুশি হয়।

এ দেশ যেন আশ্চর্য সুন্দর দেশ হয়, যেন শক্তিমান হয়, সুখে ও আনন্দে পরিপূর্ণ হয়—এমনটা কোন ভারতীয় না চায়? কিন্তু তেমনটা ঘটিয়ে তোলা, এক বিরাট কাজ এবং খুবই কঠিন কাজ। সে তো তুমি ইতিমধ্যে বুঝতে পেরে থাকবে। গত পঁচিশ বছর ধরে আমরা ক্রমাগত চেষ্টা করে চলেছি, আমাদের কল্পিত আশ্চর্য দেশটিকে সত্য করে তুলতে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে

আমরা সফল হয়েছি, কোনো ক্ষেত্রে হতে পারিনি। মোটামুটিভাবে বলা চলে প্রথম পরীক্ষাটা আমরা পাশ করেছি। কিন্তু এ তো কেবল সামান্য ক্লাশের পরীক্ষা, সত্যিকার ফাইনাল পরীক্ষায় এখনো আমরা বসিনি। সেই চরম পরীক্ষার জন্য দেশকে প্রস্তুত হতে হবে।

আমাদের সামনে এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছে পর্বত প্রমাণ সমস্যা। লক্ষ লক্ষ লোকের মুখে এখনো দু'বেলা দু'মুঠো অন্ন ওঠেনা, বহুলোক অর্ধাহারে থাকে, স্বাস্থ্যের উন্নতি এখনো আশানুরূপ ঘটেনি, দারিদ্র্য এখনো দূর করা যায়নি। লক্ষ লক্ষ শিশু এখনো পুষ্টির অভাবে, শিক্ষার অভাবে, ওষুধ ও চিকিৎসার অভাবে ভুগছে। কত লোক বেকার বসে আছে। বাড়িঘর নেই কত লোকের। দেশের সম্পদ এখনো পুরোপুরি উপযোগ করা সম্ভবপর হয়নি। তেমন চেষ্টা হলে জমি থেকে, খনি থেকে, বন থেকে আমরা এখন যে সম্পদ পাই তার অনেক বেশী পাওয়া যেত। দেশের নদী থেকে এখনো আমরা প্রভূত পরিমাণ জলবিদ্যুৎ পেতে পারি। নিত্য প্রয়োজনীয় বহু জিনিস আমরা বহুগুণ বেশি উৎপাদন করে আরো অধিক সংখ্যক দেশের লোকের হাতে পৌঁছে দিতে পারি। আমাদের দেশের ডাক্তারেরা আরো অনেক কিছু শিখে দেশের লোকের সেবা আরো ভালো ভাবে করতে পারতেন। আরো অধিক সংখ্যায় স্কুল, কলেজ, লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি, হাসপাতাল, কলকারখানা আমাদের পত্তন করা উচিত ছিল। চলাচলের জন্য আরো বেশি করে রাস্তাঘাট কিংবা রেলপথ তৈরি করার প্রয়োজন ছিল। এবং এই সমস্ত কাজ পূর্বের তুলনায় আরো অনেক নিপুণভাবে হয়তো আমরা করতে পারতাম। দেশের লোকের কাছ থেকেও অনেক গুণ বেশি কাজ আমরা হয়তো পেতে পারতাম। এ পর্যন্ত যতটুকু যা আমরা করতে পেরেছি তার চেয়ে অনেক বেশি কাজ আমরা হয়তো করতে পারতাম সুশৃঙ্খলায় ও সুবিহিত ভাবে। কত যে কাজ এখনো করতে বাকি আছে! আর সমস্যা? তার তো অন্ত নেই, যেদিকেই তাকাও কোনো না কোনো সমস্যা সমাধানের অপেক্ষায় বসে আছে।

এসব সমস্যা বহুকাল ধরেই আছে। এদের হাত থেকে আমাদের নিস্তার নেই। মাত্র পঁচিশ বছর আগে স্বাধীন হবার পর, এসব সমস্যার মোকাবেলা করার মতো ক্ষমতা এল আমাদের হাতে। যদি একশো বছর আগে আমরা
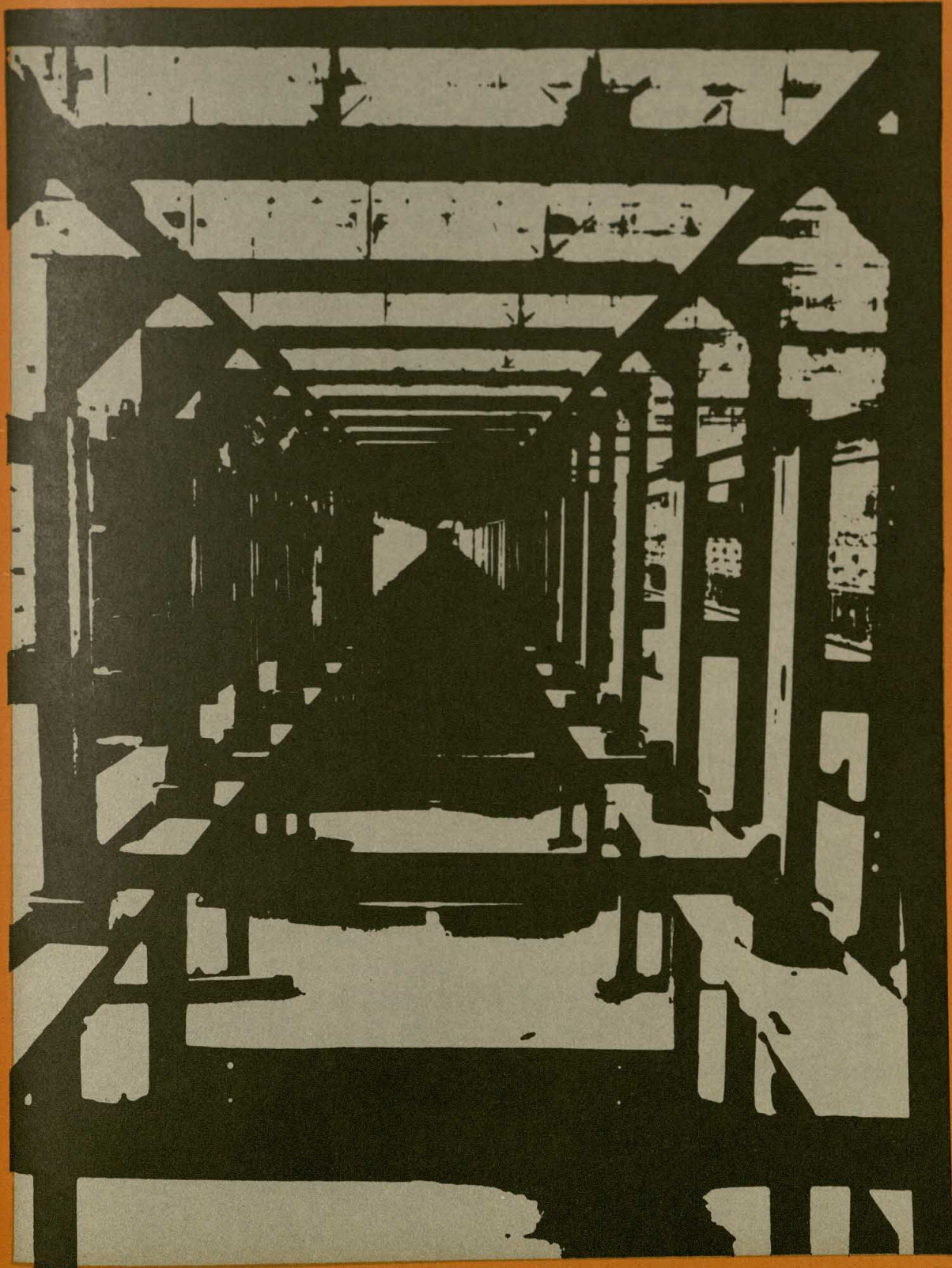
স্বাধীন হতাম, তাহলে সেই তখন থেকে সমাধানের চেষ্টা শুরু করা যেত। চেষ্টা শুরু করতে বিলম্ব হয়েছে সত্য, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সমাধানের বহু হাতিয়ার এখন আমাদের আয়ত্তে এসে গেছে। এখন দরকার এই নানা ধরনের অস্ত্রশস্ত্র থেকে ব্রহ্মাস্ত্রটুকু বেছে নেওয়া এবং যথাসময়ে যথাস্থানে তার প্রয়োগ করা। আমরা যে সময়ে বাস করছি সে সময়টা হল বিংশ শতাব্দী। একালের মানুষ বিজ্ঞানের অগ্রগতির সুযোগ নিয়ে কত আশ্চর্য ব্যাপার ঘটাচ্ছে, যা দৈনন্দিন জীবনযাপনের প্রয়োজনে এসে মানুষের বহু উপকারে লাগছে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে নব নব আবিষ্কারের ফলে, বহু মারাত্মক ব্যাধি অতি সহজে নিরাময় হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। আগে যেসব অসুখে মৃত্যু হতে পারত, আজকাল তা অতি সাধারণ পেটের অসুখের মতো সহজে সারানো যাচ্ছে। সূর্য কিংবা অন্য পরমাণুর তেজ ও শক্তিকে বাগ মানিয়ে মানুষ নানা কাজে প্রয়োগ করছে। কৃষি বিজ্ঞানীরা খাদ্যশস্য ও গাছের বীজকে দিয়ে অঘটন ঘটাচ্ছেন। ঘরবাড়ি, কলকারখানা, এরোপ্লেন, জাহাজ, এমন কি বড় বড় শহরের অতি আশ্চর্য সব নূতন ধরনের পরিকল্পনার নকশা প্রস্তুত করছেন আধুনিক স্থপতিরা। লোকেদের আহার ও পুষ্টি বিধানের জন্য নিত্য নূতন সহজ পন্থার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। এই সেদিন পর্যন্ত ট্রানজিস্টারকে মনে করা হত যেন দৈবী কোনো যন্ত্র — আজ তা ঘুরছে লোকেদের হাতে হাতে। আমাদের হাজারো সমস্যা সমাধানের জন্য নববিজ্ঞানের জগৎ যেন হাজারো দরজা খুলে দিয়েছে।

আমরা আজ এদেশে যা করতে চাইছি, বহুদেশ তা ইতিপূর্বেই করতে পেরেছে। বিলম্বে আরম্ভ করার একটা যে সুবিধা আমরা পেয়েছি তাহল এই যে, অপরের অভিজ্ঞতার সুবিধা যেমন আমরা নিতে পারছি তেমনি অন্যদের ভুলত্রুটিও বর্জন করতে পারছি। দেড়শো বছর আগে ইংলণ্ডের কয়েকটি শহরে প্রথম যখন শ্রম শিল্পের কলকারখানা পত্তন হয়, কিছুকাল পরে শহরগুলির চেহারা দাঁড়ায় কালিঝুলি মাখা ভূতের মতন। নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে শ্রমিকদের তথা অন্য নাগরিকদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। অনেকে বলতে শুরু করে নূতন সমৃদ্ধির চেয়ে আগেকার কালের স্বস্তি ছিল অনেক ভালো। এর কারণটা আর কিছু নয়, শ্রম শিল্প প্রবর্তনে ইংলণ্ড অগ্রণী ছিল বলে, সে দেশের লোক শুরুতে বুঝতে পারেনি তা থেকে কোন কোন সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। ইংলণ্ডকে কী বিভীষিকার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছিল আমরা

জানি বলে, শ্রমশিল্পের কলকারখানা পত্তন করার আগে আমরা সাবধান হতে পারি, যাতে সেই শহর কিংবা অঞ্চলের পরিবেশ নোংরা না হয়, দূষিত না হয়। আরো অন্য সব দেশ আছে, যাদের পূর্ব অভিজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে আমরা পূর্ব থেকে সতর্ক হতে পারি।

তাহলেই বুঝতে পারো, সমস্যা কি কি হতে পারে, কেমন করে কোন পথে তার নিরসন হয়—আমাদের জানা আছে বলে, কাজে হাত দেওয়া আমাদের পক্ষে এখন অনেক সহজতর হয়েছে। আবার তাহলে পূর্ব প্রসঙ্গে ফেরা যাক। তোমার হাতে রয়েছে জাদুর তুলি যেসব কাজ এখনো আমাদের করার অপেক্ষায় আছে, সেগুলি যেন রঙ। ভারতের শূন্য ও বিরাট চিত্রপটে এখন তোমায় রঙ চড়াতে হবে অর্থাৎ কোন কাজ কীভাবে করতে হবে, তার ছবি আঁকতে হবে। একে তোমার জাদুর তুলি, তায় রঙগুলি আধুনিক বিজ্ঞান ও অন্যান্য দেশের পূর্ব অভিজ্ঞতার কল্যাণে সমুজ্জ্বল। বিরাট চিত্রপট, বিচিত্র উজ্জ্বল রঙ—তায় হাতে তোমার জাদুর তুলি, এমন অবস্থায় তুমি কি হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারো?

আজকাল পৃথিবীর সর্বত্র লোকে উন্নতি ও অগ্রগতির কথা বলে। লোকে জিজ্ঞাসা করে, ভারতে এখন অমুক অমুক জিনিস পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে কিনা। আমরাও সর্বদা ভাবি কবে ভারত আমেরিকা, জাপান কিংবা য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের মতো সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠবে। এদেশের অনেক তরুণ এসব দেশে ঘুরে আসার সুযোগ পেয়েছে। দেশে ফিরে এসে তারা অন্যদের কাছে বেশ একটু জাঁক করে বলে যে, সেসব দেশে তারা এমন বহু আশ্চর্য জিনিস দেখে এসেছে, যা না কি ভারতে নেই। সেসব দেশে বিশেষ যন্ত্রের ফুটো দিয়ে পয়সা গলিয়ে দিলে, সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছামতন আহার্য ও পানীয় হাতের কাছে এসে যায়। সেখানে দুমিনিট অন্তর অন্তর বিমান বন্দর থেকে যাত্রীবাহী প্লেন উড়ে যায়, ঘণ্টায় ২০০ কিলোমিটার বেগে দূরপাল্লার ট্রেন যেন উড়িয়ে নিয়ে যায়। রাস্তায় রাস্তায় মোড়ে মোড়ে নিওন বিজ্ঞাপন যেন চোখ ধাঁদিয়ে দেয়। বিনোদন ব্যবস্থাই বা কতরকম! সময় ও শ্রম বাঁচাবার জন্য ঘরে ঘরে কতরকম যন্ত্রপাতি। মস্ত চওড়া রাস্তার আটটি লেন দিয়ে, একই সঙ্গে হুসহুস্ করে ঝকঝকে তকতকে আনকোরা নূতন মডেল-এর লম্বা লম্বা মোটর গাড়ি,

কেমন সুন্দর কাতার দিয়ে চলে। আর সুপার মার্কেটগুলির কথা না বলাই ভালো—একেবারে নানা বিচিত্র পণ্যে ঠাসা, কোনটা ছেড়ে কোনটা কেনা যায়, ভেবে পাওয়া যায়না। বুঝতেই পারো এ সমস্তই আর্থিক সমৃদ্ধির বহিঃপ্রকাশ।

এই অবস্থায় পৌঁছতে ভারতের অনেক দেরি আছে। কিন্তু এই পথে এগিয়ে যাওয়াটাই কি ভারতের পক্ষে শ্রেয়? ভারত কি এই পথেই এগোতে চায়? তোমরা তো জানোই টাকা পয়সা সবকিছু নয়। টাকা দিয়ে অনেক কিছু কিনতে পারলেও মানুষ সব সময় সুখী হতে পারেনা। তার কারণ টাকা দিয়ে অনেক কিছু কেনা যায়, কিন্তু সব কিছু কেনা যায়না। অপর পক্ষে অনেক লোক আছে যারা অল্পে তুষ্ট। যেসব দেশের যত টাকা, সেসব দেশে আত্মহত্যার সংখ্যা তদনুপাতে বেশি। তাদের মধ্যে স্নায়ুর বিকার দেখা যায় সবচেয়ে বেশি, নেশাভাঙ্গ তারাই করে। অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দেশের লোক যেমন সাহসে ভর দিয়ে জীবনযুদ্ধে নামে, তেমন সাহস এদের অনেকের নেই। জীবন তাদের একঘেয়ে মনে হয়। ভীত, বিরক্ত বা ক্লান্ত হয়ে, তারা যেন নিজেদের কাছ থেকেই পালিয়ে যেতে চায়। যা তাদের আছে তা নিয়ে তারা সন্তুষ্ট নয়। তারা সব সময় অন্য কিছু চায়। তাদের দেখে মনে হয় জীবনে তাদের সুখ নেই সন্তোষ নেই, যেন কোনো উদ্দেশ্যই নেই তাদের জীবনে। এইরকম অনেক, বিদেশী তরুণ তরুণী, তোমরা নিশ্চয় এ দেশের শহরে নগরে রাস্তায় রাস্তায় নিরুদ্দেশ ঘুরে বেড়াতে দেখে থাকবে। শীততাপনিয়ন্ত্রিত তাদের অতি আরামের ঘরবাড়ি ছেড়ে, এই লোকগুলি কেন এখানে আসে? তারা নূতন কিছু চায়—এমন কিছু সুখ বা শান্তি, যা তারা নিজেদের দেশে পায়না। সুখ শান্তির সন্ধানে তারা কিন্তু নিজেদের দেশের মতো কিংবা নিজেদের দেশের চেয়েও ধনী, অপর কোনো দেশে যায়না আসে ভারতেরই মতো গরীব দেশে। এ থেকেই বুঝতে পারবে, পাগলের মতো দেশের শক্তি ও সম্পদ ক্রমাগত বাড়িয়ে গেলেই যে লোক সুখী হয় এমন নয়।

পৃথিবীর অগ্রগামী জাতিরা মহাকাশ জয় করেছে কিন্তু নিজেদের মধ্যে যে ভয় রয়েছে, সে তারা জয় করতে পারেনি। যাদের যত শক্তি ও ক্ষমতা, তাদের তত ভয় যে, অন্য কোনো দেশ আবার না বেশি শক্তিশালী ও ক্ষমতাশালী হয়ে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়। সর্বক্ষণ তাদের প্রাণে ভয় যে, এবার বুঝি যুদ্ধ বাধল।
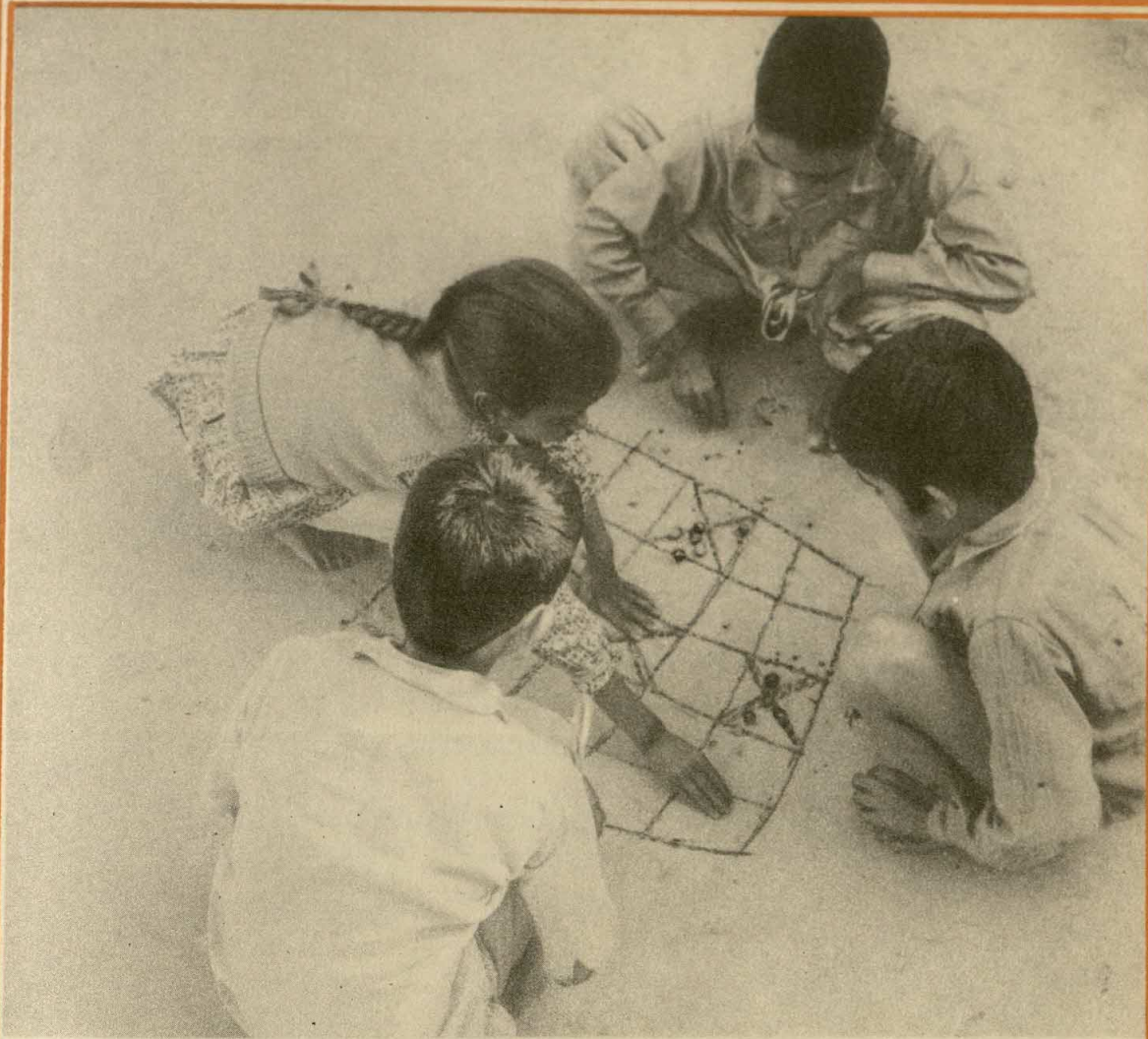
দেশের লোকের এত সব সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করার পরও যদি সারাক্ষণ ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়—তাহলে এই সমৃদ্ধির অর্থ কি? শিশুদের যেসব খেলাধুলা আমোদ প্রমোদ দরকার, এসব দেশে তা তাদের খুঁজে পেতে বা নিজেদেরই বানিয়ে নিতে হয়না। সবকিছু তাদের বাড়ির দরজায় ঢেলে দেওয়া হয়। নাঃ, এই রকম দেশকে মডেল বা আদর্শ মনে করে, সকল বিষয়ে তার অনুকরণ করতে যাওয়া ভারতের পক্ষে কোনো কাজের কথা নয়। তবে ভারতকে নিশ্চয় ততটুকু সমৃদ্ধি অর্জন করতে হবে, যার ফলে দেশের প্রত্যেক লোক যথেষ্ট খেতে পায়, পরতে পায়, থাকবার ঘর পায় ও লেখাপড়ার সুযোগ পায়। এইটুকু

আমরা যদি করে উঠতে পারি, তবেই আমাদের পক্ষে বলা সাজে যে, ধনদৌলতই সব নয়।

ধনদৌলত যদি সবকিছু না হয়, তাহলে এমন কী বস্তু পেলে মানুষ সুখী হয়? এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া সহজ নয়। তবে জবাবে একটা কথা বলা যায় যে, সুখী হবার অন্যতম উপায় হল দেশ ও সমাজের কাছে নিজেকে তৈরি করা এবং তার ফলে দেশ ও সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করা। খেলার মজাটা কোথায় জানো? খেলতে গিয়ে দলের প্রত্যেক খেলোয়াড়কে নিজ নিজ জায়গায় নিজের সমস্ত শক্তি, ক্ষমতা ও কৌশল প্রয়োগ করতে হয়। খেলায় হারজিতটা বড় কথা নয়, দলের সবাই যদি নিজের সবচেয়ে ভালো খেলাটুকু খেলতে পারে, তাহলে সবাই সেই দলের তারিফ করে। সেই জন্যই যে খেলায় অতি সহজে হারজিত হয়, সে খেলায় ততটা মজা নেই যেমন আছে কঠিন ও কষ্টসাধ্য খেলায়। আজকের ভারতকে যদি খেলার মাঠের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তাহলে বলবে, এ মাঠে এবং এ খেলায় সত্যিকার মজা আছে। এ দেশের জীবনযাত্রা এখনো সহজ হয়ে ওঠেনি, এখানকার কঠিন খেলায় মজা আছে।

সেই জন্যই তো বলি, এক অতি আশ্চর্য দেশে, আশ্চর্য সময়ে তোমার জন্ম।

২৫
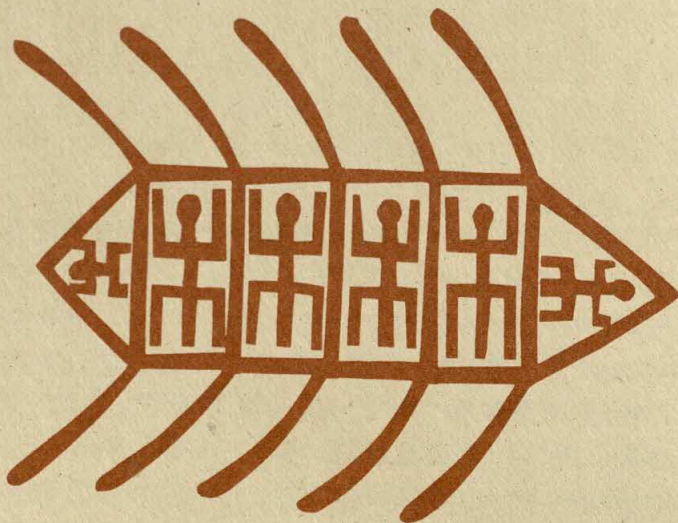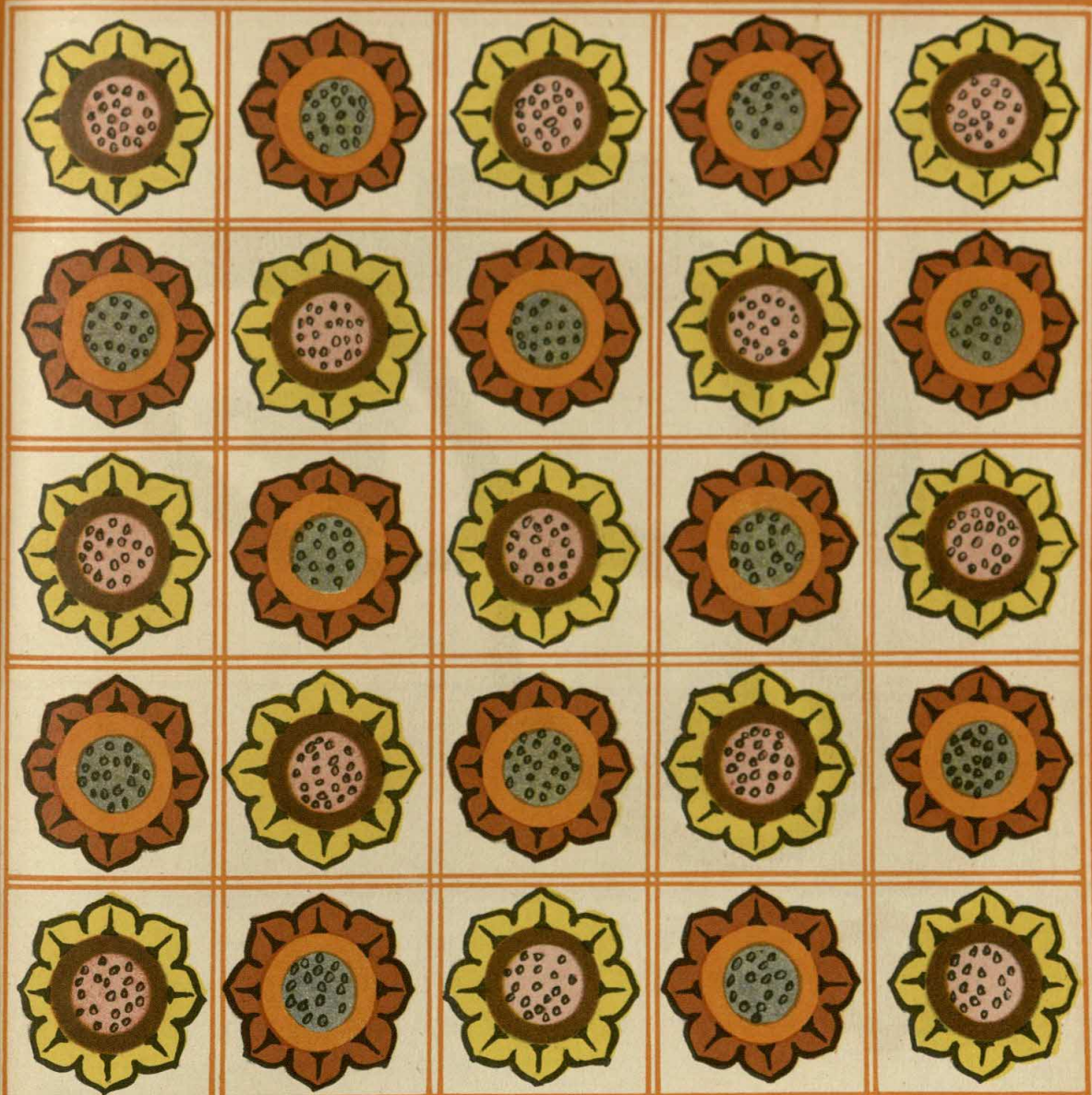
বিশ্বজোড়া চিত্রপট
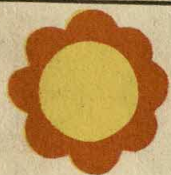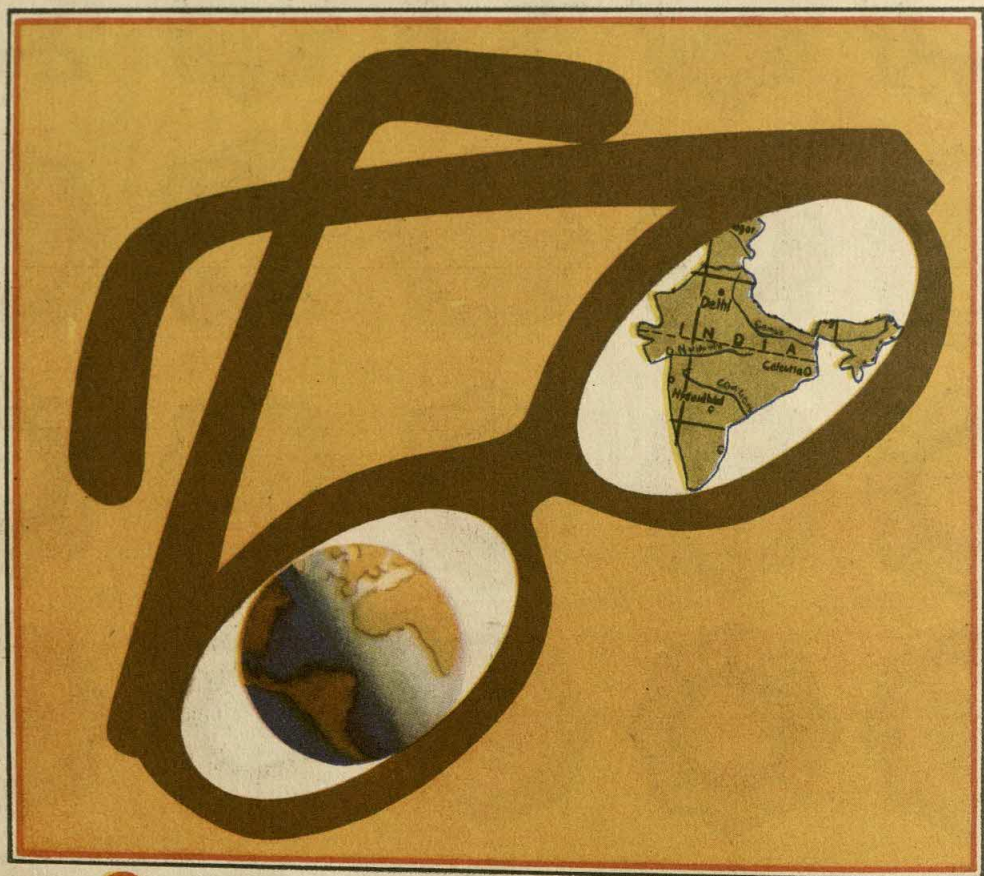
পাতা ওলটাতে ওলটাতে তুমি একেবারে শেষ পাতার কাছাকাছি চলে এসেছ। আমার কথাটাও ফুরোবার মুখে। আর কিছুক্ষণ বাদেই এ বই ফেলে দিয়ে তুমি হয়তো খেলার মাঠে ছুটবে। তার আগে তোমায় একটা কথা বলতে চাই। কথাটা মারবেল গুলির সঙ্গে তোমার পকেটে রেখে দিতে পারো। দেখো, হারিয়ে যেন না যায়, এই গুলি একদিন সোনার গুলিতে পরিণত হতে পারে।

কথাটা এমন কিছু নয়—কথাটা এইমাত্র যে, যত সামান্য কাজেই তুমি হাত লাগাওনা কেন, তার ঢেউ গিয়ে লাগে সারা বিশ্বে। এটা তো চারটি খানি

কথা নয়, এর অর্থ এই যে সমস্ত বিশ্ব তোমার মুখ চেয়ে আছে, তোমার যা কিছু কাজের জন্য তুমি বিশ্বের কাছে দায়ী।
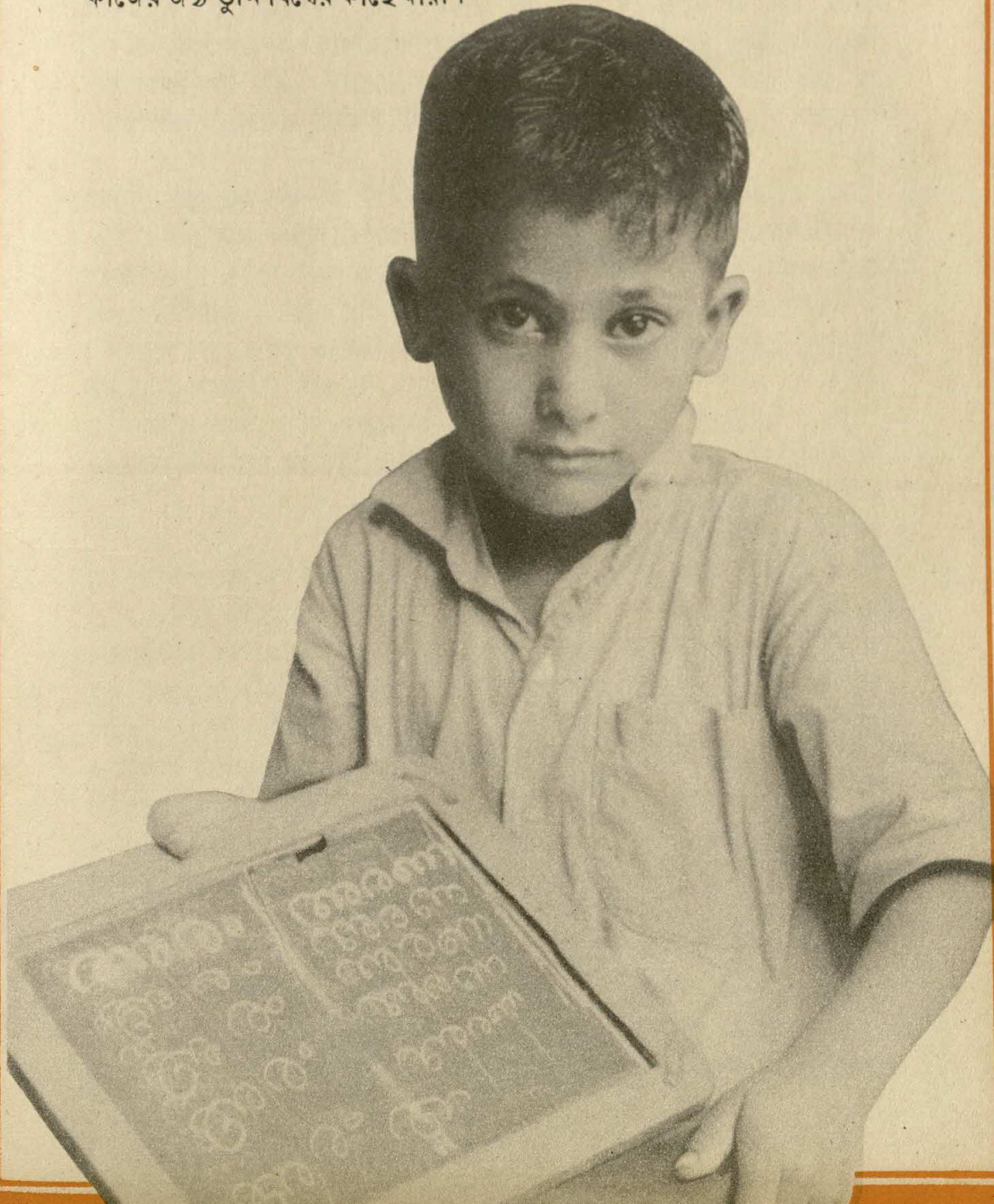
তোমার হাতের জাদুর তুলি দিয়ে তুমি নূতন যুগের ভারতের একটি সুন্দর ছবি আঁকতে লেগেছ। এই ভারতজোড়া চিত্রপটটি তো রাখা হবে বিশ্বজোড়া এক প্রদর্শনীতে। সেখানে থাকবে আর আর সকল দেশেরও ছবি— যা সেই সেই দেশের ছেলেরা এঁকে পাঠিয়েছে। এই বিশ্ব-চিত্রশালায় ভারতের ছবিটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে কিনা—সেই প্রশ্নটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।

মনে রেখো, আমাদের বিরাট দেশের চিত্রপট অন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশের তুলনায় অনেকখানি জায়গা জুড়বে বিশ্বজোড়া প্রদর্শশালার। আমাদের দেশের ছবির সামান্যতম অংশও যদি আমরা উজ্জ্বল করে আঁকতে পারি, সমস্ত বিশ্বের ছবিও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। এমন কথা কেন বলছি জানো? বলেইছি তো, আমাদের দেশ বিশাল দেশ—সারা পৃথিবীতে যত লোক থাকে তার সপ্তমাংশ থাকে এ দেশে। আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও ওসিয়েনিয়াতে মোট যত লোক – আমাদের দেশের লোকসংখ্যা তার চেয়েও বেশি। অতএব ভারতীয় জনসাধারণের জীবনের মান উন্নীত করা মানে হল, পৃথিবীর সপ্তমাংশ লোকের জীবনের মান উন্নয়ন।

কেবল জনসংখ্যা বেশি বলেই, আমাদের কাজ গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে গণ্য হবে এমন নয়। লোকসংখ্যা যাদের কম, সেইরকম ছোট ছোট দেশও সারা পৃথিবীর জীবনে পরিবর্তন আনতে পারে। তার কারণ আজকের পৃথিবী আর আগেকার মতো পৃথিবী নেই—ছোট হয়ে গেছে। পৃথিবী সংকুচিত হয়ে গেছে এমন নয়—মানুষের মনটাই হয়ে গেছে সুদূর প্রসারী। আজ পৃথিবীর লোক যদি চাঁদে পা দিতে পারে, যদি ৩৪,৮০০,০০০ মাইল দূরবর্তী মঙ্গলগ্রহে অভিযান চালাবার সংকল্প করতে পারে, তাহলে তো বুঝতেই পারো, পৃথিবীর এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়া নেহাতই ছেলেখেলা। আজকের দিনে এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের যোগাযোগে, দূরত্ব জিনিসটা কোনো বাধাই হতে পারেনা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়া যায় আজকাল। রেডিও টেলিফোন যোগে এক দেশের লোক পৃথিবীর অন্য যে কোনো দেশের সঙ্গে, যে কোনো সময়ে কথা বলতে পারে। পৃথিবী আজ যেন একটি বিরাট বাসভবনে পরিণত, এবং সেখানে সারা মনুষ্য জাতি একটি পরিবারের মতো বসবাস করছে। আমরা ভারতে খুবই সাহসে ভর দিয়ে খুবই কঠিন

সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছি—দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে। পৃথিবীর কোথাও যদি যুদ্ধ ও রক্তপাত চলতে থাকে, তাহলে আমাদের এই সংগ্রামে জয়ী হবার আশা সুদূর পরাহত।
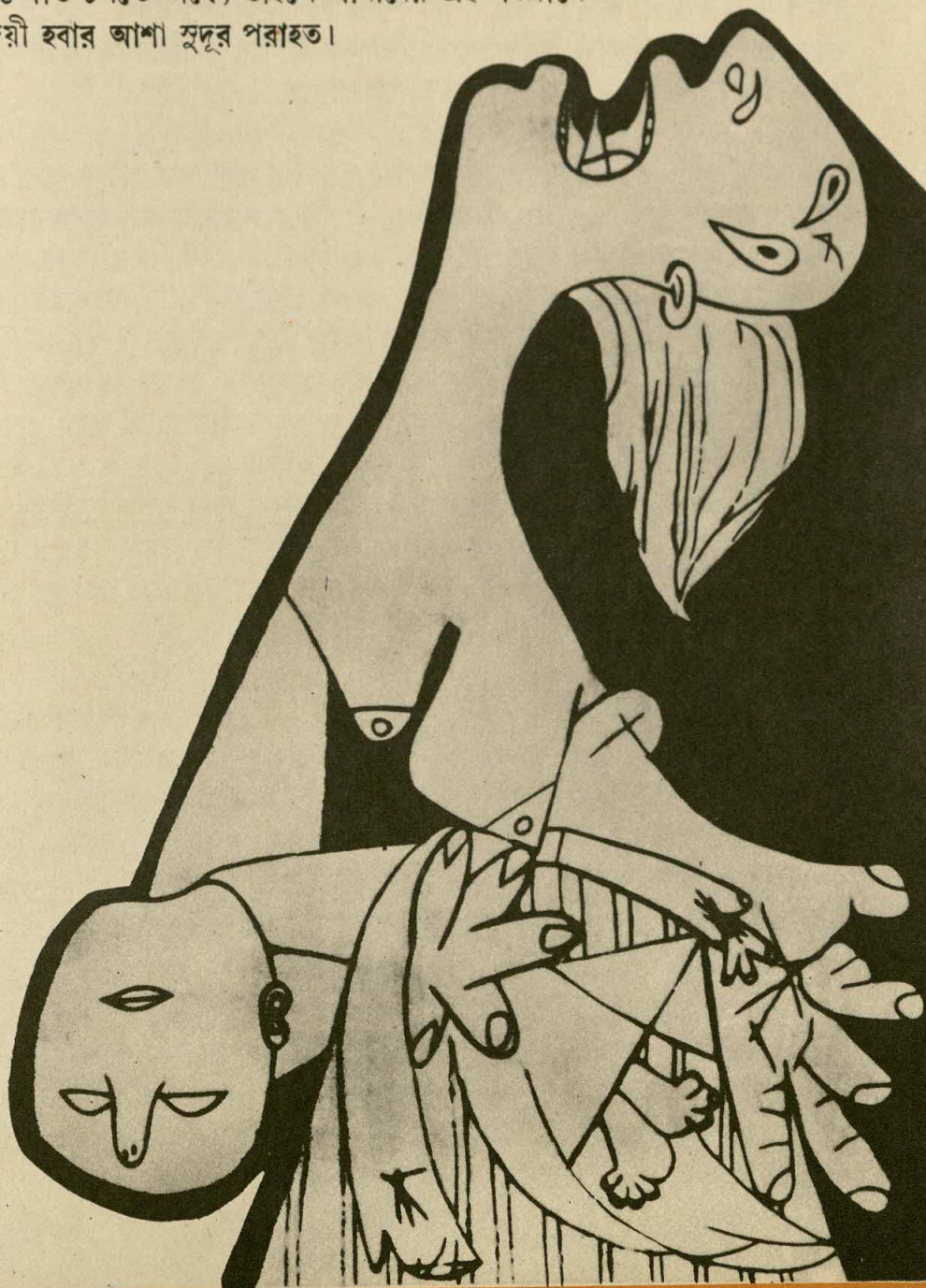
এই কারণেই দেশের আপন সীমার মধ্যে যেমন, তেমনি পৃথিবীর সর্বত্র শান্তি রক্ষা করা দরকার। এটা তখনই সম্ভব হবে, যখন এক দেশ অন্য দেশের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে নিজেদের বাদবিসম্বাদ আপসে মিটিয়ে নিতে শিখবে, সকল কাজে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগ করতে পারবে।

পৃথিবী জুড়ে যে সম্পদ আছে, তা পৃথিবীর লোকের পক্ষে যথেষ্টরও বেশি। তেমন যদি নাও হত, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে আমরা অনায়াসে কিংবা অল্পায়াসে ঘাটতি পূরণ করে নিতে পারি। সমুদ্রের গভীরে ডুব মেরে আমরা অধিক পরিমাণে মানুষের খাদ্য সংগ্রহ করতে পারি, ল্যাবরেটরিতে কৃত্রিম উপায়ে পুষ্টির উপাদান সৃষ্টি করতে পারি। সুতরাং কেউ কারো সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি কিংবা যুদ্ধ বিগ্রহ করবে – তার কোনো সংগত কারণ নেই। গোলমাল হয় যখন বসুন্ধরার দান সবার মাঝে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া না হয়, যখন এক জাতি রক্তচক্ষু হয়ে অন্য কোনো জাতিকে শাসায়, যখন এক জাতি বলে সে অন্য জাতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ, অথবা যখন পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ লোক দুঃখ দারিদ্র্যে নিমজ্জিত থাকলেও অন্যেরা তাদের উদ্ধার করার জন্য এগিয়ে আসেনা। মানুষের মানবিকতা তখন বাধ্য হয়ে প্রতিবাদ জানায়, এবং তার ফলে আসে হিংসা, দ্বেষ, যুদ্ধ, রক্তপাত।

স্বাধীন ভারত বয়সে নবীন। তার অঙ্গে অঙ্গে তারুণ্যের অদম্য শক্তি। কিন্তু ইতিহাসের হিসাবে আমরা অতি প্রাচীন ও জ্ঞানবৃদ্ধ জাতি। আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য প্রেরণা জোগায় সত্য, কিন্তু নবীন ভারত পশ্চিমের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা থেকেও উদ্দীপনা লাভ করে। আমাদের এখনো অনেক কিছু শিখতে হবে, জানতে হবে, নূতনে-প্রাচীনে সমন্বয় ঘটিয়ে, অনেক কিছু করতেও হবে। আমাদের সুবিধা এই যে, দেশে কাজ করার ইচ্ছার অভাব নেই, লোকের অভাব নেই, প্রাকৃতিক সম্পদেরও অভাব নেই।

এইসব যা কিছু আমাদের আছে, এগুলিই তো আমাদের রঙ – উজ্জ্বল লাল, শান্ত সবুজ, ঈষৎ বিষন্ন শাদা, ধূসর ও বাদামী, নির্মল নীল, চাপা গোলাপী এবং আরো অনেক হাসিখুশি চড়া রঙ। তবে আর হাত গুটিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কেন? জাদুর তুলি দিয়ে রঙ চাপাতে শুরু করে দাও।

আবার বুঝি জিজ্ঞাসা করলে,
কী করে রঙ লাগাবে? কী করে আবার?
প্রত্যেকে নিজের নিজের কাজটুকু করে গেলেই তো
চিত্রপট রঙে রঙে ভরে উঠবে। এবার কিন্তু আগের
চাইতে ভালো করে, যত্ন নিয়ে রঙ লাগাতে হবে।
ভারতের চিত্রপট সুন্দর করে আঁকতে হলে
সেই হল একমাত্র পন্থা।
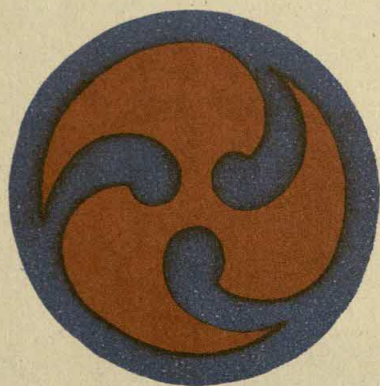
এই বইয়ের বিষয়ে

লেখিকার কথা

যারা বয়সে ছোট হলেও ভারতের সম্বন্ধে বড়দের মতো প্রশ্ন করতে শুরু করেছে---এ বই লিখিত হয়েছে তাদের কথা মনে করে। এই জিজ্ঞাসু মনটা জাগে বারো বছর বয়সের এদিকে কিংবা ওদিকে। তাই কোন বয়সের ছেলেমেয়েদের কথা ভেবে এ বই লেখা, তা না হয় উহ্য থাক। যেসব ছেলেমেয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করেই সবকিছু মেনে নেয়, এ বই হদিশ দেবে ভারতের ভাগ্যের সঙ্গে কীভাবে তাদের ভাগ্যও জড়িত। সোজাভাবে, সহজ ভাষায় এ বই বলতে চায় ভারত কী, ভারত কোথায় চলেছে, পৃথিবীর কাছে ভারতের অর্থ কেমন দাঁড়াতে পারে। গত পঁচিশ বছর ধরে দেশ ও জাতি গঠনে ভারতের বিভিন্ন উদ্যোগের বর্ণনা দিতে গিয়ে, এ বইয়ে বলবার চেণ্টা করা হয়েছে স্বাধীনতা লাভের পর কীভাবে এ দেশের জীবনের ধারা বদলাতে লেগেছে।

জীবন যাপনে ভারতের নিজস্ব ধরন বিষয়ে আমরা তো কত কথা বলি। কী সে ধরন? ধর্মে নিষ্ঠা, সাহস ও বীরত্ব, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়, সমাজের রূপান্তর প্রভৃতি কত কথা তো আজকাল ছোটদের কানে আসে। এইসব কথার প্রকৃত অর্থ কি? কেবল আর্থিক উন্নতি হলেই যদি দেশের প্রকৃত উন্নতি হত, তাহলে এ দেশ ছেড়ে লোকে কেন অন্য দেশে চলে না যাবে--যাবার যদি সুবিধা থাকে? যে ভারতীয় সংস্কৃতির ধারাকে অব্যাহত বলা হয়, তা কি এখনো বাস্তবে দেখা যায়? দেখা যদি যায়, তাহলে তার চেহারাটা ঠিক কেমন? কী সেই ভারতীয়ত্ব যা নাকি আমাদের পরস্পরের যোগসূত্র--যা তোমার আমার মধ্যে যেমন আছে তেমনি ছিল হাজার বছর আগেকার ভারতীয়ের মধ্যে এবং যা এখনো আছে আজকের দিনের হাজার মাইল দূরের গ্রামের লোকের মধ্যে? এই সব প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে আর্থিক, রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ভারত কত যে পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে চলেছে--সেইসব

বিষয় আলোচনা করতে হয়েছে।

ছোটদের ভারত ইতিহাস 'Childrens' History of India' বইয়ে ভারতের কাহিনী বলা হয়েছে সাল তারিখের হিসাব না রেখে। আমাদের ইচ্ছা এ বই যেন তারই পরিপূরক হয়। সেইজন্য এ বইয়ে কেবল তথ্য বা তারিখের উপর জোর না দিয়ে, মূলে, কান্ডে, শাখায়, প্রশাখায় ভারতের বিরাট বনস্পতি কীভাবে রূপান্তরিত হচ্ছে সেই কথাটুকু বড় করে তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে।

কথার সঙ্গে ছবির সাযুজ্য ঘটিয়ে বইটিকে যেভাবে সাজানো হয়েছে--আশা করা যায় তা পাঠকের আগ্রহ উদ্দীপ্ত করবে। চোখের দেখার সঙ্গে মনের দেখাকে মিলিয়ে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে, কারণ তাতে মনের নাগাল সহজে পাওয়া যায়। এই বইয়ে এমন অনেক চিত্রকল্প আছে যা আমাদের দেশের অতীত জীবন, উপজাতি জীবন, লোক জীবন কিংবা সরাসরি আজকের জীবনের প্রতীকরূপে স্বীকৃত। সমসাময়িক ভারতের আলোকচিত্রের সঙ্গে এই সব চিত্রকল্প এমনভাবে মিলিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে বক্তব্য বিষয় ছবির মত ফুটে উঠতে পারে। আশা করা যায় কথা ও ছবির সমন্বয়ে যে ধারণা ধরে দেবার জন্য আমাদের এই প্রয়াস, সে ধারণা পাঠকের কিশোর মনে বহুকাল গাঁথা হয়ে থাকবে এবং কথা ও ছবি পরস্পরকে সমৃদ্ধ ও তাৎপর্যমণ্ডিত করে তুলবে।

তা যদি সম্ভবপর হয়, তাহলে হয়তো এ বই পাঠকের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে বেশ কিছুকাল তাল রেখে চলতেও পারে।

ছবির বিষয়ে

স্বীকৃতি

যাঁরা নানাভাবে সহায়তা করেছেন এবং যাঁদের অমূল্য সহায়তা ব্যতিরেকে এ বই প্রস্তুত করা সম্ভবপর হতনা তাঁদের মধ্যে আছেন পুপুল জয়াকর, প্রফেসর কে. স্বামীনাথন, বি. এল. ধর, চামেলী রামচন্দ্রন, আবুল হাসান, এইচ. ওয়াই. শারদা প্রসাদ এবং রাজেশ বাহাদুর।

সহায়তা ও সহযোগিতা করেছেন নয়া দিল্লীর য়ুনাইটেড সারভিস ইনস্টিট্যুশন অব ইণ্ডিয়া-র গ্রন্থাগারের কর্মীবৃন্দ।

নয়া দিল্লীর নেহরু মেমোরিয়্যাল মিউজিয়ম ও লাইব্রেরী, ভারতের কয়েকটি প্রাচীন সংবাদপত্র ও জওহরলাল নেহরুর 'Discovery of India' থেকে কিছু কিছু অংশের প্রতিলিপি ব্যবহারের সুযোগ করে দিয়েছেন।

নিউ ইয়র্ক-এর নিউ স্কুল ফর সোস্যাল রিসার্চ, জে. সি. ওরোজকো রচিত 'Struggle in the Orient'--প্রাচ্য দেশের সংগ্রাম--প্রাচীর চিত্রের প্রতিলিপি ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন।

মেক্সিকো সিটির ইনস্তিতুতো নাসিওনাল দ্য বেল্লে আর্তেস, দাভিদ আলফারো সেকুইয়েরস রচিত 'Our Present Image' (বর্তমানের রূপ) ছবিটির প্রতিলিপি ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন।

নয়া দিল্লীর ন্যাশনাল গ্যালেরি অব মডার্ন আর্ট অমৃতা শেরগিল রচিত 'Mother India' (ভারতমাতা) ছবিটির প্রতিলিপি ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন।

নয়া দিল্লীর ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগ ব্রিটিশ ভারতের কতিপয় ডাক টিকিটের প্রতিলিপি ব্যবহারের সুযোগ করে দিয়েছেন ও অনুমতি দিয়েছেন।

এই
ডিজাইন ও চিত্রাঙ্কণ
এ. রামচন্দ্রন
ভারত